পঙ্কিল

রচনা

আলেকজান্দার কুপ্‌রিন

অনুবাদ

শ্রীকুমারেশ ঘোষ

শ্রীসুকুমার গুপ্ত

সম্পাদনা

শ্রীজগদিন্দু বাগ্‌চী

রীডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

দ্বিতীয় সংস্করণ—বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৬০

প্রচ্ছদপট

শ্রীসুমুখ মিত্র

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন হইতে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র, এম. এ.
প্রকাশ করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে ছেপেছেন

—গ্রন্থকারের উৎসর্গ-পত্র—

জানি অনেকেই উপন্যাসখানাকে নীতিধর্মবর্জ্জিত ও অশ্লীল
মনে করবেন ; তবুও সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে
এখানা উৎসর্গ করছি আমি
জননী ও তরুণদের
উদ্দেশ্যে

আ. কু.

ভূমিকা

কুপ্রিন তাঁর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে এক জায়গায় বলিয়েছিলেন: দু'টি অনুপম বাস্তব—এই চাষা আর বেশ্যা। মানুষের মতোই প্রাচীন। অথচ সাহিত্যে এদের স্বরূপ-পরিচয় পাইনে।

'ইয়ামা' বইখানিতে তারই একটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি—এঁকেছেন বেশ্যাবৃত্তির ছবি!

অবশ্য তাঁর আগে এ-চেষ্টা আর কেউ যে করেন নি, তা নয়। বরং তাই যদি হতো তবে সাহিত্যিক-গোষ্ঠীতে সগোত্র বলে তাঁর পরিচয় হয়তো এত সহজেই স্বীকৃত হতো না। প্রাচীন এ সমস্যা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে এসেছে। ফলে বিশ্বসাহিত্যে আজ আমরা পেয়েছি এ বিষয়ের বহুবিচিত্র একটি আলেখ্য—হয়তো সম্পূর্ণাঙ্গ নয়, তবুও বৈচিত্র্যময়।

কুপ্রিন-এর এই 'ইয়ামা' বইখানিতেই রয়েছে প্রেভোস্ত-এর লেখা 'মানো'র কথা—একটি গণিকার চরিত্র। যথার্থ গণিকা ব'লে তাকে নির্দেশ করা যায় না হয়তো, কিন্তু তা ছাড়া কী-ই বা সে আর! গণিকাদের মধ্যেও ব্যষ্টি ভেদ আছে বৈ কি! তারাও তো মানুষ! সে যা-ই হোক, প্রেভোস্ত-এর এই নায়িকাটিকে উপলক্ষ্য করে সমগ্রভাবে যে-রস উৎসারিত হয়ে উঠেছে, সমালোচকদের মতে তা হলো বিশুদ্ধ ভাবালুতা। দুমা-র 'কামেলিয়া'র বিলোল ভাবালুতাও আসলে সেই একই পর্যায়ের। কেউ কেউ আবার বিষয়টিকে দেখতে প্রয়াস পেয়েছেন রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে—যেমন দেখতে পাওয়া যায় লোয়ী-র 'আফ্রোদাইৎ' অথবা বালজাক-এর 'ইম্পেরিয়া'য়। বালজাক-এর আর একখানি রসরচনা, 'গণিকাদের সুখদুঃখ' (Splendeurs et Miseres des Courtesanes), এক অভিনব বস্তু; তাতে পাই আমরা বাস্তব ও রোমান্সের এক অপরূপ মিশ্রণ—উপভোগ্য, কিন্তু যথার্থ খাঁটি জিনিস নয়। সম্ভবতঃ এক ডীফো-র 'মোল ফ্লাণ্ডার্স'ই এদিক দিয়ে একমাত্র বাস্তব কথাচিত্র। আর হয়তো জোলা-র 'ন্যানা'ও।

তবুও এর কোনটিই গণিকাবৃত্তির যথার্থ পরিচয়ের চেষ্টা নয়,—এক-একটি গণিকা-চরিত্রের আলেখ্য মাত্র—যেমন, এই 'ইয়ামা'র জেনী, কি তামারা, কি লিউব্‌কা, বা আর কেউ। সুখদুঃখ, দ্বন্দ্বসংঘাত, ক্রূরতা-ভালোবাসা, সব কিছুর ভেতর দিয়ে তাদের কেউ হয়ত হয়ে উঠেছে সর্বংসহা ব্রতচারিণী, কেউ বা রহস্যময়ী নারী, আর কেউ বা ডুবে গেছে দীনতা নীচতার অন্তরালে বিস্মৃতির অতল গভীরে। কেউ কেউ আবার কুপ্‌রিন-এর 'হেনরিয়েটা', 'জো', 'বড়ো মান্‌কা'—এদের মতো চির-কালের সেই বেশ্যাটিই রয়ে গেছে।

কুপ্‌রিনও তাঁর এ ইউপাখ্যানে যে-সব চরিত্রের সমাবেশ করেছেন তাদের যে-কোনো একটি কি দু'টিকে এভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন বৈ কি তিনি! কেন, গরবিনী জেনী—মাগ্‌দালেন আশ্রমের নামেতেই যে জলে ওঠে—তাকে আমাদের ব্রতচারিণী অম্বাপালী কি সেণ্ট মাগ্‌-দালেন-এর রূপে দেখতে পেলে আমাদের চিত্ত কি পরিতৃপ্ত হতো না? অথবা তামারাকে—তা' কুপ্‌রিন স্বয়ংই তো কতবার তার হাসিটিকে মোনা লিসার হাসির সঙ্গে তুলনা ক'রে এসেছেন। ঘুরিয়েও এনেছেন তাকে কনভেণ্ট-এর ব্রহ্মচারিণীদের দল থেকে। এমন কি, ঐ নিরীহ ভালোমানুষ অবোধ সরল লিউব্‌কাটিকে পর্যন্ত একবার সত্যিকারের ভালোবাসা আর ঘর-গৃহস্থালীর স্বাদ দিয়ে, শেষে চোখের জলে ভাসিয়ে পথচারিণীদের দুর্গম পথ বেয়ে টেনে নিয়ে এলেন ফের তিনি গণিকালয়ের পঙ্কিল আবহাওয়ার মধ্যে। এদিক দিয়ে লেখক হিসাবে তাঁর সুমুখে ছিল প্রচুর লোভনীয় সামগ্রী। তাতে ক'রে বিচলিতও যে হননি তিনি, একথা কী ক'রে বলি? অসতর্ক মুহূর্তে নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়তেও উদ্যত হয়েছেন তিনি কতবার! তবুও শেষ অবধি সামলে নিতে পেরেছেন নিজেকে—স্বয়মারোপিত গণ্ডীর বাইরে পদক্ষেপ করেন নি কখনও। লেখক হিসাবে এ হলো তাঁর অসীম বলবত্তার পরিচয়। আর এরই জন্যে সার্থক হয়ে উঠেছে তাঁর এ রসরচনা—তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি আমরা গণিকাবৃত্তির একটি অনুপম বাস্তব আলেখ্য, গণিকা-চরিত্রের সূক্ষ্মচতুর বিশ্লেষণ নয়। এদিক থেকে তাঁর এই 'ইয়ামা' বইখানি বিশ্বসাহিত্যের একটি অনুপম অবদান।

প্রথম ভাগ

—এক—

বহুদিন আগেকার কথা। তখনও রেল-লাইন হয়নি। দক্ষিণ-রুশিয়ার কোন-একটি শহরের শেষপ্রান্তে সরকারী আর বে-সরকারী যাত্রীগাড়ীর গাড়োয়ানরা বংশ-পরম্পরায় বাস করত। তাই সে জায়গাটার নাম হয়েছিল 'ইয়াম্স্কায়া স্লোবোদা', মানে 'গাড়োয়ানী শহর'—ছোট করে বলতে গেলে, 'ইয়াম্স্কায়া', বা 'ইয়াম্কা', অর্থাৎ 'খানাখন্দ', অথবা আরও সংক্ষেপে, 'ইয়ামা', মানে 'ডোবা'। তারপর যখন এসে দেখা দিলে বাষ্পের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী গেল উঠে, অমন কড়া জানের গাড়োয়ানের দলও ভুললে তাদের হৈ-হুল্লোড়, হারালে তাদের বেপরোয়া চালচলন, কাজের চেষ্টায় একে-একে দল ভেঙে সব ছড়িয়ে পড়ল নানান জায়গায়। কিন্তু অনেক কাল পরেও, এমন কি এখনও, ইয়ামার গায়ে লেগে রয়েছে সেই কলঙ্কের ছাপ, লোকে জায়গাটাকে ফুর্তিবাজি, মাতলামি, আর গুণ্ডামির জন্যে কুখ্যাত বলে জানে— রাতের বেলায় ভয়ের বলেই মনে করে।

আর কেমন করে যেন, আগে যেখানে পল্টনদের রাঙামুলো নাচুনি বৌয়ের ঝাঁক আর শাঁসেজলে সুশ্রী ইয়ামার যত বিধবার পাল তাদের কালো ভ্রূ নাচিয়ে গোপনে গোপনে বোদ্কা মদের আর প্রেমের ব্যবসা চালাত, সেখানে একটি-একটি করে রুশ-সরকারের অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রণাধীন যত সব গণিকালয় গজিয়ে উঠতে লাগল। উনিশ শতকের শেষদিকে ইয়ামার, মানে বড়ো আর ছোট ইয়াম্স্কায়ার পথের দু'ধারই এই রকমের গণিকালয়ে ভর্তি হয়ে যায়। গৃহস্থদের যে খানপাঁচ-ছয় বাড়ী শেষ অবধি টিকে ছিল, তাও শেষে হয়ে উঠল ভাঁটিখানা, তাড়িখানা, আর দোকানপাট—ইয়ামার গণিকাবৃত্তির দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোই হলো এগুলোর কাজ।

ত্রিশ-বত্রিশটি গণিকালয়ের নিয়মকানুন, চালচলন সব প্রায় একই রকমের ; কেবল বাড়ী আর বারবিলাসিনীদের রূপ আর রূপসজ্জা হিসাবে দক্ষিণা কমবেশি।

বড়ো ইয়াম্‌স্কায়ায় ঢুকতেই বাঁ-হাতে 'ত্রেপেল' হচ্ছে সব চেয়ে কায়দা-দুরস্ত বাড়ী,—অনেক দিনের পুরোনোও বটে। এখন যিনি এ বাড়ীর মালিক তাঁর একেবারে আলাদা নাম, পৌর-সভার নির্বাচকদের মধ্যে তিনি একজন, এবং নিজেই হচ্ছেন পৌর-সমিতির একজন সদস্য। বাড়ীটা দোতলা, সবুজ আর শাদায় রঙ-করা, স্থপতি রোপেৎ-এর উদ্ভাবিত ভুয়ো বিকৃত রুশীয় পদ্ধতিতে তৈরি। সিঁড়িতে কার্পেট পাতা ; সামনের বড়ো হল-ঘরে একটি ভল্লুকের প্রতিমূর্তি, থাবায় ধরে রয়েছে একটি কাঠের পাত্র—ভিজিটিং কার্ডের জন্যে। বল্‌-রুমের পালিশ-করা মেজে, জানলায় মোটা রেশমি পর্দা, দেওয়ালে বাঁধানো আর্শি। তা'ছাড়া দু'দুটো আলাদা ঘরও রয়েছে—সারা মেজে কার্পেটে মোড়া। শোবার ঘরে নীল আর গোলাপি আলো ; সিল্কের লেপ, ধবধবে বালিশ। গৃহবাসিনীদেরও সাজ-সজ্জার পারিপাট্য আছে। লম্বা বল্‌-নাচের গাউন পরা, তাতে আবার ফার-এর পাড় দেওয়া ; নয়তো দস্তুরমতো সৌখিন শোভাযাত্রীদের বেশ। হরেক রকমের সাজ : কেউ সাজে অশ্বারোহী সৈনিক, কেউ বা খিদ্‌মদ্‌গার, কেউ মেছুনী, আবার কেউ বা স্কুলের ছাত্রী। এদের মধ্যে অনেকেই বল্টিক অঞ্চলের জার্মান ; বেশ লম্বা-চওড়া গড়ন, সুন্দরী, ফর্সা ধবধবে, আর পীনপয়োধরা। 'ত্রেপেল্‌'এ একবারের জন্য তিন রুবল্‌ দক্ষিণা, আর সারারাতের জন্যে দশ।

সোফিয়া বাসিলিয়েব্‌নার গণিকালয়, 'ওল্ড কিয়েব', আর আনা মারকৌব্‌নার গণিকালয়—এই তিনটিই হলো দুই রুবলের প্রতিষ্ঠান,— ঈষৎ নিম্নস্তরের। বড়ো ইয়ামস্কায়ার বাকি গণিকালয়গুলো এক রুবলের, সেগুলো আরও এক ধাপ নীচে। আর ছোট ইয়ামস্কায়াতে সেপাই, ছিঁচকে চোর, কুলিমজুর, আর যত রকমের ফাল্‌তো লোকের যাতায়াত। সেখানকার দক্ষিণা হচ্ছে পঞ্চাশ কোপেক, কি তারও কম, আর বিলি-ব্যবস্থাও যার-পর-নাই খারাপ। বৈঠকখানার মেঝে

উঁচুনীচু, খোলামকুচিতে ভর্তি। জানলাগুলোতে লাল স্তাকড়া ঝোলানো। শোবার ঘর তো নয়, যেন এক একটা খোপ—নীচু ছিটেবেড়া দিয়ে ভাগ ভাগ করা ; তোষক ছেঁড়া, বিছানার সব চাদরে দাগ ; লেপ হচ্ছে ফ্লানেলের—তাও পুরোনো, ময়লা, আর শতচ্ছিন্ন। জায়গাটার আবহাওয়াও জঘন্য—এঁদো, নরনারীর দেহ-নিঃস্রাব আর মদের গন্ধ মেশানো ধোঁয়ায় ভর্তি, বিলাসিনীরা সস্তা ছাপা পোষাকে কোনও রকমে সোজগোজ করে ; কেউ বা পরে মাঝিমাল্লার পোষাক। গলার আওয়াজ তাদের ভাঙা ভাঙা, নয়তো খোনা। তাদের নাক পড়েছে ঝুলে, মুখে দগদগ করছে গতরাত্রির মারামারি খামচাখামচি কামড়াকামড়ির দাগ ; সেই মুখই তারা আবার সাজায় লাল সিগারেটের বাক্স থুতু দিয়ে ভিজিয়ে গালের 'পরে বিশ্রী করে এঁটে দিয়ে।

'পুণ্য সপ্তাহের' শেষ তিন রাত আর 'বার্তাবহনের' [১] আগের রাতটা (যখন পাখীরা পর্যন্ত নাকি বাসা বাঁধে না, আর বেশ্যারা বাঁধে না চুল, সেই ক'টা রাত) ছাড়া বৎসরের প্রতি সন্ধ্যায় এই সব গণিকালয়ের দরজায় জ্বলে ওঠে লাল আলো। বড়োদিনের যত সব সুসজ্জিত রাস্তা যেন! প্রত্যেকটি জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে রাস্তায়, ভেসে আসে বেহালা-পিয়ানোর মিঠে সুর, গাড়ীর পর গাড়ী আসা-যাওয়া করতে থাকে রাত-ভর। সব কয়টা গণিকালয়েরই সদর দরজা থাকে খোলা। রাস্তায় এসে দাঁড়ালে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সিঁড়ি, বারান্দা আর সামনের হলের সুইস্ দৃশ্য আঁকা সবুজ দেওয়াল (সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে এদের কিসের সম্পর্ক ?)। ভোর অবধি এ সিঁড়ি দিয়ে কত যে লোক ওঠে আর নামে! আসে এখানে সকলেই—কৃত্রিম উত্তেজনাকামী জীর্ণদেহ বৃদ্ধ পর্যন্ত, আসে ছেলেরাও—সামরিক স্কুলের, হাই-স্কুলের, তাদের শিশু বললেই হয়। আসেন কত বড় বড় পরিবারের কর্তা-ব্যক্তি—যত সব শ্মশ্রুল প্রবীণের দল। আসেন কত মান্যগণ্য সমাজপতি—আসেন তাঁরা সব সোনার

---

[১] পুণ্য-সপ্তাহ—ঈস্টার-পর্বের পূর্ব-সপ্তাহ। 'বার্তাবহন'—দেবদূত জিব্রাইল কর্তৃক যিশু-জননী মেরীর নিকট যিশুর মানবজন্ম গ্রহণের বার্তা বহন।

চশমা এঁটে, আসেন সেজেগুজে ; নব-বিবাহিতেরা, বিখ্যাত অধ্যাপকেরা, কেউই বাদ যান না। আবার আসে চোর, আসে খুনে ; এদিকে আবার উকিলরাও আসেন, আসেন যত সব ন্যায়ধর্মের ধ্বজাদণ্ডধারী। নামকরা লেখকরা এবং যাঁরা মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার নিয়ে লিখে থাকেন তাঁদেরও দেখা মেলে এখানে। এ ছাড়া আসে গোয়েন্দা, আসে পলাতক ; সরকারী কর্মচারীরাও আসেন, ছাত্রেরা আসে, রোগীরা আসে, সুস্থ-সবলেরা আসে ; আবার অনেকে আসে যারা পুরোনো ঘাগী—কোনও পাপই যাদের বাকি নেই। বিকলাঙ্গ, বোবা, কালা, কাণা, নেকো, মোটা, সরু, টেকো, ভীরু, বাঁদর-মুখো—হরেক-রকমের লোকের দর্শন মেলে এখানে। এরা দিব্যি আসে—যেন কোনও রেস্তরাঁয় এসেছে। আসে, বসে, সিগারেট ফোঁকে, মদ খায়—দেখায় যেন কতই না আমোদ পাচ্ছে। অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচেও তারা, আর নাচের জন্যে মেয়েদেরও সঙ্গে সঙ্গে বেছে নেয়। দক্ষিণা আগেভাগেই দিয়ে দেয় তাড়াতাড়ি ; তারপর যে-শয্যায় তার পূর্বগামীর দেহের উত্তাপ তখনও রয়েছে মাখানো, সেই বারোয়ারি বিছানায় অন্ধ খেয়ালের বশে সে বিশ্বের মহত্তম, মধুরতম রহস্যে—নবপ্রাণ সৃষ্টির রহস্যে—মগ্ন হয়! আর ঐ সব নারী অবহেলা মেশানো আগ্রহে, বাঁধাবুলি আউড়ে, পেশাদারি অঙ্গভঙ্গী করে, তাদের কামনা চরিতার্থ করতে সাহায্য করে—যেন কলের পুতুল যত সব! একই রাত্রে, সেই একই রকমের কথায়, সেই একই রকমের হাসি আর অঙ্গভঙ্গীতে পর পর তৃতীয়, চতুর্থ,···দশম—তারপর আরও যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তবে তারও কামনা চরিতার্থ করতে বাধ্য তারা।

এইভাবে কাটে সারা রাত, তারপর সকাল হয়, ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে আসে ইয়ামা। ইয়ামাতে দিনের বেলায় লোক নেই। অধিবাসিনীরা সব ঘুমে অচেতন। দরজা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি নাবানো। যখন সন্ধ্যা হয়, বিলাসিনীদের ঘুম ভাঙে ; আবার রাতের জন্যে প্রস্তুত হয় তারা।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, বাস করে আসছে তারা সব 'বারোয়ারি অন্তঃপুরে'। সমাজ তাদের দূরে

সরিয়ে রেখেছে, পরিবার তাদের ত্যাগ করেছে। সমাজের খোশ-খেয়ালের বশ তারা—রয়েছে নগরের কামাগ্নিতে শান্তি-বারি সেচন করতে। পাপিষ্ঠের পাপলালসা থেকে ভদ্র-পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা করছে ওই সব বারবিলাসিনী—ওই চার শ' অবোধ, অলস, উত্তেজনা-প্রবণ, বন্ধ্যা রমণী।

—দুই—

বেলা দু'টো বেজে গেছে। আনা মারকোব্‌নার দু'-রুবলের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানটির সব কিছুই যেন ঘুমে অচেতন। বাঁধানো আর্শি আর চেয়ার দিয়ে সাজানো বৈঠকখানা ঘরটিও যেন পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। কোণে আধো আঁধারে মকোভিস্কির আঁকা 'রুশীয় মহাপুরুষগণ' এবং 'স্নান' নামে ছবি দু'খানিও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। গত রজনীতেও যথারীতি নাচ-গান-হল্লা চলেছে এখানে; তামাকের ধোঁয়া আর বাজনার সুর ভেসে বেড়িয়েছে ঘরময়; আর মেয়ে-পুরুষরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে আর উঁচুতে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জোড়ায় জোড়ায় নেচে ফিরেছে অবিরাম। বাইরের রাস্তা আলোয় আলোময় হয়ে গিয়েছিল তখন; ভোর অবধি গাড়ীর পর গাড়ী এ-সব পথে করেছে যাতায়াত।

এখন রাস্তায় কেউ নেই। গ্রীষ্মের রৌদ্রে রাস্তাগুলো ঝক্‌মক্‌ করছে। বৈঠকখানার ঘরটায় জানলার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে; তাই ঘরের ভেতরটা অন্ধকার আর ঠাণ্ডা। চিত্ত আকর্ষণের মতো কিছুই নেই সেখানে। গত রাত্রের পঙ্কিল আবহাওয়া যেন থমকে স্থির হয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। সুগন্ধি, তামাক, ক্লেদময় অসুস্থ নারী-দেহের স্বেদবিন্দু, মুখে মাখবার পাউডার, ঔষধি-সাবান, মেঝে পালিশ করবার গুঁড়ো—সব কিছুর গন্ধই একাকার হয়ে মিশে ঘরের মধ্যে করেছে এক বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি।

আজ 'ত্রিনীতি' উৎসব। তাই প্রাচীন প্রথামতো প্রতিষ্ঠানের পরিচারিকারা বাজার থেকে জলা-ঘাস কিনে এনে ঘর-দোরের যেখানে

পেরেছে সাজিয়েছে। মেয়েরা তখনও ঘুমিয়ে। পরিচারিকারা দেবমূর্তির সম্মুখে আলো দিয়ে বেশ করে সাজালে।[১] বিলাসিনীরা নিজ হাতে এ সব কাজ করে না। ভয় পায়, যে-হাতে নিশীথে করেছে কামচর্চা, সে হাতে প্রভাতে দেবতার পরিচর্যা!

সদর-দরজাও সাজানো হয়েছে। কিন্তু বাড়ীর ভেতরটা এখনও যেন ফাঁকা ফাঁকা। কেবল রান্নাঘর থেকে কাটলেটের জন্যে মাংস কুচোনোর আওয়াজ আসছে।...প্রতিষ্ঠানের একটি মেয়ে,—নাম তার লিউব্‌কা, মুখে মেচেতার দাগ, দেখতে খুব ভালো না হলেও বেশ আঁটসাঁট তার গড়ন আর শরীরখানাও বেশ তাজা—খালি পায়ে, একটা হাত-কাটা জামা গায়ে, ভেতরের উঠোনে নেমে এল। গতরাত্রে তার ঘরে পর পর ছয়জন অতিথি জুটেছিল বটে, কিন্তু কেউই সারারাত কাটায়নি তার সঙ্গে। তাই গোটা বিছানাটায় বেচারা একটু আরামে ঘুমুতে পেরেছিল। হয়তো তাই ঘুমও তার আগেই ভেঙেছিল, মানে বেলা দশটায়। খুশী হয়েই সে এসে ঘরের মেঝে আর রান্নাঘরের টেবিল ঘসতে রাঁধুনীকে সাহায্য করতে লাগল। পরে সে শেকলে বাঁধা 'য়্যামর' (=প্রেম) নামে কুকুরটাকে মাংসের টুকরোগুলো খাওয়াতে বসল। কুকুরটা তার সামনের পা-দু'খানা উঁচু করে মেয়েটার ঘাড়ের ওপর পড়ে তার হাত থেকে মাংসের টুকরোগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল—শেকল ছিঁড়ে যায় আর কী! মেয়েটি রাগের ভাণ করে বল্লে, "দুষ্টু, তুই ভেবেছিস তোকে দেবার জন্যেই এই টুকরোগুলো এনেছি. না? না, দেব না তোকে—"

কিন্তু দিলে তাকে। আদরও করলে। মন তার আজ খুশিতে ভরা। রাতে ঘুমও হয়েছে ভালো, আর তার ওপর আজ 'ত্রিনীতি' উৎসব। কতদিন পরেই না এল!

রাতের অতিথিরা রাত শেষ হতে না হতেই গেছে চলে। আবার

---

১ রুশিয়ার খ্রীষ্টানরা গ্রীক চার্চের অনুবর্তী। গ্রীক চার্চে—এবং রোমান চার্চেও—মূর্তিপূজার বহুল প্রচলন আছে।

তো যে-যার কাজে যেতে হবে। কেবল বৈঠকখানায় কয়েকজন মাত্র বসে কফি খাচ্ছিল। কারা ওরা ?

ওঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাড়িউলী আনা মারকোব্না। বয়স ষাটের কাছাকাছি। দেখতে ছোট্টটি কিন্তু বেশ গোলগাল। চোখদুটো ফিকে নীল—অল্পবয়সী মেয়েদের মতো, কচি মেয়েদের মতোই বলতে গেলে ; কিন্তু মুখখানা ঠিক বুড়োমানুষের মতোই। ঠোঁটের রঙ লালচে, নীচের ঠোঁটখানা একটু যেন ঝুলেও পড়েছে। স্বামীও একটি আছেন—নাম ইসাইয়া সাবিচ্ ; ছোট্টখাট্ট মানুষটি—চুপচাপ, বুড়ো, আর বৌয়ের 'ভেড়ো'। আনা মার্কোব্না যখন ছিল এ বাড়ীর একজন খবরগির্নী তখন ইসাইয়া এখানে করত খিদ্‌মৎগারের কাজ। কাজের লোক হবার আশায় আপন চেষ্টায়ই ইসাইয়া বেহালা বাজাতে শিখেছিল, তাই এখন নাচের সঙ্গে—আর দরকার হলে শবযাত্রার সঙ্গেও—বেহালা বাজায় সে।

এখন এ বাড়ীর দু'জন খবরগির্নী। বড়জনের নাম এম্মা এডওয়ার্ডোব্না,—লম্বা, পূর্ণাঙ্গী, বয়স ছেচল্লিশ। বাদামি রঙের চুল আর ঢেউ-খেলানো থুৎনি তার। চোখের কোলে কালো দাগ। গায়ের রঙ মেটে-মেটে। চোখদু'টো ছোট ছোট আর কালো ; চাপা নাক ; আর ঠোঁটের কোণে কাঠিন্যের ছাপ। বেশ রাশভারী লোক সে। এ বাড়ীর সকলেই জানে আর দু'এক বছর পরে আনা মারকোব্না যখন অবসর নেবে আর এই প্রতিষ্ঠানের সর্বস্বত্ব, মায় আসবাবপত্র পর্যন্ত সব কিছুই দেবে বিক্রি করে, তখন এই এম্মা-ই কিছু নগদ টাকা দিয়ে আর বাকিটা হুণ্ডি কেটে কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ করবার শর্তে প্রতিষ্ঠানটি নিজের নামে খাশ করে নেবে। তাই মেয়েরা বর্তমান বাড়িউলী আনার মতোই এম্মাকেও মান্য করে চলে। যে-সব মেয়ে ভুল করে বসে, এম্মা তাদের ভীষণ ঠেঙায়। বেশ হিসেব করে, কায়দা করে, অন্তরটিপুনি দিয়ে, মারতে জানে সে। তাতে তার মুখের শান্ত ভাব একটুও বদলায় না। আবার ঐ সব মেয়েদের মধ্যে থেকেই তার একটি করে প্রেমপাত্রীও জুটে যায় ; তার ওপর চলে দুর্দান্ত প্রেম আর ঈর্ষ্যার অত্যাচার। সে আবার তার মারের চেয়েও মারাত্মক।

ছোট খবরগিন্নী হচ্ছেন যোসিয়া। উনি সাধারণ মেয়েদের মধ্যে থেকে 'প্রমোশন' পেয়ে উঁচুতে উঠেছেন। মেয়েরা তাকে দুষ্টুমি করে, কখনও বা মন রাখতে, 'ছোট-গিন্নী' বলে ডাকে। মেয়েটি ছিপ্‌ছিপে, চটুল, আর সামান্য একটু টেরা; গায়ের রঙ গোলাপি; ঢেউ-খেলানো খোঁপা। অভিনেতা বা হাস্য-রসিকদের সে পছন্দ করে। এম্‌মার মন রেখে চলতে চেষ্টা করে সে।

পঞ্চম জন হচ্ছেন স্থানীয় পুলিশের দারোগা বার্‌কেশ। খেলোয়াড় লোক। টেকো মতন। মুখে লাল দাড়ি। ঘুমঘুম নীল চোখ। ঈষৎ ভাঙা ভাঙা মিঠে গলার আওয়াজ। সকলেই জানে আগে সে গোয়েন্দা-বিভাগে কাজ করত, বদমায়েসদের ঠাণ্ডা করতে সে একজন ওস্তাদ। কয়েকটি অপকর্মের হাতযশও আছে তার। কেন, শহরের সকলেই তো জানে বছর দুই আগে সে এক সত্তর বছরের শাঁসালো বুড়ীকে বিয়ে করে, আর এই তো গেল বছরেই তার গলায় লাগায় ফাঁস। যাক—ব্যাপারটা কোনও রকমে চাপা দিতে পেরেছিল তাই রক্ষে!

দারোগা সাহেব ননী মেশানো কফি পান করছিলেন আর ভাবখানা দেখাচ্ছিলেন যেন বাড়ীর লোকদের কৃতার্থ করছেন তিনি।

বাড়িউলী বল্লে: "আচ্ছা, কী হবে ফোমা ফোবিচ্? এ ব্যবসায় লাভ তো ঘোড়ার ডিম। তা'···আপনি শুধু মুখের কথাটি খসালেই···"

বার্‌কেশ ধীরে ধীরে কফির বাটিটা তুলে নিয়ে একটু চুমুক দিলে; তারপর আর একটু কফি খেয়ে নিয়ে গোঁফজোড়ায় আঙুল বুলিয়ে বললে:

"তুমিই ভেবে দেখো, মাদাম শোইবেস, আমার দায়িত্বটা। মেয়েটাকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে—এই—কী বলব, ভদ্রভাষায়ই বলি, কুস্থানে। এখন তার বাপ-মা করছে খোঁজাখুঁজি। বেশ! তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানোও হচ্ছে; এখন সে তোমারই হাতে এসেছে—আর ভেবে দেখো ব্যাপারটা ঘটছে কিনা আমারই এলাকার মধ্যে। এখন আমি কী করতে পারি?"

"কিন্তু, মিঃ বার্‌কেশ, সে তো এখন সাবালিকা।"—উত্তর দিলে বাড়িউলী।

"হ্যাঁ, ওদের কেউই নাবালক কি নাবালিকা নয়,"—সায় দিয়ে বল্লে —ইসাইয়া সাবিচ্: "তারা মুচলেকাও দিয়েছে। নিজেদের ইচ্ছায়—"

এম্মা বল্লে: "মাইরি, এখানে সে নিজের মেয়ের মতোই রয়েছে।"

দারোগা একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্লে: "আমি তা' বলছি নে। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখো। একটা কর্ত্তব্য তো আছে।"

বাড়িউলী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, চটি পায়ে দরজার কাছে এসে, ঢুলু ঢুলু চোখে ডাক দিলে: "মিঃ বাবুকেশ, একটু এদিকে আসুন না! দেখুন তো, এখানটা ভেঙে জায়গাটা বড়ো করলে কেমন হয়!"

"দেখি তো।"—বলে উঠে গেলেন দারোগা।

দশ মিনিট বাদে দু'জনেই ভেতর থেকে বৈঠকখানায় ফিরে এলেন। বাবুকেশের হাতে একখানা একশ' রুবলের নতুন নোট—পকেটে ঢুকছে। ভুলিয়ে আনা মেয়েটির বিষয়ে আর কোনও কথা হলো না।

আলোচনা চলতে লাগল এখনকার ছেলেদের লঘুগুরু জ্ঞানের অভাব নিয়ে। দারোগা সাহেবই কথা পাড়লেন: "আমার একটি ছেলে আছে—স্কুলে পড়ে—পল্! পাজিটা একদিন এসে বলে কিনা, 'বাবা, স্কুলের ছেলেরা আমার পেছনে লাগে; বলে, তুমি নাকি পুলিশের লোক আর তুমি নাকি বেশ্যাবাড়ীর খবরদারি কর, আর তাদের কাছ থেকে ঘুস খাও।'—শোনো একবার কথা!"

"সে আবার কী কথা!"—আম্‌তা আম্‌তা করে বলে আনা।

"আমিও ধমকে দিয়েছি তাকে।"—বলতে লাগলেন দারোগা সাহেব: "হেডমাস্টারকে বলিস, ফের যদি ও-রকম কথা শুনি, দেব গভর্ণরের কাছে নালিশ ঠুকে। কিন্তু ও ছোঁড়া বলে কী জান? বলে, 'আর আমি তোমার ছেলে নই—তুমি অন্য ছেলের খোঁজ করো।' শোনো কথা! তা' আমিও উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি! ওঃ, তাই কথা বলেন না আমার সঙ্গে! আরও শিক্ষার দরকার—"

"আর বলতে হবে না"—কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে আনা: "এই আমাদের বাড়ি—। হাইস্কুলে পাঠালাম তাকে, কোথায় ভালোটা

শিখবে—তা নয়, ফিরে এল যখন তখন তার মুখের বুলি শুনে তো আমি একেবারে থ' !"

"বাস্তবিই।"— সায় দেয় ইসাইয়া।

"যা বলেছ!"— প্রত্যুত্তরে বলেন দারোগা সাহেব : "আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো যেন কী হয়েছে। কেলেঙ্কারি! বাপ-মায়ের ওপর ভয়-ভক্তি নেই। নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে। গুলি করে মারা উচিত ওদের।"

এমন সময় যোসিয়া হঠাৎ বলে উঠ্ল : "ভালো কথা, গত পরশুর ব্যাপার বুঝি জানেন না? একটা লোক এসেছিল, বেশ জোয়ান—"

"থাম, থাম!"—এম্‌মা ধমকে থামিয়ে দিলে তাকে : "যা, বরং ছুঁড়ীগুলোর খাবার জোগাড় করগে যা!"

বাড়িউলী আরম্ভ করলে : "কারুকে দিয়ে কিচ্ছুটি হবার যো নেই। ছুঁড়ীগুলো সব পীরিতের নাগর নিয়েই ব্যস্ত; কাজের বেলায় সব ঢুঁ ঢুঁ!"

এমন সময় কে যেন ভেতরের দরজায় ধাক্কা দিলে। মেয়েলি গলায় বল্লে : "পয়সাটা নিয়ে একখানা টিকিট দিন তো!"

উঠে দাঁড়ালেন দারোগা সাহেব : "আচ্ছা, আসি এবার!"

"আর এক গ্লাস হবে না?"— জিজ্ঞেস করলে ইসাইয়া।

"নাঃ, থাক—অশেষ ধন্যবাদ!"

"আবার আসবেন!"

"হ্যাঁ, আবার বলে যাই"—দারোগা সাহেব বললেন : "মেয়েটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ো। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি। আসি!"

দারোগা সাহেব চলে গেলেন।

এম্‌মা এডওয়ার্ডোব্‌না মুখ ভেংচে বলে উঠল : "ভিলে খচ্চর কোথাকার!"

—তিন—

ক্রমে সবাই ঘর থেকে বেরুতে লাগল। ঘর তখনও অন্ধকার; সাজানো জলা ঘাসের গন্ধে ভরপুর, নিস্তব্ধ।

সন্ধ্যা ছ'টার খাওয়া না-হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের হাতে সময় থাকে অফুরন্ত। রোজই এ-সময়টা বড়ো একঘেয়ে আর ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—অনেকটা লম্বা ছুটির কর্মহীন দিনগুলোর মতো। কোন কাজ তো নেই; তাই তারা সে সময়টা শুধু পেটিকোট আর হাতকাটা ঢিলে জামা পরে খালি পায়ে এঘর-ওঘর করে বেড়ায়। গা-ধোয়া, কি চুলবাঁধার নাম নেই। হয়তো পিয়ানোতে আঙুল ঠুকে ঠুন্ করে অযথা একটা আওয়াজ করলে, নয় তো এ-ওর সঙ্গে আরম্ভ করে দিলে বচসা।

লিউব্কা আর নিউরা কতকগুলো ফল আর ফুলের বীচি কিনে এনে জামার বুকের মধ্যে রেখে সামনের রাস্তার বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাচ্ছিল আর লোক-চলাচল দেখছিল। আলোওয়ালা এসে রাস্তার বাতিতে বাতিতে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে গেল; একজন পুলিশ রোজনামচার বইখানা বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর এক গণিকালয়ের এক খবরগিন্নী দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে এক দোকানে এসে ঢুকল।

নিউরা মেয়েটা ছোটখাট গড়নের; চোখদু'টো তার নীল, রঙ ফর্সা, চুলগুলো চিকণ, কপালের নীল শিরাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মুখখানি দিব্যি ভালোমানুষের মতো। বেশ চটপটে, সব কিছুতেই নাক গলানো চাই; সকলের মতেই মত দিতে পারে; একখানি গেজেট বলা যেতে পারে তাকে; আর এত তাড়াতাড়ি কথা বলে সে যে, মুখ দিয়ে থুতু ছিটতে আর ফেনা উঠতে থাকে—কচি ছেলেমেয়েদের মতো! সামনের ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে অন্য এক বাড়ীর এক খিদমৎগার—ষণ্ডামার্ক মতো চেহারা—দৌড়ে পাশের একটা গণিকালয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

"প্রোখোর আইবানোবিচ্, ও প্রোখোর আইবানোবিচ্!"—নিউরা ডাকতে লাগল তাকে।

"আরে, এদিকে এসই না একবার!"—লিউব্কাও যোগ দিলে।

নিউরা হাসতে হাসতে চেঁচাতে লাগল: "আরে, পাছ'খানা অন্তত গরম করে যাও!"

এমন সময় সদর দরজা খুলে দেখা দিল এম্মার গম্ভীর মূর্তি।

"ও আবার কী অসভ্যতা!"—ধমকে উঠল এম্মা: "কতবার বলতে হবে যে দিনের বেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় আসবে না! তাও আবার ঐ পোষাকে! তোমাদের কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান হবে না? ছিঃ, ছিঃ! খামকা লোকের কাছে নিজেদের মান-সম্মান খোয়ানো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিও যে তোমরা ছোট ইয়ামস্কায়ার যত সব ছোটলোকদের আস্তানায় গিয়ে পড়নি, মনে রেখো সে কথা।"

মেয়েদু'টি সুড় সুড় করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে রান্নাঘরে গিয়ে বসে ফুলের বীচি চিবোতে লাগল।

এদিকে ছোট মান্কার ঘরে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। মান্কা আর জো বিছানার ধারে বসে তাসে '৬৬' খেলছে। জো-কে দেখতে ভালোই, ভ্রূদুটি বাঁকানো, চোখদুটি ভাসা ভাসা, রঙ ফর্সা, রুশীয় গণিকা বলে বেশ চেনা যায়। ছোট মান্কার প্রাণের বন্ধু জেনী তাদের পেছনে শুয়ে শুয়ে মঁসিয়ে দুমার লেখা 'রাণীর হার' নামে একখানা ছেঁড়া উপন্যাস পড়ছে, আর সিগারেট ফুঁকছে। বাড়ীর মধ্যে ও একাই বই পড়তে ভালোবাসে, পড়েও বেশ মন দিয়ে। রোমাঞ্চকর দ্বন্দ্বযুদ্ধের গল্প বেশ ভালো লাগে ওর—কোন বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধের আগে নিজের জুতোর ফিতে খুলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝাচ্ছে যে সে যুদ্ধে এক পা'ও হঠ্বে না, তারপর শত্রুকে তরোয়াল দিয়ে বিঁধে হয়তো দুঃখ করছে যে শত্রুর দামী জামাটায় একটা ফুটো হয়ে গেল, কিংবা গল্পের নায়ক সোনার ভরা থলি এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলছে—এই সব। চতুর্থ হেন্রীর প্রেম-কাহিনীও ওর মন্দ লাগে না। আসল কথা, সে ভালোবাসে ফরাসী ইতিহাসের রোমাঞ্চকর বীরত্বের বিচিত্র কাহিনী।

জেনী কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী, আর কাজের মেয়ে; লম্বাটে, ছিপছিপে, চোখদুটি সুন্দর, একটু যেন গোঁফের রেখা আছে!

ঠোঁট থেকে সিগ্রেট না নামিয়ে, আঙুলে থুতু লাগিয়ে বইয়ের পাতার পর পাতা উল্টে যায় সে। পেটিকোট হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে, পায়ের গড়ন খুব ভালো নয়—পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় কড়া পড়েছে বিস্তর।

কাছেই পায়ের 'পরে পা দিয়ে বসে আছে তামারা। কী যেন সেলাই করছে সে মাথা নীচু করে। ভারী শান্ত মেয়েটি। দেখতেও বেশ। চকচকে গাঢ় রঙের চুল। আসলে তার নাম গ্লিসেরা, কি গ্লিউকেরিয়া। কিন্তু গণিকালয়ে ও ধরণের নাম, যেমন মাত্রেনাস, আগাথাস, সাইক্লিটিনিয়াস, এসব চলে না।

তামারা এককালে ছিল সন্ন্যাসিনী, কিংবা কোন মঠের নবীনা ব্রতচারিণী। ওর মুখে আজও লেগে আছে নবীনা ব্রতচারিণীদের মতো নম্রতা, গাম্ভীর্য ও ঈষৎ শ্লেষের ছাপ। একা একা থাকতেই ভালোবাসে ও। নিজের গত-জীবনের কথা নিয়ে আলোচনা করা পছন্দ করে না মোটেই। কিন্তু হাবেভাবে আর চোখের চাউনিতে মনে হয় সন্ন্যাসিনী হওয়া ছাড়াও ওর গত-জীবনের ইতিহাস অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। কী একটা ব্যাপারে অন্যান্য মেয়েরা জানতে পারলে, তামারা ফরাসী আর জার্মান্ ভাষা বেশ বলতে পারে। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা সংযম আর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বাইরে সে শান্তশিষ্ট হলেও, বাড়ীশুদ্ধ সবাই ওকে বেশ খাতির করেই চলে—তা সে বাড়িউলী থেকে আরম্ভ করে বড়ো, ছোট দুই খবরগিরনী, মায় খিদ্‌মৎগারটা অর্থাৎ যে হচ্ছে গিয়ে গণিকালয়ের খাঁটি সুলতান, তার প্রধান নায়ক, এবং সকলেরই ভয়ের পাত্র, সে পর্যন্ত!

রঙের তুরুপ মেরে জো বল্লে: "নে, এবার ঠেকা। আমার হয়েছে চল্লিশ। আর আছে ইস্কাপনের টেক্কা, মানে দশ ফোঁটা—বুঝেছ, মান্‌কা রাণী। মোট সাতান্ন আর এগারো—আটষট্টি। তোর কত?"

"মোটে তিরিশ।"—গম্ভীর হয়ে বল্লে মান্‌কা: "তোর খেলা মনে

আছে তাই।…আচ্ছা, এর পর কী হবে ভাই তামারোচ্কা?"—বলে তার বন্ধুর দিকে মুখ ফেরায় মান্কা। "তুমি বলে যাও, আমি শুনছি।"
জো ময়লা পুরোনো তেলচিটে তাসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মান্কাকে ঘাঁটতে দিলে।
ততক্ষণে তামারা সেলাই না থামিয়েই শান্তকণ্ঠে বলতে সুরু করে দিয়েছে: "সত্যি ভাই, মঠে যখন ছিলাম সে এক রকম সেলাই ছিল; সোনা, ঘাস, ফুল দিয়ে বেদীর ঢাকা সেলাই হতো। শীতের সময় ঘরের মধ্যে বসে আলো অন্ধকারে এসব করতাম। তেলের আলো জ্বলত, ধূপধুনো পুড়ত, ফুলের গন্ধ আসত। কারও গল্প করবার উপায় ছিল না—গুরু-মা ছিলেন ভীষণ কড়া। কখনও কখনও ধর্মসংগীত গাইতাম আমরা, ভালোই গাইতাম! বেশ কাটত দিনগুলো —বাইরে তুষারপাত হতো, জানলা দিয়ে তাই দেখতাম। সে সব এখন যেন স্বপ্ন!—"
জেনী পেটের ওপর ছেঁড়া উপন্যাসখানা রেখে জোরে মাথায় ওপর দিয়ে পোড়া সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল: "তোদের ও-সব গল্প আমার জানা আছে, ছেলে হলেই ছুঁড়ে ফেলে দিতিস তো! তোদের ঐ মঠমন্দিরগুলো হচ্ছে শয়তানের আড্ডা।"
"চল্লিশ।—আগে ছিল ছেচল্লিশ—ব্যস!"—আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ছোট মান্কা।
তামারা লেওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির আঁকা মোনা লিসার মতো হাসি হেসে বল্লে: "লোকে সন্ন্যাসিনীদের বিষয়ে অনেক কিছুই বলে বটে। আর যদি কচিৎ কালেভদ্রে কোনই বা পাপ —"
গম্ভীর ভাবে জো হঠাৎ বলে উঠ্ল: "কোরো না পাপ, সয়ো না তাপ।"
খানিকক্ষণ তামারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে জেনী বল্লে: "তামারা, তুই ভাই এক অদ্ভুত মেয়ে। তোকে যতই দেখি ততই অদ্ভুত মনে হয়। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারছি কিসের লোভে এই সোন্কার মতো যত সব বেহুদ্দে মিনষেরা পীরিতের খেলার জন্যে হেদিয়ে মরে। ঐ তো ওদের আহাম্মুকি। তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় অনেক পোড়

খেয়েছিস তুই, খেয়েছিস নানান ঘাটের জল ; তবুও তুই যে এ সব হ্যাংলাপনার প্রশ্রয় দিস সেইটেই আশ্চর্য। যাক, ওটা সেলাই করছিস কি-জন্যে ?"

"একটা কিছু করে সময়টা কাটাতে হবে তো। আমি আবার তাস খেলতেও পারি নে—ভালোও লাগে না।"—উত্তর দেয় তামারা।

মাথা নাড়তে নাড়তে বলে যেতে থাকে জেনী : "সত্যি, তুই অদ্ভুত! আমাদের সকলের চেয়ে তোর আয়ই বেশি। লোকে তোকে দেয় থোয়ও ঢের। অথচ টাকা না জমিয়ে বোকার মতো কেবলই খরচ করিস তুই। সাত রুবল দামের আতরের কী দরকার তোর বল দেখি ? তারপর ঐ সিল্কের জামা, পনের রুবল দিয়ে কিনলি, কেন ? তোর সেনেস্কার জন্যে না কি ?"

—"হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেনেস্কার জন্যেই।"

—"মাইরি, কী রত্নই না কুড়িয়ে পেয়েছিস! পয়লা নম্বরের চোর ওটা। আসে সেনাপতির মতো যেন ঘোড়ায় চড়ে। অনেক ভাগ্যি যে এখনও ওর হাতে মার খাস নি তুই। চোর ছ্যাঁচড়ের কম্মই তো ঐ। ভয় করে না তোর ?"

দাঁত দিয়ে সুতো কেটে তামারা বলে : "আমার প্রাণ যা দিতে চায় তার বেশি তো দেব না কিছুতেই।"

—"ঐ জন্যেই তো আমার আরও আশ্চর্য লাগে। তোর মতো যদি রূপ আর বুদ্ধি থাকত তা হলে একটা বেশ বড়ো গোছের রুই-কাৎলা পাকড়ে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতুম।"

"যার যেমন অভিরুচি, জেন্নেচ্‌কা। তুইও তো খুবই সুন্দরী, মনকাড়া মেয়ে ; চরিত্রবল আছে তোর, আছে সাহস। তবুও তুই আর আমি দু'জনেই শেষ অবধি এসে ঠেকেছি এই একই ঘাটে।"

ক্ষেপে ওঠে জেনী, তিক্তকণ্ঠে বলতে থাকে : "বটে! তা কেন! তোরই কপাল ভালো।...তোর ঘরেই যত সব ভালো লোক আসে। আর আমার কাছে আসে যত সব বুড়ো-হাবড়া, আর না হয় কচি খোকার দল। আমার কপালটাই মন্দ। খোকাবাবুদের নাক দিয়ে জল ঝরে, বুড়োহাবড়াদের মুখে ফেনা উঠতে থাকে। ঐ সব খোকাদের

'পরে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কেমন এসে ঢোকে ভয়ে ভয়ে, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে থাকে কাঁপতে কাঁপতে; তারপর কাজ হয়ে গেলে লজ্জায় চোখ তুলেও চাইতে পারে না। তখন মনে হয় দিই নাকে এক ঘুঁসি বসিয়ে। টাকা দিতে গিয়ে পকেটের মধ্যে তা মুঠো করে ধরে রাখে, নোটখানা গরম হয়ে ওঠে আর ঘামে ভিজে যায়! দুধের ছেলে আর কী! তার মা হয়তো দিনে দশ কোপেক করে দেয় তাকে জলখাবারের জন্যে, আর তিনি তাই থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন মেয়েমানুষের মাংস! শোন বলি তবে: কয়েকদিন আগে মিলিটারী ইস্কুলের একটি অল্পবয়সী ছাত্র তো এলেন আমার ঘরে। ঠাট্টা করে বললুম তাকে: 'এই নাও, লক্ষ্মীটি, চকোলেট, যাওয়ার সময় চুষতে চুষতে যেও!' শুনে তো বাবু রেগে টং প্রথমে; কিন্তু লোভ সামলাতে পারলেন না। লক্ষ্য করে দেখি—রাস্তায় বেরিয়েই খোকা-নাগর আমার চকোলেট মুখে পুরেছেন! বিচ্ছু!"

"বুড়োদের নিয়ে আরও মুস্কিল! কী বলিস, জো?"—মিঠে গলায় বলে ওঠে ছোট মান্‌কা, আর দুষ্টুমি করে চায় জো-র দিকে।

জো ততক্ষণে তাস খেলা শেষ করেছে। মান্‌কার কথা শুনে সে হাস্‌বে, না রাগবে, বুঝতে পারে না। মানে, জো-র ঘরে প্রায় নিত্যি আসে উচ্চপদস্থ এক শাঁসালো বুড়ো,—বেশ বড়ো সংসার তার! বুড়োর আবার রয়েছে একটা বিদঘুটে রকমের অশ্লীল অভ্যাস। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ঐ নিয়ে করে হাসাহাসি।

জো কী করবে এর মধ্যে ভেবে নিয়েছে। সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে, "আ গেল যা—মরণ আর কী! জাহান্নমে যাক বুড়ো তোদের নিয়ে।"

"তবু, বুঝলি জোয়েন্‌কা, তোর ঐ বুড়ো ডিরেক্টর বাহাদুর, কি আমার ঐ খোকা নাগরের চেয়েও খারাপ হচ্ছে তোদের মত সব পীরিতের নাগর। কী সুখ রে ওতে? বাবু আসেন মাতাল হয়ে, ভাবখানা দেখান যেন একজন কেউ-কেটা, তারপর তোমায় নিয়ে ফুর্তিবাজি করে যান চলে। কী এল গেল তাতে? কৈ, কিছুই তো নয়! তবুও হ্যাংলে মরিস তোরা। কী আমার নাগর রে! সমাজের সব চেয়ে

মোওরা আবর্জনা, গায়ে ছাড়ে দুর্গন্ধ, সারা অঙ্গে মারামারির দাগ, —শুধু ঐ একটা গরব আছে তার, সে হচ্ছে তামারুকার হাতে বোনা ঐ রেশমি আঙরাখাখানা। কুকুরীর বাচ্চা ঐ, সে আবার গাল দেয় লোকের মা তুলে, মারামারির জন্যে হেদিয়ে মরছে তার প্রাণ,—উঃ! নাঃ!"—বলতে বলতে হঠাৎ কেন কী জানি পুলক জেগে ওঠে জেনীর; মান্‌কাকে বিছানার ওপর ফেলে দু'হাতে জড়িয়ে তার চুলে, ঠোঁটে, চোখে, চুমু খেতে খেতে গদগদ স্বরে বলতে থাকে:—"আমি কিন্তু আমার এই মান্যেচ্‌কাকে আমার এই ছোট্ট-মান্‌কাকে, ফরসা মান্‌কাকে মান্‌কা-কলঙ্কিনীকে সব চাইতে ভালোবাসি।"

"ছাড়, ছাড়—কী হচ্ছে জেন্‌কা!"—নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ঝটাপটি লাগিয়ে দেয় ছোট মান্‌কা।

যখন রেহাই পায় তখন তার চিকন চুলের রাশ এলোমেলো হয়ে গেছে; ধস্তাধস্তিতে গাল দু'টো হয়ে উঠেছে রাঙা—লজ্জায়-কৌতুকে চোখ দু'টো হয়ে পড়েছে ঝাপ্‌সা ও নত!

বাস্তবিকই, মান্‌কা মেয়েটা হচ্ছে এ বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে শান্ত-শিষ্ট। প্রাণে মায়ামমতাও আছে। সকলের মন রাখতে চেষ্টা করে। একটুতেই লজ্জা পায়—তখন দেখতে তাকে ভারী সুন্দর লাগে। তাই তাকে সবাই ভালোবাসে। রাত্রে কিন্তু ৩।৪ গেলাস মদ পেটে পড়লে তাকে আর চেনবার যো থাকে না। তখন ঘরের-অতিথির ওপরও হাত তুলতে সঙ্কোচ হয় না তার। কিংবা মদভরা গেলাস কি বাতিদানই হয়তো দেয় উল্টে; বাড়ীউলীর চৌদ্দপুরুষকেও স্বর্গে তুলে দিতে দ্বিধা হয় না তার। এ সব সময় বাড়ীউলীর, কি খিদমৎগারের, এমন কী সময় সময় পুলিশের পর্যন্ত, হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। জেনী ওকে দেখে থাকে কেমন এক অদ্ভুত মমতার চোখে।

—"এই মেয়েরা সব, খেতে চলো!"—বাড়ীর ছোট-গিন্নী যোসিয়া বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে। "চলো সব—খাওয়ার সময় হয়েছে।"

সবাই রান্নাঘরে যায়—সেই পোষাকেই, হাত-মুখ না ধুয়েই। তৈরি হয়েছে টমেটোর সুপ্, কাট্‌লেট্, ক্রীম-রোল্। কিন্তু তেমন খিদে

নেই কারোর। ইস্কুলের মেয়েদের মতো সবাই প্রায় দোকান থেকে মুখরোচক এটা-ওটা-সেটা আনিয়ে খেয়ে খিদে নষ্ট করে ফেলেছে। কেবল পাড়াগেঁয়ে মেয়ে নীনা, চারজনের খাবার ও একাই খায় ; এদের মতো এখনও তার খিদে নষ্ট হয়নি। নতুন এসেছে সে এখানে। এক দোকানদার তাকে গ্রাম থেকে ভুলিয়ে এনে এখানে বিক্রী করে দিয়ে গেছে।

জেনী ক্রীম-রোলে এক কামড় দিয়ে নীনাকে বলে, "লক্ষ্মী ফেক্রুশা, তুই আমার এই কাট্লেট্টা খা, আমার খিদে নেই। তুই খেলে বরং তোর শরীর ভালো হবে।"

তারপর আর সবাইকে ডেকে সে বলে, "শোন তোরা, আমাদের নীনার পেটে ফিতে-কিরমি আছে, তাই ও বেশি খেতে পারে—নিজের পেট আর পোকাটার পেট দুটো পেট ভরাতে হয় কি না!"

নীনা যায় চটে।—"আমার পেটে, না তোর পেটে আছে ফিতে-কিরমি ? তাই তুই দেখতে অমন রোগাটে।"

তারপর চুপ করে নিজের মনে ধীরে সুস্থে খেয়ে উঠতে না উঠতেই তার একটু তন্দ্রা আসে।

ইতিমধ্যেই আবার যোসিয়ার গলা শুনতে পাওয়া যায় : "কই গো মেয়েরা, নাও, এবার সব সাজগোজ করোসে, দেরি কোরো না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঔষধি-সাবান আর সস্তা ও-ডি-কোলনের গন্ধে ঘরগুলো সব ভরে ওঠে। মেয়েরা সব সন্ধ্যারাণী সাজছে।

—চার—

গোধূলির সোনালি আলো ক্রমে গাঢ় কালো অন্ধকারে পরিণত হয়। আনা মারকোভ্নার গণিকালয়ের খিদমৎগার সাইমন বৈঠকখানায় আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায় ; বাইরে ঝুলিয়ে দেয় লাল আলো। সাইমন লোকটা বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা,—বৃষস্কন্ধ, বসন্তের দাগের জন্যে ভ্রূ আর গোঁফের জায়গায় জায়গায় চুল গজাতে পারেনি। দিনের বেলা তার ছুটি, তখন তার নিদ্রার সময়। রাত্রে দরজার কাছের আলনার পেছনে

বসে থাকে সে; অতিথিদের কোট খুলতে সাহায্য করে, আবার পরিয়েও দেয়, আর হঠাৎ কোনও গণ্ডগোল হলে, সে জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পিয়ানো-বাদক আসে—লম্বা ছিপ্‌ছিপে ছোক্‌রা। ভ্রূ আর চোখের পাতা শাদা। ডান চোখে ছানি পড়েছে। অতিথিদের আসবার আগে সে আর ইসাইয়া সাবিচ্‌ 'পিঠেপুলির নাচন' নামের নাচের বাজনাটা ঠিক করে নেয়। আজকাল ঐ নাচটারই চলন হয়েছে খুব বেশি। কোনও অতিথি যদি নাচের বাজনার ফরমাস করে তবে তাকে সাধারণ বাজনার জন্যে দিতে হয় ত্রিশ কোপেক, আর শক্ত হলে আধ রুবল। অবশ্য এর অর্ধেক যায় আনা মারকোব্‌নার পকেটে আর অর্ধেক বাজিয়েরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। বিলাসিনীরা অতিথিদের কাছে তাদের পিয়ানো-বাদকের শতমুখে প্রশংসা করে।

আনা মারকোব্‌নার বাড়ীর সবাই সেজেগুজে খদ্দেরের অপেক্ষা করছে। নিজেদের নাগর ছাড়া অন্য সমস্ত পুরুষের প্রতিই প্রায় প্রত্যেক মেয়েরই যদিও কেমন এক নির্লিপ্ত উদাসীনতা—এমন কি, রূঢ় উপেক্ষার ভাব—রয়েছে, তবুও কেন যেন প্রতি সন্ধ্যায়ই তাদের অন্তরে ক্ষীণ আশার দুরু দুরু স্পন্দন জেগে ওঠে; তারা প্রত্যেকেই ভাবে—আজ না-জানি কোন্‌ নবাগত আসবে তার ঘরে, হয়তো আজ এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে করে তার জীবনের চাকা যাবে একেবারে উল্টো দিকে ঘুরে।—এ যেন অনেকটা জুয়াড়ীর তখনকার সেই মনোভাব, ট্যাকের কড়ি গুণতে গুণতে যখন চলেছে সে জুয়ার আড্ডায় আসর জমাতে। তা' ছাড়া দেহপসারিণীদের মধ্যে যৌন অবসাদ সত্ত্বেও, নারীজাতির যা অন্তরতম সংস্কার তা' তারা তখনও হারায় নি—সে হলো লোককে সুখী করবার আকাঙ্ক্ষা।

আর বাস্তবিকই এ সব জায়গাতে প্রায়ই চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেও থাকে। হঠাৎ হয়তো পুলিশ ছদ্মবেশী গোয়েন্দার সঙ্গে এসে ভদ্রবেশী কোনও অতিথিকে গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চলে গেল। কিংবা হয়তো মাতালে মাতালে বেধে গেল মারামারি। জানালার সার্শিগুলো গেল ভেঙে। মাথা ফাটাফাটি, রক্তারক্তি, হৈ চৈ! আর তার মধ্যেই

পাছা থাবড়ে থাবড়ে নাচ সুরু করে দিলে জেনকা। অন্য মেয়েরা ততক্ষণে হয়তো ভয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

এমনও হয়, কোনও খাজাঞ্চী টাকা ভেঙে দলবল নিয়ে এল ফুর্তি করতে করতে। এর পর তার অদৃষ্টে আছে হয় আত্মহত্যা, নয় হাজতবাস। এই সব ক্ষেত্রে বাড়ীর দরজা-জানলা সব এঁটে বন্ধ হয়ে যায়; তারপর চলে দু'দিন দু'রাত ধরে অষ্টপ্রহর সেই চিরন্তন রুশীয় উন্মাদনা— ভুতুড়ে কাণ্ড, অসহ্য বর্বরতা, উন্মত্ত চিৎকার, অবিরল অশ্রুজল, আর নারীদেহের উপর অকথ্য অত্যাচার। নগ্ন দেহে ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে, মোটা থলথলে মেয়েমানুষের সঙ্গে মাতাল হয়ে নাচতে নাচতে মেঝেয় তারা সব যায় গড়াগড়ি। মদের গন্ধে, গায়ের ঘামে, একাকার হয়ে ঘরময় হয় একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি।

মাঝে মাঝে হয়তো কোনও সার্কাস দলের খেলোয়াড় আসে,— বিরাট বপুখানা নীচু ছাদওয়ালা ঘরের মধ্যে দেখায় ভারী বেমানান, ভ্রম হয় মানুষের আস্তানায় আস্তাবল থেকে এসে ঢুকেছে বুঝি কোন্ ঘোড়া! আসে নীল কোর্তা গায়ে, শাদা মোজা পায়ে কোনও চীনা; কিংবা নিকষ-কালো এক নিগ্রো—সাদা জামা, আর ছিটের পাজামা পরে বুকে ফুল গুঁজে, আসে সে ফুর্তি করতে; মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, লোকটার গায়ের রঙ লেগে জামাটাও কালো হয়ে যাবে না তো!

নতুন নতুন পুরুষ দেখে বিলাসিনীদেরও যৌন উত্তেজনা হয়। কেউ যদি এ রকম কোন অতিথি পায়, অন্যেরা তাকে হিংসে করে থাকে।

একবার সাইমন নিজে সঙ্গে করে এনেছিল একটা লোককে। লোকটা গম্ভীর, চোয়াল উঁচু; ঘরে ঢুকে চারদিকে বেশ করে দেখে নিয়ে শেষে মুটকী কিটিকে ব্যবসাদারী চালে হুকুম করলে—'চলো দেখি।' তারা দু'-জনে ঘরে গিয়ে দোর দিতেই সবজান্তা সাইমন তার মনের মেয়ে নিউরাকে চুপি চুপি খবরটা দিলে,—'জানিস ও কে? ওর নাম ভেন্না ভসেৎকো। গেল বছর একাই দু'দিন ধরে এগার জন খুনীকে ফাঁসিতে লটকেছে ও।' খবরটা যখন সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল তখন সকলেই কিটিকে করতে লাগল হিংসে।...আধ ঘণ্টা পরে যখন কিটির ঘরের দরজা খুলে

লোকটা সোজা বেরিয়ে গেল গম্ভীর চালে, মেয়েরা সব হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত করে তুললে কিটিকে। নতুন চোখে —যেন অবাক হয়ে—দেখতে লাগল তারা কিটিকে, তার বিছানাটাকে পর্যন্ত—তখনও দুমড়ে রয়েছে তার চাদরের ভাঁজ। কিছুই বলতে পারলে না কিটি, শুধু তার মোজার মধ্যে থেকে একটা পুরনো তেলচিটে নোট বের করে সবাইকে দেখালে তার আয়, বললে—"আর পাঁচজন যেমন হয়ে থাকে তেম্নিই এক মিনুষে।" কিন্তু যখন শুনলে তার পরিচয়, বেচারা কেন যে কেঁদে ফেল্লে, তা সে নিজেই বুঝলে না।

লোকটা কিটির সঙ্গে কোনও রকম অসদ্ব্যবহার করে নি, প্রেম-পাগলও হয়ে ওঠে নি সে। বরং অবহেলাই করেছে সে কিটিকে। লোকে একটা কুকুর কি ঘোড়া, কিংবা একটা ছাতা, কোট কি টুপিকেও যতটুকু যত্ন করে থাকে, কিটির 'পরে ততটুকু মনোযোগও দেয় নি লোকটা। সে যেন ছিল একটা নোঙরা, বিশ্রী জিনিস, যা সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে দরকার হয়েছিল মাত্র, তারপর কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজাতীয় ঘৃণায় দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হয়তো মুটকী কিটির কান্নাটা আসলে এই অবহেলাটুকুর জন্যেই। তবুও তার অবোধ মনের কাছেও মনে হলো মিছে অকারণে তার এই কান্না।

আরও অনেক কিছুই হয় এখানে। এই সব হতভাগিনীদের প্রাণ নিয়েও পড়ে টানাটানি। হয়তো কোনও বর্বর কারও ওপর রেগে গিয়ে ছুঁড়লে পিস্তল, কিংবা দিলে বিষ খাইয়ে গোপনে। আবার গোবরে পদ্মফুলের মতো বিশুদ্ধ প্রেমও দেখা যায় এখানে,—তবে তা' একান্তই বিরল ব্যাপার। কত বিলাসিনী যে তাদের নাগরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—অবশ্য ফিরে আসতে হয়েছে প্রায় সবাইকেই। আবার, কচিৎ কোনও রঙ্গিণীকে গর্ভিণীও হতে দেখা গেছে; তখন তাকে সকলের কাছে হতে হয়েছে লজ্জিত ও হাস্যাস্পদ—ব্যাপারটার গভীরতা বাস্তবিকই হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী।

সে যা-ই ঘটুক, প্রতিটি সন্ধ্যাই এদের মনে জাগিয়ে দেয় চাঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চকর, একটা নতুন আশা; নইলে এই মনোবলহীন, অলস নারীদের জীবন হয়ে পড়ত আরও নির্জীব।

—পাঁচ—

তা' একদিন আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ে এক অদ্ভুত ঘটনাই ঘটল বটে! ইয়ামাবাসীদের কাছে তা একটু নতুনও বৈ কি!

শীতের এক সন্ধ্যা—ছ'টা বাজে তখন। বাইরের দরজার কে এসে যেন ঘণ্টা নাড়লে। সাইমন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলে—"কাকে চাই?"

"বাড়িউলীকে।"

"কেন?"

"দরকার আছে, এখানে থাকতে চাই।"

"একটু অপেক্ষা করতে হবে, খবর দিচ্ছি।"

এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না সব শুনে প্রথমেই প্রশ্ন করলে, 'মেয়েটি দেখতে কেমন,' 'কেমন সেজে এসেছে,' 'পুলিশের গুপ্তচরী নয় তো?'—তারপর আনতে হুকুম দিয়ে সাইমনকে কাছেই কোথাও থাকতে বলে দিলে—কী জানি যদি কোনও দরকার পড়ে!

মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকল। এম্‌মা বেশ করে তাকে দেখে নিয়ে বুঝল এ পথে সে নবাগতা। কালো সিল্কের পোষাক পরা, মুখে কিছুই মাখে নি, বেশি লম্বা নয়, দেখতেও বেশ। বয়স—হয়তো কুড়ির বেশি হবে না, জিজ্ঞাসা করল—"মাদামের বয়স কত?"

"ছাব্বিশ।"

"কিন্তু দেখতে তো দেখি ছুকরীর মতো! পোষাক খুলতে আপত্তি আছে?"

"একেবারে?"

"হ্যাঁ, একেবারে। ভয় নেই, ঘর গরম আছে।"

বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে উলঙ্গ হয়ে সামনে দাঁড়াল মেয়েটি। সপ্রশংস কণ্ঠে বল্লে এম্‌মা—"বেশ! এভাবে মেয়েরা শুধু মেয়েদেরই সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পায়, পুরুষদের সামনে নয়।"

পাকা জহুরীর মতো সারা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে এম্‌মা বল্লে : "নাঃ, শরীর বেশ তাজাই আছে দেখছি। মাইছুটোও বেশ ডবডবে। উরুৎ আর পায়ের গোছাও বেশ শক্ত। নোঙরা ব্যামোফ্যামোর কোনও চিহ্ন নেই দেখছি। তা' ডাক্তারী পরীক্ষা হবে। দাঁতও মন্দ নয়।···একটা বুঝি বাঁধানো।···হয়েছে, এবার পোষাক পরতে পার।"

মেয়েটি এবার জিজ্ঞাসা করলে—"আমাকে দিয়ে চলবে ?"

হাসলে এম্‌মা : "চলবে বৈ কি! তবে কথা হচ্ছে, আমরা স্বাধীনা জেনানাদের এসব জায়গায় ভর্তি করি নে বড়ো।"

"কেন, কারও প্ররোচনাতে তো আমি আসছি নে, নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি।"

—"তা তো বুঝলাম, কিন্তু যদি তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন তোমার খোঁজ করে, বা তোমার জানিত কেউ এখানে ফুর্তি করতে এসে তোমায় চিনে ফেলে—তখন ?"

—"তার জন্তে ভয় করবেন না। আমি এখানকার নই, পিটস্‌বার্গ থেকে আসছি।"

—"তা-ও যেন হলো"—আমতা আমতা করে বলে এম্‌মা,—"চেহারা দেখে তো মনে হয় বেশ বড়োঘরের ঘরণী গো, ছেলেমেয়েও হয়তো আছে।"

—"নাঃ, কেউ নেই আমার,"—জোর দিয়েই বলে মেয়েটি : "স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে,—যাক সে কথা। আমি আপনার সব নিয়মই মেনে চলতে রাজি আছি। দেখবেন, কথাবার্তায় আপনাদের উপযুক্তই হব মনে করি।"

—"সে তো ভালো কথা! সব নিয়ম মেনে চললে বেশ খুশীই হব।"

—"কী আপনাদের নিয়ম, শুনি ?"

—"এই ধরো, তোমার পাশপোর্টখানা নিয়ে নেওয়া হবে; আর তোমাকে যেতে হবে পুলিশের কাছে। সেখানে তোমাকে একখানা হলদে টিকিট দেবে—তাতে থাকবে তোমার নাম, তোমার বাবার নাম,

পদবী—আর ব্যবসা লেখা থাকবে 'বেশ্যাবৃত্তি'। পাশপোর্টখানা পুলিশের জিম্মায় থাকবে। তা আবার ফেরৎ পাওয়া বড়ো মুস্কিল।"

—"দরকার নেই আমার পাশপোর্টে।"

—"প্রতি সপ্তাহে পুলিশ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষা হবে কিন্তু।"

—"সে তো ভালোই।"

—"ঠিক বলেছ, ব্যবস্থাটা ভালোই। হ্যাঁ, নিজের স্বাস্থ্য ভালো রাখবার নিয়মগুলো তোমায় বলে দিতে হবে না বোধহয়। প্রেমের ব্যবসাতে এটা বিশেষ দরকার। আর এ-ও বোধহয় জান—যে-ই তোমাকে পছন্দ করবে তারই শয্যা-সঙ্গিনী হতে হবে তোমায়। ঘেন্নায় যদি বমিও ঠেলে আসে, তবু আপত্তি করতে পারবে না।"

—"চোখ বুঁজে সব সহ্য করব, তা সে যতই কষ্টকর হোক। আর কিছু—?"

—"হ্যাঁ, আর এক কথা, ঘুমের নেশা করবার অভ্যাস আছে নাকি?"

—"না:, মরফিয়া, আফিম, কোকেন, কখনও ছুঁইনি। এর ফল কী হয় দেখেছি।"

—"মদ চলে?"

—"কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে পান করি, নইলে নয়।"

—"বলছি শোনো। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তাই বলা। মদ খাও না—ভালোই। তবে শাঁসালো খদ্দেরকে খুশী করতে হলে একটু-আধটু খেতে হয়। এতে লাভও মন্দ হয় না। বোতল পিছু শতকরা পাঁচ রুবল থাকবে। খেয়ে জ্ঞানটা যেন আবার টনটনে থাকে।"

—"চেষ্টা করব।"

—"হাঁ, আর একটা বিষয় তোমাকে জানানো উচিত। কথাটা হচ্ছে—মানে সব খুলে বলাই ভালো, কিছু মনে কোরো না—অনেকে অনেক রকমের নোংরামি করে তোমায় জ্বালিয়ে মারবে, উপহারও দেবে অনেক কিছু—সে সবই তোমার—শুদ্ধ প্রতিষ্ঠানের আইন মাফিক ট্যাক্স আর নাগরের ঘাড় ভেঙে যা খাওয়া দাওয়া করবে তার দাম দিতে হবে। কাজেই যদি কেউ তোমার কাছে অন্যায় কিছু দাবি করে—ইচ্ছে করলেই স্রেফ 'না' বলতে পার। সে জন্যে আমরা তোমাকে জোর

করব না, বা করতেও পারি নে,—তা-ও বলি লোকটিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কিন্তু, তাহলে সেটা হবে চুক্তিভঙ্গ। তবে এও ঠিক, যদি এ সমস্ত অদ্ভুত লোকদের লালসা পূর্ণ করতে পার তবে অনেক কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে।"

"এ সব বিষয় ভেবে দেখব, তবে প্রত্যেকের সঙ্গে—"

—"আচ্ছা, তোমাকে মাঝে মাঝে না হয় ছুটি দেওয়া হবে, তবে ট্যাক্স, আর অতিথিদের নিয়ে খাও, বা না খাও, প্রত্যহ দশটি করে কোপেক খাওয়ার খরচ বাবদ দিতে হবে। তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, অথচ কেউ যদি তোমার সঙ্গ কামনা করে, তুমি বলতে পার যে তুমি অসুস্থ হয়েছ—না শোনে, পুলিশের হুকুমনামা দেখিয়ে দেব; ভালো মেয়েদের জন্যে এসব আমরা করে থাকি।"

"ধন্যবাদ।"

—"যদি কিছু মনে না কর, এ পথে এলে কেন? সহজে আয় হয় বলে? জীবনে বিতৃষ্ণ হয়েছ? কিংবা কারও 'পরে প্রতিশোধ নিতে এ রকম করছ না তো—বা স্রেফ একটা কৌতূহল?"

—"নাঃ, মাদাম যা ভাবছেন তার কোনটাই নয়। গোপনে বলছি—শুদ্ধ মাত্র পুরুষের সঙ্গলাভের লালসায় এখানে আসা। মাত্র একজনের নয়—বহুর। সমাজে থাকলে তা হবার উপায় নেই। সেখানে কাউকে পেতে হলে কত রকমেরই না ফাঁদ পাততে হয়! পরে যদিই বা আশা পূর্ণ হলো, তারপরই আসে অবসাদ, ক্লান্তি, একঘেয়েমি; শেষে কান্নাকাটি, আত্মহত্যার ভয় দেখানো; শেষ পর্যন্ত নাটকীয় বিচ্ছেদ, না হয় পলায়ন। অতি বিশ্রী! তাই তো এলাম এখানে। সে সব কোনও হাঙ্গামা নেই—ভয় যা একটু রোগের।"

—"না, না, সে ভয় করতে হবে না; সাবধান হবার উপায় বলে দেব তোমায়।" একটু থেমে পরে বললে এম্মা—"সত্যি বলতে কী, তোমাকে আমার বেশ ভালোই লেগেছে। তা হোক, একদিন বেশ করে ভেবে দেখো। তারপর কাল বেলা চারটের সময় আমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। আর একটা কথা, কাউকে নিয়ে জড়িয়ে থেকো না যেন, কাউকে একা মনের মানুষ করে তুলো না।"

—"আমিও তা চাই নে।"

—"ভালোই।"

—"তবে একটা অনুরোধ, মাদাম—"

—"আমার নাম এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না।"

—"হ্যাঁ, মাদাম এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না, দয়া করে কিন্তু কাউকে বলবেন না যে আমি এখানে নানা পুরুষের সঙ্গসুখের জন্যে এসেছি।"

"আচ্ছা।"—ঘাড় নাড়লে এম্‌মা।

*　　*　　*

পরদিন এল মেয়েটি। আনা মারকোব্‌নার পছন্দও হলো, অতএব ভর্তিও হয়ে গেল সে। ইসাইয়া সাবিচ্‌ একটু আপত্তি তুলেছিল,—লেখাপড়া জানা মেয়ে, তাও আবার ভদ্রঘরের, সুবিধে হবে কি? পরে কোনও দোষ না পেয়ে চুপ করে গেছে।

মেয়েটির নতুন নাম হলো ম্যাগ্‌দা বা ম্যাগ্‌দালেন। পুরোনো মেয়েরা ম্যাগ্‌দাকে নিয়ে হাসাহাসি, ফিস্‌ফিস্‌, কত কী করতে লাগল। স্কুলে, সৈন্যদলে, জেলে, সর্বত্রই প্রথম প্রথম এ রকমটি হয়।

তা ম্যাগ্‌দা মেয়েটি ছিল শান্ত, ধীর.সংযমী,—কথা বলার তার ছিল এক মধুর ধরণ। তাই কারও সঙ্গে তার কখনও ঝগড়া বাধত না, কারও সঙ্গে যে গলায় গলায় ভাব ছিল তাও নয়। ক্রমে ক্রমে ঐ বাড়ীতে সে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসলে। শত্রুমিত্র বলতে তার কেউই রইল না, অথচ সবাইকেই সে খুশী রাখতে পারত, দরকার হলে টাকা ধারও দিত, পরামর্শ দিয়ে অন্যকে সাহায্যও করত। তামারাই শুধু মাঝে মাঝে তার ঘরে এসে দশ-পনর মিনিট গল্প করত বটে, কিন্তু জমত না দেখে একটু অভিমান করেই উঠে চলে যেত, বলত: "তুমি যেন কেমন একটু অদ্ভুত, ম্যাগ্‌দা।"

এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না ম্যাগ্‌দার যৌন-রহস্য গোপনই রেখেছে। এম্‌মা নিজেই যেন ম্যাগ্‌দাকে ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে না। সবাই ম্যাগ্‌দাকে পছন্দ করে,—বেঁটে, মোটা, রোগা, আধুনিক, সব রকমের খদ্দেরেরই নজর ওর উপর, কিন্তু সে ঐ একবারের জন্যেই, দ্বিতীয়বার আর কেউ তার ধারে ঘেঁসে না। 'এ আবার কী অদ্ভুত ব্যাপার!'—দেখে

শুনে মনে মনে ভাবে এম্মা,—'দেখতে ভালো, চালাক চতুর, কথা কইতে জানে, আভিজাত্যও আছে, পেঁচিয়ে আদায় করতেও পারে, তবু নাগর থাকে না কেন?' এম্মা তার দুই-একজন ঘনিষ্ঠ অতিথিকে জিজ্ঞেসও করেছে: 'আচ্ছা, ওর ঘরে দ্বিতীয়বার আর যাও না কেন গো?'

প্রত্যেকে প্রায় একই রকমের উত্তর দিয়েছে: 'মানে সবই ভালো, তবে কিনা, কী বলব, বুঝেছ বোধহয়, ঐ যাকে বলে প্রেমের ব্যাপারে ঠিক সুবিধের নয়,—একটু যেন বেশি লাজুক; প্রাণে ঠিক আগুন ধরাতে জানে না আর কী।'

—'কিন্তু,'—বলে এম্মা: 'ছুঁড়ী সুন্দরী তা মানতে হবে, যার তার সঙ্গে ওর মিল খাবে না দেখছি।'

এম্মা ঠিক করলে ম্যাগ্‌দার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা কয়ে দেখবে।

"আচ্ছা ম্যাগডচ্‌কা,"—একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে এম্মা,—"বলো তো জায়গাটা লাগছে কেমন তোমার?"

"খাসা,"—উত্তর দিলে ম্যাগ্‌দা।

"খদ্দেরদের বেশ খুশী করতে পারছ তো?"

"তা কী করে বলব, জানতেও চাই নে কে খুশী হলো না-হলো, নিজের কাজ করে গেলেই হলো।"

"ঐ তো ভুল করলে, ম্যাগ্‌দা,"—একটু যেন বিরক্তই হলো এম্মা, "কেবল নিজেরটি দেখলেই তো চলে না। পুরুষরা চায় মেয়েরা দুঃখু করবে, কাঁদবে কাটবে, মান করবে, কামড়াবে, খিমচোবে, চাই কী দুটো একটা কুচ্ছিত কথাও বলবে। প্রেম করতে গিয়ে পাষাণ হলে চলে না, সুন্দরী! একআধটু ঢং করাও দরকার।"

ম্যাগদা বললে: "একদিন রাতে পাশের ঘরের এ রকম নকল কান্না আর ন্যাকামি আমার কানে এসেছিল। কী বিশ্রী! ও সব আমার আসে না, বাপু।"

"যা ইচ্ছে করগে তবে,"—রাগ করল এম্মা:—"জাঁদরেল না হয়ে শুধু নিখিরাম সদ্দার হতে চাইলে কী আর করা যাবে! যাকগে, যা খুসি —করো গে।"

"কী করব? প্রেমের অভিনয় করতে পারি না যে!"

—"পারতে হবে।"

—"কী করে?"

—"এই সাইমন তোমায় শিখিয়ে দেবে তার চাবুক দিয়ে,"—চটে গেল এম্মা,—"তার চাবুক ছাখ নি বুঝি! ভয় নেই, আমরা ঢের ঢের মেয়েকে এভাবে টিট্ করেছি।"

"তা হলে আমি নালিশ করব।"

"কার কাছে?"—তাচ্ছিল্যের ভাবে বললে এম্মা।

"পুলিশের কাছে, নয় গবর্ণরের কাছে।"

"গবর্ণর থাকেন অনেক দূরে,—আর পুলিশ!"—একটু হাসলে, এম্মা —"তারা তো আমাদের কেনা। তোমার একখানা চিঠিও বাইরে যেতে দেব না, তোমাকে কড়া নজরে রাখব।"

"আমি ঠিক পালিয়ে যাব"—কেঁপে উঠল ম্যাগ্দার স্বর।

"চাঁদবদনী, পালাবে কোথায়? ছিঃ, ও চেষ্টাও করতে যেও না"—ঠাট্টা করলে এম্মা,—"তোমার ভালোর জন্তেই বলছি, বরং এ পথে চলবার জন্তে নিজেকে তৈরি করে নাও।"

* * *

তিন দিন পরের ঘটনা।

ছপুরবেলা। ক্যাপটেনের পোষাক-পরা দীর্ঘকায় অতি সুশ্রী এক যুবক, সেনাবিভাগের একজন অফিসার, আনা মারকোব্নার প্রতিষ্ঠানে এসে ঢুকলেন। পেছনে তাঁর দারোগা বার্কেশ, একেবারে যেন ভিজে বেড়ালটি! ইয়ামায় এমনটি তাকে এর আগে কেউ কখনও দেখেনি।

বেশ ভদ্রভাবেই বললেন সৈনিকপুরুষটি,—"কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

সাইমন বললে,—"এখন এখানে নেই। আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বেন।"

ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলে বার্কেশ—"কর্তা, হুকুম দিলেই আমি সব ব্যবস্থা করতে পারি। এ সব নেংওরা ঘাঁটা তো আমাদেরই কাজ। আপনি কেন এই সব ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলবেন!"

"বেশ,"—ক্যাপটেন বললেন।

"এই,"— গলা ফাটিয়ে হুকুম করলে বারুকেশ,—"বাড়িউলীকে ডাক শীগ্‌গির।"

বাড়িউলী দরজার ফাঁক দিয়ে সবই দেখছিল। এবার তার তলব হওয়ায় দরজাটা একটু ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে বললে,—"কাপড় ছেড়ে আসছি, একটু বসুন।"

"না, না—দেরি করা চলবে না এখন,"—গর্জে উঠল বারুকেশ।

"একটু আস্তে"—অফিসারটি বললেন।

"হুজুর, এরা আস্তে কথা, ভালো মুখে কথা, এ সব বোঝে না। সব সময়ে এদের কড়া শাসনে রাখা দরকার। চলুন ঐ ঘরে যাই তবে।"

পাশের ঘরে একটু পরেই পরিচালিকা এল তাদের কাছে। পুলিশের বড়কর্তার সই করা একখানা কাগজ এম্মার নাকের ডগায় ধরে বারুকেশ চেঁচাতে লাগল,—"এই হতভাগী, এই কাগজে যাঁর নাম লেখা, চিনিস তাঁকে ?"

"চিনি।"

"এঁর নামের হলপে টিকিটখানা দে।" "হুজুর,"—অফিসারের দিকে ফিরে বললে বারুকেশ,—"টিকিটখানা ছিঁড়ে ফেলব, না, আপনাকে দেব ?"

"আমাকে দাও। তার এখানকার নাম কী ?"

"ম্যাগ্‌দা।"

"এখানে বেশ চালাক চতুর কোনও মেয়ে আছে ?"

"তামারা বলে একটি মেয়ে আছে, বেশ চালাক চতুর।"

বারুকেশ আবার গর্জে উঠল,—"কে তামারা ? এখ্‌খুনি এখানে নিয়ে এসো তাকে। যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই আনো।"

তামারা এল, বারুকেশ হুকুম করলে,—"এই, মাদাম ম্যাগ্‌দার ঘরে এখ্‌খুনি যা। তাঁর গা-হাত-পা মুছিয়ে এখুনি সাজিয়ে নিয়ে আয় এখানে। আর তোরা সব ছুঁড়ীরা এখান থেকে পালা, কারও যেন টিকিটি দেখতে না পাই। দেখলেই ধরে নিয়ে যাব।"

খানিক পরে ম্যাগ্‌দা এল,—নির্ভীক, শান্ত, ধীর। তাকে দেখেই

অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে একটু নত হয়ে তার করচুম্বন করলেন। বাবুকেশ সরে গিয়ে কাঠের পুতুলের মতো সিধে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়িউলী বললে,—"এর বিল শোধ করা এখনও বাকি আছে।"

ধমকে উঠল বাবুকেশ,—"যা, যা, ও সব হবে না।" অফিসার তাকে থামিয়ে বিলের টাকা শোধ করে বাইরে দাঁড় করানো গাড়ীতে তুলে ম্যাগ্‌দাকে নিয়ে চলে গেলেন।

*   *   *

তামারা ম্যাগ্‌দাকে যখন সাজাচ্ছিল, তখন দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল—

"তা হলে ম্যাগ্‌দা তুমি আর পাঁচজনের মতো নও!"

"না, ছিলামও না কোনোদিন,"—একটু হাসল ম্যাগ্‌দা।

"তুমি তা হলে বড়োঘরের মেয়ে?"

"না ভাই, বরং বড়োঘরের শত্রু আমি।"

"তা তুমি এখানে এলে কেন? পুরুষ-সঙ্গ লাভে এতই যদি লোভ ছিল তা যেখানে ছিলে সেখানে কি কাউকে পটাতে পারতে না?"

ম্লান হাসি হাসল ম্যাগ্‌দা।—"তামারা, আমার লক্ষ্মী তামারা, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমি পাপিষ্ঠা নই? এখন পর্যন্ত আমি ঠিকই আছি।"

হো হো করে হেসে উঠল তামারা,—"আর হাসিও না, সতী শিরোমণি। রোজ ছ'সাত জন করে লোক বসাতেন, আর উনি ঠিকই আছেন। সতী!"

গম্ভীর হয়ে গেল ম্যাগ্‌দা।—"আচ্ছা, তামারা, তোমার তো বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। ধরো, তুমি সত্যিই একটি ভালো মেয়ে, কিন্তু কেউ একজন জোর করে তোমায় বলাৎকার করলে, তাতে কি তুমি ভ্রষ্টা হয়ে গেলে?"

"তা জানি নে, তবে নষ্ট তো হয়ে গেলাম, ঠিক আগেকার মতনটি তো আর রইলাম না।"

"বেশ, ঈশ্বরের কাছে, কি দরদী স্বামীর কাছে, নয়তো ধরো তোমার নিজেরই কাছে, দোষী না নির্দোষ মনে করবে তখন?"

"নির্দোষই মনে করব অবশ্য।"

"আমারও ঠিক তাই।...তুমি তা বুঝবে না, তামারা।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তামারা জিজ্ঞেস করলে: "কিন্তু ঐ অফিসারটি কে? তোমার স্বামী, না প্রেমিক, না ভাই?"

"কোনওটাই নয়, ও আমার কম্রেড্—সঙ্গী।"

"ম্যাগডচ্কা, তুমি যে মিথ্যে বলছ না, তা আমি বুঝতে পারছি, অথচ বুঝতে পারছি নে তুমি কী বলছ। তুমি যে একজন ভদ্রমহিলা, তা প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু বুঝি নি যে কেন তুমি এই পঙ্কে নেমে এলে? খুলেই বলি—এক-আধটু লেখাপড়া শিখেছিলাম আমি, এখনও দু'দুটো ভাষা মনে আছে আমার। এই যে ভাষাতে কথা বলছি, এ আমার মাতৃভাষা নয়। ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে এ ভাষায় কথা কইতুম আমি। কিন্তু আমি হচ্ছি জন্ম-বেদেনী, পাখীর মতো চঞ্চল আমার মন, কোথায় যাবার জন্যে প্রাণ যে আমার উড়্ উড়্ করে, কোন্ ডালে গিয়ে বাসা বাঁধতে চায় সে, তা জানিনে। কিন্তু, তুমি ম্যাগডচ্কা তুমি এখানে মরতে এলে কেন?"

হঠাৎ পাথরের মতো শক্ত, স্থির হয়ে উঠল ম্যাগ্‌দার মুখখানা।

"হ্যাঁ,"—শুকনো গলায় বল্লে সে, "এই দলের মধ্যে এক হয়ে মিশে থাকবার জন্যে তুমি যে মুখোশ পরে আছ, অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছি তা।...তবে জানতে যখন এতই সাধ তোমার তখন আমিও খুলে বলি তোমায়। আমি একজন লেখিকা, গণিকাবৃত্তির বিষয়ে লিখব বলে সে সম্বন্ধে জানবার জন্যেই আমার এখানে আসা, তারই জন্যে স-ব সয়েছি এখানে—সয়েছি সব কিছুই।"

এতক্ষণে তামারার কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। সোজা হয়ে উঠে বল্লে সে, "বেশ। তোমার সঙ্কল্পের সাধুতায় সন্দেহ করিনে কিছু। তবে এই যে লেখিকার ব্যাপারটা বল্লে,—নাঃ! তোমার দৌড়ের পাল্লা আরও বেশি—ঢের ঢের বেশি। তবে আজকের এই কথাবার্তা, কাকপক্ষীও টের পাবে না বলে দিলুম।"

"তা' যা' তোমার খুশি,"—নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলে ম্যাগ্‌দা, : "ধন্যবাদ।"

তারপর হঠাৎ যেন নরম হয়ে পড়ে, শক্ত করে বুকে চেপে ধরলে সে তামারাকে, আবেগ ভরে চুমু দিয়ে কানে কানে বল্লে তার, "তোমায় চিঠি দেব ভাই।"

* * * * *

তারপর আট মাস কেটে গেছে। রুশিয়ার আকাশে বাতাসে নানারকমের রাজনৈতিক বিপত্তি দেখা দিতে লাগল,—খানাতল্লাসী আর গ্রেপ্তারী চলতে লাগল নানা জায়গায়।

একদিন হঠাৎ আনা মারকোব্নার গণিকালয় ঘেরাও করে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল, বাড়ীর অতিথিদের সব আলাদা এক ঘরে সরিয়ে পুলিশের পাহারায় রাখা হলো। যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের ঠেলে তোলা হলো, খানাতল্লাসী চলল, নর্দমা পর্যন্ত বাদ গেল না। বোমা বা আপত্তিজনক কাগজপত্রাদির খোঁজ করা হলো। পুলিশ অফিসার প্রত্যেকটি মেয়েকে আলাদা করে একটি ঘরে ডেকে এনে ম্যাগ্দার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন—নানা-রকমের: সে এখানে কী করত, কী বলত, কাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত, কাকে কাকে চিঠি লিখত, কাউকে কখনও বই কিংবা অন্য কিছু দিয়েছে কি না, ইত্যাদি।

মেয়েরা কিছুই বুঝল না, ভয়ে ঘাবড়ে গেল, উঠল ঘেমে; চোখ মিট্‌মিট্ করে মাঝে মাঝে পুলিশ অফিসারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে অযথা ক্ষমা চাইতে লাগল: "ধর্মাবতার, আমার মাথায় বাজ পড়ুক, যদি আমি কাউকে খুন করে থাকি বা কারোর কিছু চুরি করে থাকি।"

তামারা ইচ্ছে করলে তার সঙ্গে ম্যাগ্দার শেষদিনের কথাবার্তা সব বলে দিতে পারত, তাতে সে অন্য পাঁচজন মেয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যও হয়ে উঠত নিশ্চয়ই। কিন্তু সে সোজা বলে গেল: "ওর বিষয়ে কী আর জানতে যাব, মশায়। আমাদেরই মতো একজন ছিল। বাইরে বোধহয় পুরুষমানুষ জুটত না, তাই এখানে পুরুষের খোঁজে মরতে এসেছিল।"

পুলিশ চলে গেল, আর আসে নি। কিন্তু আনা মারকোব্নার গণিকালয়ের পশার নষ্ট হতে বসল বুঝি। ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের অন্যেরা

সোস্তালিস্টদের আড্ডা বলে এদের ঠাট্টা — ঠাট্টাও ঠিক নয়, ঘৃণা করতে লাগল।

কিন্তু একদিন তামারা হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেলে বায়ুকেশ দারোগা বাড়িউলী আনা, তার স্বামী, আর খবরগিরণীকে বলছে: "তোমাদের ম্যাগদাকে মনে পড়ে? ওঃ, তিনি একটি গভীর জলের মাছ! কতবার যে নাম বদলেছেন তার লেখাজোখা নেই। এম্মা তার যে পাশপোর্ট বদলে পুলিশ থেকে হলদে টিকিট আনিয়েছি, তাতে তার নাম লেখা ছিল 'ওলগা লাবিনিস্কায়া, বাদ্য-শিক্ষয়িত্রী'। এখানে এসেছিল কেন জান? বেশ্যাবৃত্তি শেখবার জন্যে।…চমকে উঠলে যে বড়ো? আরও শোনো—তারপর করেছে কী, বেশ্যা সেজে সব বন্দরে বন্দরে গিয়ে নৌসেনাদের সঙ্গে মিশে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, জমিদারী-প্রথায় ও মহাজনী ব্যবসায় বড়লোকেরা নাকি আরও কেঁপে উঠছে আর গরীবদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, এই সব বলে সবাইকে ক্ষেপিয়ে বেড়িয়েছে। কেউ ধরতে পারে নি। তার কমরেডরা সব জায়গায় তাকে সামলে নিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কেন, ঐ যে ব্যাটা ক্যাপটেন দিব্যি কেমন মিলিটারী পোষাক পরে আমাদের দিয়ে ব্যাগ বইয়ে নিলে, আর কেমন চোখে ধুলো দিয়ে চলে গেল! করেছিল কী জান? সরকারী কাগজে বেমালুম গবর্ণরের নাম জাল করে লিখে, সোজা আমাদের পুলিশের বড়কর্তার কাছে এসে হাজির—হুকুম তামিল করতে হবে। বুকের পাটা দেখো একবার! তা বাছাধন এখন ধরা পড়ে সাইবেরিয়ায় গিয়ে সোনার খনি খুঁড়ছেন।"

"আর ম্যাগ্দা?"—জিজ্ঞেস করলে আনা।

"তাঁর হয়ে গেছে; গবর্ণরের ওপর বোমা ছুঁড়েছিলেন, তাই তাঁকে ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়া হয়েছে।"

—ছয়—

সন্ধ্যার সুরভি অন্ধকার। ঘরের জানলাগুলো খোলা; পাতলা পর্দাগুলো মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করে কাঁপছে; বাড়ীর সুমুখের মরা বাগান থেকে ভেসে আসছে শিশির-ভেজা ঘাসের গন্ধ আর 'ত্রিনীতি' উৎসবের দিনে সদর দরজায় লটকানো সেই শুকিয়ে-আসা লাইলাক আর বার্চ-পল্লবের ক্ষীণ সুবাস।

লিউবা পরেছে নীল রঙের বুক-কাটা মখমলের ব্লাউজ, আর নিউরা সেজেছে যেন খুকী—পরণে তার হাঁটুপ্রমাণ ঝুলের গোলাপি ফ্রক, ঝক-ঝকে চুলের রাশ এলো করে ছড়ানো, কপালের দিকে তা আবার সামান্ত একটু কোঁকড়ানো। জানলার পাশে ওরা দু'জন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, আর হাঁসপাতাল নিয়ে সেই যে গানটার আজকাল খুব চলতি হয়েছে—গণিকা-মহলে গানটার খুবই কাটতি—সেই গানটা গাইছে তারা; নিউরা গাইছে তার নাকী সুরে চড়া গলায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নীচু পর্দায় চাপা সুরে তান ধরে চলেছে লিউবা—

সেই তো আবার এল রে সোমবার,
আজ বাইরে আমায় করবে কারা পার!
ডাক্তার ক্রাস্‌সোব হেন পাজি—
ছেড়ে দিতে হয় না যে সে রাজি
—হায় রে পাজি ··

সব গণিকালয়েরই জানলা নিয়ে আলো আসছে। সদর দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লণ্ঠন। সোফিয়া বাসিলিয়েবনার গণিকালয়টা সামনেই; লিউবা আর নিউরা দু'জনেই তার ভেতর অবধি সব দেখতে পাচ্ছে। ওদের বাড়ীও সাজানো হয়েছে; বাড়ীর মেয়েরাও সেজেছে—আসছে যাচ্ছে তারা বিদ্যুতের ঝলকের মতো, আয়নার বুকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের চকিত ছায়া। ডানদিকে ত্রেপেল্‌ এর গোল-গম্বুজ বাড়ীখানা নীলাভ বিজলী আলোয় ঝলমল করছে।

মন্দোষ্ণ শান্ত সন্ধ্যা। কোথায় দূরে, বহুদূরে, রেলপথ পেরিয়ে, ঘরবাড়ীর কালো ছাদ আর গাছপালার কালো চূড়ো ডিঙিয়ে, ধরণীর গহিন বুকের মাঝে যেখানে বসন্তের বিপুল শ্যামলিমা চোখে শুধু ধাঁধা লাগিয়ে দেয় সেইখানে, সন্ধ্যার শেষ রক্তিমাটুকু ধূসরবর্ণের কুয়াশা ভেদ করে এসে যেন একটি দীর্ঘ ক্ষীণ সোনালি রঙের রেখা টেনে দিয়েছে মাটির কালো বুকে। এই আবছা সুদূরের আলোয়, এই সোহাগশীতল বাতাসে, আগন্তুক রাত্রির মদির গন্ধে, কী যেন এক গোপন মধুর বেদনার আভাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—বসন্ত আর গ্রীষ্মের সন্ধিক্ষণে প্রতি সন্ধ্যায়ই এমন একটি শান্ত করুণ উদাস ভাব থাকে জড়িয়ে। দূর থেকে শহরের অস্পষ্ট কলকোলাহল ভেসে আসছে, ভেসে আসছে তন্দ্রার মতো জড়িত বাঁশীর সুর, কানে আসছে গোরুবাছুরের হাম্বারব। নীচে কে এক পথচারী চলেছে জুতো মস্‌মস্‌ করে, ছড়ির আওয়াজ তার পথের 'পরে করে উঠছে শন্‌ শন্‌। অলস মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলেছে গাড়ীর চাকা ইয়ামার পথে। আর সব শব্দ, সমস্ত কোলাহল, সন্ধ্যার সেই স্বপ্নাতুর তন্দ্রায় কোন্‌ এক গভীর সৌন্দর্য আর কোমলতার মধ্যে যেন নিলীন হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারের বুকে জ্বলছে রেল-লাইনের সবুজ আর লাল আলো, আর তারই মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠছে ইঞ্জিনের বাঁশী শান্ত সাবধান গীতচ্ছন্দের মতো।

আবার গাইতে লাগল তারা—

ওই যে রে ওই ধাই মা আসে ধেয়ে—
চিনি আর পিঠে নিয়ে,
পিঠে আর চিনি নিয়ে,—
দেখ্‌ সে এখন সব্বাইকে ও বেটে দেবে যেয়ে
—ওই ধাই-মা মেয়ে!

—"প্রেখোর ইবানিচ! ও প্রোখোর ইবানিচ!"—হঠাৎ গান থামিয়ে ডাক সুরু করে দেয় নিউরা।

প্রোখোর ইবানিচ হলো এদিককার এক মদের দোকানের খিদমৎগার। সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে সে হন্‌ হন্‌ করে ছুটে

চলেছে, দেখে মনে হয় ধূসর বর্ণের একটা প্রেতমূর্তি যেন হন্ হন করে চলেছে পথ বেয়ে।

—"আঃ, যোলো যা!"—ডাক শুনে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে প্রখোর ইবানিচ, জিজ্ঞেস করে,—"কী হলো আবার?"

—"তোর এক বন্ধুর সঙ্গে আমার আজ দেখা হয়েছিল। সে তোকে ভালোবাসা জানিয়েছে।"

—"কেমন বন্ধু?"

—"ছোট্টখাট্টো, খাসা দেখতে! শ্যামবর্ণ মনকাড়া মেয়ে।…নাঃ, তোর কিন্তু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কোথায় দেখা হলো তার সঙ্গে।"

—"বটে, কোথায়?"—এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায় প্রোখোর।

—"কোথায় আবার, এইখেনে—ওই কুলুঙ্গির 'পরে লটকানো রয়েছে, যেখানে মরা বেড়ালগুলোকে ফেলে রেখে দি আমরা।"

—"বেড়াল! নচ্ছার পাজি কোথাকার!"

খনখনে গলায় হেসে ওঠে নিউরা সারা ইয়ামা কাঁপিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে জানলার চৌকাঠের 'পরে শুয়ে পড়ে শূন্যে পা ছুঁড়তে থাকে। তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ চোখদুটো বিস্ময়ের ভঙ্গীতে গোল গোল করে পাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে লিউব্কাকে বলে,—"জানিস, ছুঁড়ী, কী সব্বনেশে কথা! ও বছর ও একটা মেয়ের গলায় ছুরি বসিয়েছিল—ওই আমাদের প্রোখোর। মাইরি বলছি!"

—"তাই না কি! মেয়েটা মরে গেল?"

—"না, মরে নি। সেরেই উঠল,"—যেন একটু হতাশার সুরেই উত্তর দেয় নিউরা।—"তবে দু'টি মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল আলেকজান্দ্রো-ব্স্কায়া হাসপাতালে! ডাক্তাররা বলেছিল আর এই একরত্তি উঁচুতে লাগলেই অক্কা পেত ছুঁড়ী।"

—"তা মারতে গেল কেন?"

—"কী করে জানব? হয়তো টাকা চেয়েছিল, দেয়নি; নয়তো ছুঁড়ী মজেছিল আর কাউকে নিয়ে। ও ছিল ওর ভাবের মানুষ কি না—ছিল ওর ড্যাম্ন।"

—"কিন্তু ওর কী শাস্তি হলো?"

—"কিছুই না। কোনও প্রমাণই ছিল না। সেখানে তখন বেধে গিয়েছিল এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। শ'খানেক লোক মারামারি করছিল কেন যেন। কাজেই প্রোখোরই যে ফাঁক বুঝে ছুঁড়ীটার ওপর ছুরি চালিয়েছে, তা' মাগী নিজেও টের পায় নি। পুলিশকে বল্লে, 'কারুকে সন্দেহ হয় না আমার।' তাই প্রেখোর বেঁচে গেল। প্রোখোরই শেষে দেমাক দেখিয়ে বলেছে, 'হুন্‌কাকে যুৎসই তাগ কষতে পারিনি সেবার, কিন্তু মাগীকে সাবাড় করবই করব একদিন।' বলে, 'আমার হাত থেকে নিস্তার নেই ওর। ওকে চুপিয়ে চুপিয়ে কাটব।' "

আতঙ্কে শিউরে ওঠে লিউব্‌া। ভয়ে ভয়ে বলে, "সব্বনেশে লোক এই ঢ্যামনাগুলো!"

—"তা যা বলেছিস!"—জবাব দেয় নিউরা; "জানিসই তো আমাদের এই সাইমনের সঙ্গে পূরো একটি বচ্ছর ধরে ভাবের খেলা খেলে এসেছি আমি। কত বড় কশাই, ছুঁচো কোথাকার! সারা গায় একরত্তি আস্ত চামড়া ছিল না আমার। গা-ভর্তি শুধু আঁচড়-কামড়ের দাগ। কিছুর জন্যেই নয় কিন্তু—এম্নি এম্নি শুধু। সকালবেলায়ই আমায় কোন-একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর এঁটে দিত ও, তারপর সুরু করত ওর অত্যাচার; কখনো ওপরের হাতদু'টোর মাংস খুবলে নিত, কখনো মাইদুটোয় মারত খাম্‌চি, কখনো গলা জড়িয়ে ধরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দম আটকে মারতে সুরু করত আমায়; নয়তো কখনো চুমো খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, আর শেষে ঠোঁটদুটো কামড়াতে কামড়াতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বার করে ছাড়ত··· যন্ত্রণায় কাঁদতে সুরু করতাম আমি, আর ও-ও তাই চাইত! তারপর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পশুর মতো ও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার ওপর। বলব কী, আমার টাকাকড়িগুলো পর্যন্ত সব কেড়ে নিত; এক বাক্স সিগারেট কেনবার পয়সা পর্যন্ত রাখত না। ভীষণ কিপ্টে আমাদের এই সাইমন; খালি টাকা জমাচ্ছে,···বলে এক হাজার রুবল জমলে পর কোন এক মঠে গিয়ে থাকবে।"

—"তারপর?"

—"ওর ঘরে গিয়ে দেখিস্, ঠাকুর-দেবতার মূর্তিতে ভর্তি, যেন কত বড় ধার্মিক। ওর পাপের শেষ নেই কি না, তাই অত ভক্তি। আসলে ও-ও একটা খুনে।"

—"বলিস্ কী!"

—"যাক্ গে, ওর কথা এখন থাক, লিউবোচ্কা। আয় এখন গানটা শেষ করি।"

'দোকানে গিয়ে কিনব আমি বিষ।
আত্মহত্যা করতে আমায় দিস।'

* * *

জেনী ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াতে বেড়াতে এক-একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে নিচ্ছে। কমলালেবু রঙের সাটিনের জামা পরেছে সে।

মান্কা তাসের নেশার ভরপুর; পাশার সঙ্গে '৬৬' খেলছে। মান্‌কা পরেছে বাদামি রঙের জামা; ঐ জামাটা পরলে পরে তাকে দেখায় যেন হাই স্কুলের ছাত্রী।

পাশা মেয়েটি কিন্তু ভারী অদ্ভুত। বড়ই দুঃখিনী সে—বহুকাল পূর্বেই গণিকালয়ের পরিবর্তে তার স্থান হওয়া উচিত ছিল মানসিক ব্যাধির কোনও চিকিৎসালয়ে। সে ছিল এমন একটা মানসিক বিকারে পীড়িত যার ফলে যখন যে-কোনও পুরুষই তাকে চাইত—তা' লোকটা যত কুৎসিতই হোক না কেন—তখনই তার কাছে এক উন্মত্ত অসুস্থ আগ্রহে নিজেকে একান্তভাবে বিলিয়ে না দিয়ে থাকতে পারত না সে। পুরুষজাতির প্রতি গণিকাদের মধ্যে যে একটা সমবেত বৈরভাব আছে, পাশার এই দুর্বলতা তাকে যেন পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে চলত; তাই তার সঙ্গিনীরা এই অপরাধের জন্যে তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতে কসুর করত না কখনই। পুরুষের কাছে আত্মদানের অসহ্য আনন্দে পাশা যে-সব আদর-সোহাগের কথা বলে ফেলত, যে-ভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, হাসত, কাঁদত, গোঙাত—সে-সবই দু'তিনটে ছিটেবেড়ার আড়াল পেরিয়ে সবার কানে এসে পৌঁছুত; আর তাই হুবহু নকল করে নিউরা পরদিন জুড়ে দিত হাসাহাসি।

গুজব, পাশা নাকি ভুলে, কি লোভে পড়ে, কিংবা টাকার জন্যে এখানে দেহের ব্যবসা করতে আসে নি; এসেছে সে ইচ্ছে করে, নিজের খেয়ালে। কিন্তু বাড়ীউলী আর খবরগিরণী দু'জনেই পাশার ওপর খুব খুশী, কারণ অন্য মেয়েদের চাইতে চার-পাঁচগুণ বেশি উপায় করত সে—হয়তো তার ঐ বিকৃত মস্তিষ্ক আর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যেই। তাই বাঁধা খদ্দের ছাড়া তাকে সহজে যার-তার সামনে বার করা হতো না; কারণ বাঁধা খদ্দেররা আবার পছন্দ করে না যে, তাদের বাঁধা মেয়েমানুষ অন্যের ভোগ্যা হয়। বাঁধা খদ্দের পাশার অবশ্য অনেকগুলোই আছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যিই তাকে ভালোবাসে। একটি জর্জিয়ান্ কেরানী—সে মদের দোকানে কাজ করে, আর একজন চালবাজ রেল-কর্মচারী—গরীব অথচ বড়ঘরের ছেলেই বটে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অথচ এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ যৌন উন্মাদনা ছাড়া আর সব বিষয়েই পাশা নির্বিকার। তার মিষ্টি মুখখানিতে, আধো ঢাকা আঁখির দৃষ্টিতে, কোমল সিক্ত অলস ওষ্ঠাধরে, ইতিমধ্যেই একটা ক্ষীণ উন্মত্ততার আভাস চকিতে খেলে যেতে সুরু করেছে,—সেখানে সর্বদাই কেমন যেন একটা একরোখা অথচ সলজ্জ ভীরু আনন্দের হাসি লেগে আছে। অনবরত ঠোঁট চাটা তার একটা অভ্যাস; আর তার শান্ত মৃদু হাসি —সে হলো অবোধের হাসি।

এদিকে সমাজের নির্মম খেয়ালে পীড়িত এই অবলা প্রাণীটি তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, অমায়িক, আর সম্পূর্ণ নির্লোভ —দ্বেষদ্বন্দ্বহীন। তার এই দুর্নিবার কামনার জন্যে অন্তরে অন্তরে লজ্জিতও বটে সে। তার সঙ্গিনীদের প্রতি তার হৃদয়ে অপার মমতা, তাদের আদর-সোহাগ করে চুমু খেয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরতে, তাদের সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমোতে, সে বড়ো ভালোবাসে। তবুও মনে হয় প্রত্যেকেরই রয়েচে তার প্রতি কেমন যেন একটা বিরাগ!

—"মান্‌েচ্‌কা, লক্ষীটি আমার"—মানকার হাত ধরে আদর করে বলে পাশা,—"আমার হাতটা একবার গুণে বল না, ভাই!"

—"আ-চ্ছা, আ-চ্ছা,"—ছোট্ট খুকীর মতো ঠোঁটদু'টো ফুলিয়ে জবাব দেয় মানুকা ; "আর একটু খেলে নি, দাঁড়া।"

"মান্যেচ্কা, মাণিক আমার, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, আমার মণি,"—বায়না ধরে পাশা।

বাধ্য হয়ে মানুকা তাসের তাড়া কোলের ওপর নাবায়। সপাৎ করে বেরিয়ে আসে এক তাড়া হরতন রুইতন, আর দলবল নিয়ে চিরেতনের রাজা। উল্লাসে দু'হাত এক করে পাশা :—"আহা, এই যে আমার লেবান্শিক! আজ সে আসবে বলে কথা দিয়ে গেছে। লেবান্শিক আজ নিশ্চয়ই আসবে।"

—"এ হচ্ছে তোর সেই জর্জিয়ান বাবু।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আমার জর্জিয়ান বন্ধু। আহা, কী যে লক্ষ্মীটি সে। তাকে কাছছাড়া হতে দিতে একটুও ইচ্ছে করে না আমার। সেবার এসে সে আমায় কী বলেছিল জানিস্? বলেছিল : 'যদি এই খেলাঘরে থাক তবে তোমায় খুন করে নিজে মরব আমি।' আর কী করে যে চোখ পাকিয়ে চেয়েছিল সে আমার দিকে, তা যদি দেখতিস!"

কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় জেনী, রাগত ভাবে জিজ্ঞেস করে :

—"কে বলেছে এ কথা?"

—"কেন, জেবান! আমার সেই জর্জিয়ান বন্ধু। বলে, 'তোমারও মরণ, আমারও মরণ।' "

—"ও, ঐ তোর জর্জিয়ান বাবু। ও তো একটা আর্মেনিয়ান। তুই যেন নেকী।"

—"না, ও জর্জিয়ান।"

—"আমি বলছি ও আর্মেনিয়ান। নেকী কোথাকার!"

—"কেন গালমন্দ করছিস, ভাই? আমি কি তোকে গালমন্দ করেছি?"

—"করেই ছাখ না! নেকী কোথাকার! ও কে তাতে তোর কী এসে যায়? তুই ওকে ভালোবাসিস বুঝি—অ্যাঁ?"

—"বাসি।"

"নেকী আমার! তুই তো সেই টুপীপরা রেলের খোঁড়া লোকটাকেও ভালোবাসিস!"

"তাঁকে শ্রদ্ধা করি আমি।"

"আর ঐ খাতা-লিখিয়ে নিকি? তারপর সেই ঠিকেদারটা? তারপর ঐ গোল আলুর মতন লোকটাকে—ঐ আন্‌তোশ্‌কা-কার্‌তোশ্‌কা? তারপর ঐ মোটা অভিনেতাটা? ওর সঙ্গেও তো তোর খুব—; উঃ, বেহায়া কোথাকার! তোর পানে চোখ তুলে চাইতেও ঘেন্না হয়। তুই একটা কুত্তী! একসঙ্গে অতগুলো নাগর! আমি হলে গলায় দড়ি দিতুম। নোঙরা জানোয়ার কোথাকার!"

ছলছল করে ওঠে পাশার দু' চোখ। মান্‌কা তার দিকে হয়: "কেন তুই ওকে অমন করছিস্, জেন্‌কা?"

—"বটে!"—ক্ষেপে যায় জেনী: "তোরা সবাই সমান। মানমর্যাদা বলে কিছুই নেই। কোন্ এক ঘাটের মড়া আসবে, একমুঠো খাবারের মতো কিনে নেবে তোকে, গাড়ীর মতো ঠিকে দরে করবে ভাড়া, তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে ডলাইমলাই করে থুঃ করে ফেলে দিয়ে চলে যাবে! আর তাতেই গলে যাবি তোরা! ককিয়ে ককিয়ে বলতে থাকবি: কী সুখ, প্রিয়তম, কী আনন্দ! থুঃ!"

ঘৃণায় থুথু ফেলে জেনী।

তারপর উত্তেজনায় সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে থাকে সে।

আর এদিকে তখন চলেছে সুরভোলা তালকানা বেহালা-বাদকদের নিয়ে পিয়ানো বাদক আইজাক ডেভিডোবিচের বাজনার মহড়া।

—"ও রকমটি নয়, ও রকমটি নয়, ইসাইয়া সাবিচ। এই এক লহমার জন্যে বন্ধ করুন দিকিনি আপনার বাজনা। শুনুন মন দিয়ে। এই হচ্ছে আসল তান।"

এই বলে এক আঙুলে পিয়ানোয় সুর তুলতে তুলতে, ছাগ-বিনিন্দিত কালোয়াতী গলায় তানটা বুঝিয়ে দেন তিনি:

"এস্-তাম্, এস্-তাম্, এস্-তিয়াম্-তিয়াম্। নিন, ধরুন আমার সঙ্গে প্রথম কলিটা। প্রথমে ফাঁক,...এই...অ্যায়, অ্যায়,......

পিয়ানো-যন্ত্রের 'পরে কনুইয়ে ভর দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে এদের মহড়া দেখতে থাকে কটা-চোখী, গোলমুখী, বাঁকা-ভুরু জো—মুখখানা তার সস্তা রুজ আর সাদা রঙে নির্মম ভাবে ঘসামাজা; তার সঙ্গে রয়েছে ছিপছিপে গড়নের মেয়ে ভেরা—মদের ঝাঁঝে ঝলসে গেছে মুখখানা তার, পরেছে সে ঘোড়-সহিসের সাজ। বহু চেষ্টার পর শেষ অবধি সঙ্গত যখন ঠিক হলো, ছোট্টখাট্টো গড়নের ভের্‌কা এসে দাঁড়াল বিপুলকায়া জো'র সামনে—পুরুষের বেশে, অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে, এবং এসেই পুরুষের ভঙ্গিতে কৌতুক ভরে সেলাম ঠুকলে তাকে; তারপর মহাফূর্তিতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল তারা।

চঞ্চলা নিউরা—সব রকমের খবর জানাতে সেই হচ্ছে অগ্রণী—হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে জানলার ওপর থেকে, চেঁচিয়ে বলে একটা জমকালো ফীটন্‌ গাড়ী আসছে তাদের বাড়ীর দিকে। সবাই দেখতে ছুটে যায় জানলার ধারে—যায় না কেবল মানিনী জেনী।

জমকালো পোষাক পরে দাড়িওয়ালা কোচম্যান গাড়ীর ওপর বসে আছে—মন্দ দেখাচ্ছে না।

নিউরা সেখান থেকেই চেঁচাতে সুরু করে দেয়,—"ও কোচোয়ান খুড়ো, একটু গাড়ীতে চড়াও না, মাইরি!"

মুচকে হেসে কোচোয়ান খুড়ো আঙুল নেড়ে কী যেন ইঙ্গিত করে, ঠিক বোঝা যায় না। ঘোড়াটা যেন ঠিক এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। খটাখট পা ফেলতে ফেলতে চোখের সুমুখে অন্ধকারের মধ্যে যায় অদৃশ্য হয়ে।

এমন সময় শোনা যায় এম্‌মার গলা:—"এ সব কী বেহায়াপনা! ছি, ছি, কেলেঙ্কারী! আমি জানি নিউরাই হচ্ছে পালের গোদা।"

এম্‌মাও কালো পোষাক পরে বেশ করে সেজেছে। সে সবাইকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়। সামনের সোভিয়া বাসিলিয়েব্‌নার গণিকালয়ের সুমুখে দুটো গাড়ী এসে দাঁড়ায়। ইয়ামার রাস্তায় আস্তে আস্তে চাঞ্চল্য জেগে ওঠে।

সাইমন একজন লোককে নিয়ে ঘরে আসে। জেনী সেইভাবেই

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। মনে মনে বলতে থাকে: 'কে যেন এল মোটাসোঁটা, কারোর বাবা নিশ্চয়ই লোকটা!'

এম্মা তাড়া দেয়,—"মেয়েরা সব বৈঠকখানা ঘরে যাও।"

এক এক করে সবাই এসে হাজির হয় বৈঠকখানায়। তামারা আসে হাত-কাটা জামা আর ঝুঁটো মুক্তার মালা গলায়, পেছনে পেছনে আসে খুটকী কিটি। তারপর সবুজ রঙের জামা পরে আসে নতুন মেয়ে নীনা। তারপর একে একে মান্‌কা, ইহুদী সন্‌কা, সবাই এসে জড়ো হয় বৈঠকখানায়।

—সাত—

প্রথমে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক দু'হাতের তালু ঘস্‌তে ঘস্‌তে গম্ভীর চালে লিউব্‌কার পাশে এসে বসেন। কায়দা-দুরস্ত গণিকার মতো স্কার্টটা সামান্য একটু তুলে অভ্যর্থনা জানায় লিউব্‌কা।

"তারপর মিস্"—কথা পাড়তে যান ভদ্রলোকটি।

"বলুন,"—উত্তর দেয় লিউব্‌কা।

"খবর সব ভালো?"

"এই চলছে, ধন্যবাদ! সিগ্রেট আছে?"

"আমি সিগ্রেট খাই নে।"

"পুরুষ মানুষ সিগ্রেট খায় না! আসুন তবে লেমনেড খাই। আমার বেশ ভালো লাগে।"

ভদ্রলোক চুপ করে থাকেন। লিউব্‌কা বলে যেতে থাকে,—"বাপ্‌স্ কী কিপ্টে! আপনি সরকারী কর্মচারী বুঝি!"

"না, আমি হচ্ছি শিক্ষক, জার্মান ভাষা শেখাই।"

"কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে।

"হতে পারে। রাস্তায় হয়তো।"

"একটা কমলালেবু খাওয়ান অন্ততঃ।"

ভদ্রলোক আবার চুপ! কিন্তু চোখদু'টো তাঁর চতুর্দিকে মেয়েদের মধ্যে ঘুরছে। মুটকী কিটির শরীরখানা বেশ নিটোল বটে, তবে মোটা মেয়েরা আবার কামকলায় অপটু, তা' ছাড়া মুখখানাও ওর সুন্দর নয়। ভেরা মেয়েটা মন্দ নয়—দিব্যি ছোট ছেলের মতো দেখতে; সাদা আঁটোসাঁটো পায়জামা পরেছে বলে উরুৎ দুটিতে বেশ বাঁধুনি আছে মনে হয়। ছোট মান্যাকে স্কুলের ছাত্রীর মতো দেখাচ্ছে। গরবিনী জেনীর মুখখানি কিন্তু বেশ। তা জেনীকেই ঠিক করা যাক। "নাঃ, দরকার নেই"—ভাবতে লাগলেন খদ্দেরমশায়: "মেয়েটার বড্ড দেমাক; একবার ফিরেও চাইছে না, বোধহয় দর বেশি।" ভদ্রলোক হিসাবী. তাই হঠাৎ কিছুই করে বসলেন না। সংসারী লোক। মেয়ে ইস্কলের মাষ্টার, ছাত্রীদের দেখেন আর জ্বলেপুড়ে মরতে থাকেন। ভাগ্যিস্ তিনি কৃপণ আর ভীতু, তাই ছাত্রীরা কিছু টের পায় না। বেচারা অনেকদিন ধরে পয়সা জমিয়েছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, গাড়ীতে চড়েন নি, ইচ্ছে থাকলেও মদ কিনে খান নি, এই করে কিছু কিছু জমিয়ে বছরে ২।৩ বার নারীমাংসের স্বাদ নিতে আসেন তিনি, তাও আবার অনেক ভেবে চিন্তে: সস্তা হওয়া চাই, একটুতেই মজা ফুরিয়ে গেলে চলবে না, আবার খারাপ রোগের চিন্তাও আছে। আর বাস্তবিকই তাঁর এই টাকাটার জন্যে চানও তিনি অনেক কিছু, চান অসম্ভব রকমেরই কিছু; তাঁর ভাবপ্রবণ জার্মান অন্তরাত্মা অজান্তে, অস্পষ্ট ভাবে, গণিকার পাষাণ-মূর্তির কাছে কামনা করে অপাপবিদ্ধ সারল্য, কুমারীর শুচিশুদ্ধ যৌবন ভীরুতা, আত্মদানের সুমধুর কাব্য। অথচ পুরুষ মানুষ রূপে অন্তরে অন্তরে এ স্বপ্নও রচনা করতেন তিনি, করতেন এই কামনা, এই দাবি যে, তাঁর সোহাগ-স্পর্শে নারীর অন্তরাত্মা উঠবে উদ্বেল হয়ে, দেহে জাগবে রোমাঞ্চ ও কম্পন, দেহমন পড়বে মধুর অবসাদে অবশ হয়ে।

"না হয়"—বললে লিউব্কা,—"একটা পল্কা বাজাতেই বলুন। একটু নাচুক মেয়েরা।"

তা' একরকম মন্দ নয়। নাচতে নাচতে বরং সাহস বাড়ে, তখন পছন্দ মতো কাউকে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে সুড়ৎ করে বেরিয়ে যাওয়া

যাবে। নইলে এভাবে সকলের চোখের সামনে থেকে একটা মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে আসা, যেন কেমন লাগে। মাষ্টার মশাই মনে মনে রাজি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তাতে কত লাগবে ?"

"কত আবার! চতুরঙ্গ হলে আধ রুবল, এম্নি নাচের জন্যে ত্রিশ কোপেক। চলবে এতে ?"

"বেশ, সুরু হোক তবে···আপত্তি নেই আমার।"—দিলদরিয়া মেজাজের ভাণ করে বল্লেন ভদ্রলোক। তারপর পিয়ানোযন্ত্রের 'পরে রূপোর একটা টাকা রেখে বাজনা বাজাবার হুকুম দিলেন তিনি বাজিয়েদের।

হাত বাড়িয়ে টাকাটা পকেটে ফেলে জিজ্ঞেস করে ইসাইয়া সাবিচ্—"কী হবে ? ওয়াল্জ্ ? পল্কা ? না, পল্কা-মাজোর্কা ?"

"মানে···এই যা হোক···"

"তবে ওয়াল্জ্ চলুক"—চেঁচিয়ে ওঠে ভেরা, নাচেতে ভারী আমোদ তার।

"না, পল্কা!···ওয়াল্জ্···বেঙ্গার্গা"—যার যা খুশি চেঁচাতে থাকে মেয়েরা।

"না, পল্কা হবে।"—লিউব্কা বলে,—"আমার বরের হয়ে বলছি, আমি", বলেই লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "তাই না গা ?"

নিজেকে ছাড়িয়ে নেন মাষ্টার মশাই। লিউব্কাও রাগ না করে নিউরাকে নিয়ে নাচতে উঠে যায়। সবাই ঘুরে ফিরে দলেদলে নাচতে থাকে। তখন সাহস করে মান্কার কাছে গিয়ে বলেন ভদ্রলোকটি, "তুমি চলো।" হেসে রাজি হয় মান্কা।

মান্কা তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। রূপবিলাসিনীদের ঘর যেমনটি হওয়া দরকার তেমনি করেই সাজানো। আর্শি, ফুল, খাট, বিছানা, ছবি—সবই রয়েছে। বিছানা লাল চাদর দিয়ে ঢাকা। একটা লাল আলো জ্বলছে। একটা গোল টেবিল, আর তিনটে চেয়ারও রয়েছে।

বডিস্ খুলতে খুলতে মান্কা বলে, "ওগো প্রিয়তম, একটা লেমনেড কি লফেৎ হবে না কি ?"

—"পরে হবে ; তা এখানকার লফেৎ কি ভালো ?"—এড়াবার চেষ্টা করেন মাষ্টার মশায় ।

—"হ্যাঁ ভালো।" মানকা যেন ছিনে জোঁক।—"এক বোতলের দাম দু' রবল, তবে যদি মনে কর বেশি খরচ হলো, তা হলে না হয় বীয়ারই আনাই।"

—"বেশ।"

—"আর আমার জন্যে লেমনেড, না হয় কমলালেবু।"

—"বরং লেমনেড খেতে পার, কমলালেবু নয়। পরে হলেও হতে পারে, এমন কি শ্যাম্পেনও খাওয়াতে পারি যদি আমাকে খুশী করতে পার।"

—"তা হলে কিন্তু চার বোতল বীয়ার, দু' বোতল লেমনেড আনাই। ঠিক তো ? আর একখানা চকোলেট কেক আমার জন্যে! কেমন ?"

—"না না, বড় জোর দু' বোতল বীয়ার আর এক বোতল লেমনেড। আর কিছু নয়। এ সব ছ্যাঁচড়ামো ভালো লাগছে না আমার।"

"আমার এক বন্ধুকে নেমতন্ন করব ?"

—"না, না ও সব বাদ দাও।"

মান্কা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে, "দু' বোতল বীয়ার আর আমার জন্যে একটা লেমনেড চাই।"

সাইমন ট্রেতে করে এনে বোতলের মুখ খুলে দিয়ে যায়। পেছন পেছন আসে যোসিয়া,—"বাঃ, এ যে দেখছি বিবাহ-উৎসব চলেছে এখানে। বেশ বেশ!"

যোসিয়াকে দেখিয়ে মান্কা মাষ্টার মশায়কে বলে : "ভাই, একে একটু বীয়ার খাওয়াবে না ?" বলে যোসিয়াকেও এক পাত্র খাইয়ে দেয়।

মাষ্টার মশায়ও তাঁর বীয়ার শেষ করেন। যোসিয়া বলে— "এইবার দামটা দিন।"

"বাবাঃ, এত তাড়া! আমি কি পালাচ্ছি!'—চটে যান মাষ্টার মশায়।

"রাগ করবেন না।"—জবাব দেয় যোসিয়া খবরগিরণী; "মানকার পাওনা পরে তাকেই না হয় দেবেন। আমি শুধু বীয়ার আর লেমনেডের দামটা চাইছি। আবার বাড়িউলী মাসীকে হিসাব দিতে হবে কিনা। দু'বোতল বীয়ারের দাম হয়েছে এক রুবল আর লেমনেডের ত্রিশ কোপেক—মোট এক রুবল ত্রিশ কোপেক।"

—"তার মানে এক বোতল বীয়ারের দাম আধ রুবল! দোকানে তো বারো কোপেকে পাওয়া যায়।"

—"তবে দোকানে গেলেই হতো। নামকরা বাড়ীতে এলে এই রকমই দাম দিতে হয়। আমাদের এখানকার মতো সব বাড়ীতেই এই দাম। বেশি চাই নি, দিন এখন দাম।" —যোসিয়াও গরম গরম বলে যায়। কাজেই সুড় সুড় করে দামও বেরিয়ে আসে।

—"আর কেউ যেন ঘরে এসে না ঢোকে।"—জার্মান মাষ্টার বলেন।

—"নাঃ, কেউ আসবে না।"

যোসিয়া বেরিয়ে যায়। মানকা দরজায় খিল দিয়ে এসে জার্মান মাষ্টারের হাঁটুর ওপর বসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে।

প্রেমের অভিনয় করবার আগে একটু চেনা-পরিচয় হওয়া দরকার। তাই ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, "এখানে কতদিন আছ?"

"বেশি নয়, তিন মাস মোটে।"—মিছে কথা।

"বয়স কত তোমার?"

—"ষোলো।" —পাঁচ বছর কমিয়ে বলে।

নীচু হয়ে জুতো খুলতে খুলতে মাষ্টার মশায় বলেন, "এত কম বয়সে এখানে এলে কেমন করে?"

—"আমাদের দেশের একজন অফিসার আমায় প্রথমে নষ্ট করে। মা ছিলেন খুব কড়া লোক। ভয় হলো যদি জানতে পারেন তবে গলা টিপে মেরে ফেলবেন। তাই পালিয়ে গেলাম। পরে সাত ঘাটের জল খেতে খেতে এখানে ছটকে এসে ঠেকেছি।"

—"সেই অফিসারকে তুমি ভালোবাস না আর?"

—"সে কথা শুনে হ্যাগা আলোটা জলবে, না, নিবিয়ে দেব বরং একটু কমিয়ে দিই।"

—"তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে? কী নাম তোমার।"

—"মান্কা। সত্যি কথা বলতে কি ভালো লাগে না এখানে।"

জার্মান মাষ্টার মান্কার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বললেন, "কাউকে ভালোবাস না? এখানে তোমার মনের মানুষ কেউ নেই?"

—"নাঃ। আমার বরং তোমাকে, ভাই, বেশ মনে ধরেছে। কেমন মোটাসোঁটা গোলগাল।"

মাষ্টার মশায় খানিকক্ষণ কী যেন একটু ভাবলেন। তারপর সব পুরুষই নারী-দেহ ভোগ করবার আগে যেমন করে বলে, তিনিও তেমনি বললেন, "আমার মারিচেন, আমিও তোমাকে ভালোবেসেছি। তোমাকে আমি আমার কাছে নিয়ে রাখব।"

—"কিন্তু তোমার তো বৌ আছে গো!"

—"আমি বৌকে নিয়ে ঘর করি নে। সে ভালোবাসতে জানে না।"

—"আহা বেচারি! যদি জানতে পারে তা' হ'লে বড়ো কষ্ট পাবে।"

—"ওসব কথা ছাড়ো। শোনো, মেরী, আমি তোমারই মতো একটি নম্র ধীর সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আমার পয়সা আছে। একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে তোমায় নিয়ে থাকব। যাবে আমার সঙ্গে?"

—"বেশ তো!"

মাষ্টার মশায় মান্কাকে আবার চুমু খেয়ে বললেন, "তোমার কোনও অসুখ বিসুখ নেই তো?"

—"নাঃ! ডাক্তার এসে প্রতি শনিবার আমাদের পরীক্ষা করে দেখে যায়।"

* * *

মিনিট পাঁচেক পরে মান্কা মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এল। মাষ্টার মশায়ের দেওয়া দক্ষিণা আজ তার বউনি, তাই রুবলে থুথু দিয়ে (যাতে কেউ চোখ দিতে না পারে) মোজার মধ্যে গুঁজে রেখে দিল সে। মন-ভোলানো কথায় শেষ হলো।

আমাদের জার্মান মাষ্টারকে মান্‌কা কিন্তু খুশী করতে পারে নি। মান্‌কা নাকি প্রেমের ব্যাপারে একেবারে কাঠ। তাই মাষ্টার মশায় যোসিয়াকে ডেকে পাঠালেন।

মান্সা এসে বললে, "যোসিয়া, আমার নাগর তোমায় তলব পাঠিয়েছে।" মান্সা আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করতে লাগল।

যোসিয়া তাঁর কাছ থেকে ঘুরে এসে পাশাকে বাইরের বারান্দায় ডেকে এনে কী যেন বলে, ঘরে এসে মান্সাকে বললে,—"এ কী রকম, মান্‌কা? ভদ্রলোক তোমার নামে নালিশ করলেন; বললেন, তুমি নাকি মেয়েমানুষই নও—এক টুকরো কাঠ, না, এক চাঁই বরফ। আমি তাঁর কাছে পাশাকে পাঠালাম।"

মান্‌কা ঘৃণায় থুথু ফেলে বললে, "আরে রামোঃ, ও একটা পুরুষ-মানুষ নাকি! কেবল বক বক করতেই জানে। আর খালি প্রশ্ন, চুমু খাচ্ছি, ভালো লাগছে? মেজাজ ভালো তো? বুড়ো হাবড়া, আবার বলে, তোমায় নিয়ে গিয়ে বাঁধা রাখব।"

—"ও রকম সবাই বলে, নতুন কিছু নয়।"—মন্তব্য করে জো।

জেনীর মেজাজ আজ সকাল থেকেই বিগড়ে রয়েছে। মান্‌কার কথা শুনে সে যায় আরও ক্ষেপে। "ইতর বদমায়েস কোথাকার! বুড়ো নোংরা জানোয়ারটাকে আমি হলে তার কান ধরে আর্শির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতুম, 'ন্তাখ আগে নিজের চেহারাখানার কেমন ছিরি! আরও কেমন খুপছুরৎ দেখায় যখন কপালে চোখ তুলে আর মুখে ফেনা কেটে মেয়েমানুষের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিস্‌। তোর ঐ দুটো রুবলের জন্যে আমার মনপ্রাণ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হবে নাকি রে, পাজি হতভাগা।"

—"জেনী, চুপ!"—ধমক দেয় এম্মা।

—"না, না!"—ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জেনী।

—আট—

ক্রমে বৈঠকখানায় অতিথি এসে জমতে থাকে। রলি পলি আসে। মারা ইয়ামাই বহুদিন থেকে চেনে তাকে,—লম্বা, রোগা, বুড়ো, আমুদে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, কাটায় সে কোন-এক অতিথিশালার খেলাঘরে, সর্বদাই আধ-মাতাল অবস্থায়; হাসিমস্করার কথা, চটকদারি গল্প, আর প্রবাদ-প্রবচন আওড়ায় সে দিনরাত। সবার সঙ্গেই তার ভাব। বাড়ীউলী থেকে সুরু করে ঝিটা পর্যন্ত তাকে খানিকটা অবজ্ঞার চোখেই দেখে থাকে, তবে বিন্দুমাত্রও বিরূপ ভাব নেই তার 'পরে কারও। এককালে লোকটাকে দিয়ে অনেক কাজও আদায় হতো। মেয়েরা তাদের নাগরদের কাছে চিঠিপত্র পাঠাত ঐ রলি পলির মারফৎ, আবার দরকার হলে দোকানে-বাজারেও সে-ই ছুটত। অতিথিদের হাত-উড়ানি কাজ করে যা পেত, সবই আবার সে ঐ-সব মেয়েদের পেছনেই খরচ করে ফেলত।

"রলি পলি যে!"—দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে নিউরা।

"হ্যাঁ, আমিই বটে,—এই আনন্দরাজ্যের একজন মাননীয় পারিষদ। কে প্রিন্স বটল্‌কিন, কাউন্ট লিকীয়োর্কিন, ব্যারন হোয়াটিন্‌কেভিচ-গিন্‌-পোর্ভস্কি—মিষ্টার বিটোফেন, মিঃ চোপিন, বাজাও, বাজাও বাজনা!"

ঠাট্টা-ইয়ারকি করতে করতে রলি পলি মুট্‌কী কিটির পাশে এসে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিটি তার একখানা গোদা ঠ্যাং রলি পলির হাঁটুর ওপর তুলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রয়। রলি পলি কিছু না বলে সিগ্রেট জড়াতে আরম্ভ করে।

"ঐভাবে কাগজে সিগ্রেট জড়াতে বিরক্ত লাগে না?"—কিটি জিজ্ঞেস করে।

"বি-র-ক্ত! বলো কী? শোনো তবে—

রে সিগারেট! গোপন প্রিয়া!
তোরে ভালো না বেসে বাঁচে কি হিয়া?

নয় গো নয় এ নয় খেয়ালে,
এ বিধিলিপি সব কপালে—
তাই সবারি চুম
ছুটায় ধুম—
—ছুটায় ধুম ও তোর অধরে।
আয় রে সখী, মোর অধরে ॥

"এই তো, এখুনি বুঝি গলা-খাঁকারি শুরু করবে রলি পলি,"—নিরাসক্ত ভাবে মন্তব্য করে কিটি।

"সে আর এমন শক্ত কাজটা কিসের!"

"রলি পলি, এর চেয়েও মজার কথা কিছু বলে তো শুনি,"—আবদার করে বলে ভেরুকা।

হুকুম মাত্রই এক কৌতুককর ভঙ্গিতে আপত্তি জানাতে শুরু করে দেয় রলি পলি :

"আকাশে অনেক তারা,
গুণতে কি সব যায় রে পারা?
হুঁ হুঁ হুঁ বয় যে বাতাস,
কয় যে কানে 'হুঁ';
তবু হায় কাজের বেলায়
শুধুই ঢুঁ ঢুঁ ঢুঁ।
শুধু ফুলেরা ফুটছে বনে
গন্ধেতে ভোঁ ভোঁ,
আর পাখীরা তান ধরেছে—
কোঁকর-কোঁ-কোঁ-কোঁ ॥"

"আর এই শোনো তবে এক মন-মাতানো ছড়া,"—বলেই কাঁপা কাঁপা গলায় চড়া সুরে গান জুড়ে দেয় রলি পলি :

"রাজার লোক যাচ্ছে ঘোড়ায় ধেয়ে।
পেছনে তার ছুটছে সে এক মেয়ে—
ইচ্ছেটা তার—লোকটা যেন বিয়ের

কথাটা তার পাড়ে তারই কাছে,
তবু লোকটা সে কি চায় রে ফিরে পাছে ?
বরং মুচড়ে গোঁফ যায় যে ঘোড়ায় খেয়ে।
তবু ছোটে মেয়ে ॥

এইভাবে ভাঁড়ামির চূড়ান্ত করে সন্ধ্যা থেকে রাতভোর গণিকালয়ের বৈঠকখানায় কাটিয়ে দেয় রলি পলি। মেয়েরা তাকে তাদেরই একজন বলে জানে; নিজেদের খরচেই তারা রলি পলিকে বীয়ার আর বোদকা খাইয়ে দেয়।

একটু পরেই আসে একদল থিয়েটারের লোক, এসেই তারা খুব হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। শুরু হয় থিয়েটারের গালগল্প আর কেচ্ছা; তারপর তাই থেকে ওঠে থিয়েটারের মালিকদের কথা, শেষটায় তাদের বৌদের কথাও বাদ যায় না। তারপর মদ আর নাচ-গান-হল্লা। শেষে 'আবার আসব' বলে কেটে পড়ে তারা। মেয়েদের ধারেও কেউ ঘেঁসে না। তারপর আসে একদল সরকারী কর্মচারী আর জনকয়েক ছোকরা। কয়েকজন অফিসারও আসেন তাদের সঙ্গে—আত্মসম্মানের জ্ঞানটুকু আবার আছে তাঁদের ষোলো আনা। দেখতে দেখতে বৈঠকখানা ঘর গোলমাল আর সিগ্রেটের ধোঁয়ায় যায় ছেয়ে।

সনৃকার বাঁধা বাবুও আসেন। আসেন তিনি প্রায় প্রতিদিনই। এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে থাকেন তিনি প্রেয়সীর মুখপানে চেয়ে—দুঃখ বেদনা হতাশা হাহাকারে ভরা সে চোখের দৃষ্টি। কেন সনৃকা মরতে এল এখানে, কেন করেছে সে কুলত্যাগ, ছেড়েছে ধর্ম, জলাঞ্জলি দিয়েছে সমাজ সংসার পরিবার সব কিছুকে—তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বচসা হয় ওদের দু'জনের মধ্যে।

আড্ডা-ইয়ার্কি নাচগান হৈ-হল্লায় বৈঠকখানা ঘরটি যখন বেশ সরগরম জমজমাটি হয়ে উঠেছে তখন প্রায়ই বোসিয়া এসে ঠোঁট বেঁকিয়ে চুপি চুপি বলে বাবুটিকে: 'এখানে হাঁ করে বসে কেন? যাও না, বাপু, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে নিরিবিলি একটু সময় কাটাও গে যাও!'

এরা দু'জনেই জাতে হচ্ছে ইহুদী। দু'জনেরই জন্মভূমি হোমেল

শহর। বিধাতা দু'টিকে সৃষ্টি করেছিলেন যেন পরস্পরকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসবার জন্যেই শুধু। কিন্তু ঘটনাচক্রে—বিশেষতঃ সেই যে তাদের শহরে সেবার জনসাধারণ মেতে উঠেছিল ইহুদী-নিধন পর্বে * তারই ফলে, হতবুদ্ধি আর বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে এবং যথাসর্বস্ব খুইয়ে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপর আবার কত দুঃখকষ্টের পর এরা পেয়েছে পরস্পরের সন্ধান! বিস্তর দুঃখকষ্ট অপমানকে অঙ্গের ভূষণ করে, লোকটা শেষে এখানকার একটা ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। নাম তার নেমান। ভারী ধর্মভীরু লোক এই নেমান, আর বেশ গোঁড়া ইহুদীও বটে। সে জানে সন্‌কাকে দেহবণিকদের কাছে বেচে দিয়েছিল সন্‌কার মা নিজে; তারপর বারবার বিকিকিনির মধ্যে দিয়ে হাতবদল হতে হতে শেষটায় এখানে এসে ঠেকেছে হতভাগী। এসব কথা তার মনে পড়ে, আর অন্তরাত্মা থেকে থেকে শিউরে ওঠে—যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় সে আপনার মধ্যে। তবুও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি তার ভালোবাসা। তাই প্রতি সন্ধ্যায় নেমান এসে হাজির হয় আনা মারকোব্‌নার এই বৈঠকখানায়। দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থেকে তার স্বল্প থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যেদিন সে একটি রুবল জমিয়ে তুলতে পারে, সেদিন সে এসেই সন্‌কাকে নিয়ে সোজা চলে যায় তার ঘরে। কিন্তু তাতে করে শেষ অবধি তাদের কেউই সুখী হতে পারে না—ক্ষণিক দৈহিক সম্ভোগের যখন ঘটে অবসান তখন তাদের মধ্যে শুরু হয় পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, আর তার ফলে কান্নাকাটি—ব্যর্থতার

---

* অনুরূপ বিপর্যয়-কাণ্ড আমাদের দেশে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সর্বপ্রথম ১৯৪৬ সালের হত্যাকাণ্ডে। ইউরোপে শুধু নাৎসী জার্মানীতেই এ হেন ব্যাপার প্রথম দেখা যায় নি, প্রাক্-বলশেভিক রুশিয়ায় এবং অন্যান্য নানা দেশেও—বিশেষ করে সমগ্র মধ্য-ইউরোপখণ্ডে—এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক উপপ্লবকে সামান্য কয়েক দশকের ফাঁকে ফাঁকেই আজ শত শত বছর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়ে আসতে দেখা গেছে। শুধু যুদ্ধবিগ্রহই নয়, এইরূপ সামাজিক উপপ্লবও চিরদিন গণিকাবৃত্তির বিপুল রসদ যুগিয়ে এসেছে। অথচ এদিকটায় আজও সমাজবিজ্ঞানীদের তেমন চোখ পড়েনি।

হতাশা। তাদের হিব্রু ভাষার ঝগড়া কেউ বুঝতে পারে না বটে, তবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর সন্‌কার রাঙা চোখ আর ফুলো ফুলো গাল দেখে সবাই বেশ বুঝতে পারে—বেশ একটা ঝড় বয়ে গেছে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু প্রায়ই নেমানের হাতে টাকাকড়ি কিছু থাকে না। তখন সে এসে সারা সন্ধ্যা নীরবে বসে থাকে সন্‌কার পাশটিতে। আর দৈবাৎ যদি অন্য কোনও খদ্দের এসে সন্‌কাকে নিয়ে চলে যায়, তবে সে তার ফিরে আসবার আশায় ধীর ভাবে বসে বসে প্রতীক্ষা করে আর ঈর্ষ্যায় জ্বলেপুড়ে মরতে থাকে। তারপর সন্‌কা যখন ফিরে এসে আবার তার পাশটিতে গিয়ে বসে তখন—যাতে অপর কারও মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট না হয় তাই সন্‌কার দিকে না চেয়ে সোজা শূন্যের দিকে তাকিয়ে—ভৎর্সনায় আর তিরস্কারে তাকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে সে, আর সন্‌কার অশ্রুসিক্ত পেলব আঁখিদু'টিতে ফুটে ওঠে শুধু মৌন নিরুপায় আত্মবিসর্জনের বেদনা।

একদল জার্মান এসে ঢোকে; সবাই তারা কাজ করে এক চশমার দোকানে। মাছ আর মশলাপাতির কারবারে কাজ করে এমন একদল কেরানীও এসে হাজির হয়। আর আসে দুইজন যুবক, সারা ইয়ামাই চেনে তাদের ভালো করে—দু'জনেরই মাথায় টাক: একজন হলো হিসেব-লিখিয়ে নিকি, আর একজন হচ্ছে গাইয়ে মিশ্‌কা—ইয়ামা-ময় এই দুই নামে পরিচিত তারা। দু'জনকেই বিশেষ খাতির করে বসানো হয়। চঞ্চলা নিউরা একবার করে বাইরের ঘরে উঁকি মেরে দেখে যায় কে এল, তারপর উল্লাসভরে গিয়ে তার অভ্যাসমতো হাঁক ছাড়ে:

"তোর বর এয়েছে রে, জেনকা?" নয়তো:

"তোর মনের মানুষ এ[illegible] রে ঐ, ছোট মান্‌কা!"

আর ঐ গাইয়ে মিশ্‌কা—লোকটা আসলে গাইয়ে ছিল না মোটেই, ছিল এক ওষুধের দোকানের মালিক—ঘরে ঢুকেই গিটকিরি দিয়ে তার সেই ছাগ-বিনিন্দিত ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে:

সাচ্চা ক-থা সবা-ই জা-নে !

আয় ছু-টে আয় আমার পা-নে-এ-এ !

সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে চতুরঙ্গ···শুরু হয় নাচ।

তামারার মনের মানুষ সেন্‌কাও আসে। সে আবার পছন্দ করে না যে কেউ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তাই সবার অলক্ষ্যে এসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে (পায়ের দোষ আছে একটু) তামারার কাছে গিয়ে, তাকে নিয়ে সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে সে।

তারপর আসে আরও অনেকে। নাচ-গান-হল্লা সেই যে চলেছে তো চলেইছে। এমন সময় এসে ঢোকে সাতজন ছাত্র, একজন তরুণ অধ্যাপক, আর 'প্রতিধ্বনি' কাগজের জনৈক সংবাদদাতা।

—নয়—

এই সংবাদদাতাটি ছাড়া আর সব ছেলেক'টিই সেদিন তাদের জানা-শোনা মেয়েদের নিয়ে 'মে দিবস' উপলক্ষ্যে সকাল থেকে হৈ চৈ করে বেড়িয়েছে। নীপার নদীতে নৌকো বেয়েছে তারা। করেছে চড়ুইভাতি। ছেলেমেয়েরা পালা করে করে স্নান করেছে নদীতে; খেয়েছে গেরস্ত-বাড়ীতে তৈরি সুস্বাদু মদ। প্রাণ খুলে গেয়েছে তারা ক্ষুদে রুশিয়ার গান। পরে সন্ধ্যার সময় ছেলেরা সব নিজ নিজ সখীদের মধ্যে কয়েকজনকে বাড়ী পর্যন্ত, বা গেট পর্যন্ত, পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছে।

সারাটা দিন তাদের বেশ হৈ চৈ করেই কেটেছে সত্যি। সবুজ গাছপালা, স্রোতের জল, আর রোদের আলো, মাতিয়ে রেখেছিল সবাইকে। তারই সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের কলধ্বনি, অঙ্গভঙ্গী, কটাক্ষ, চকিত স্পর্শ, অঙ্গাবরণের সৌরভ, নদীর বুকে তাদের মন-ভোলানো মেয়েলি ভয়, সবুজ ঘাসের 'পরে সামুবার ঘিরে উপেক্ষা-ভরে তাদের অর্ধশয়ান দেহসৌষ্ঠব, এই সব নির্দোষ স্বাধীনতা ছেলেদের প্রাণে এনে দিয়েছে এক মধুর আবেশ। ছেলেমেয়েরা একত্রে চড়ুইভাতি

করতে বা প্রমোদ ভ্রমণে গেলে এ-ধরণের মেলামেশা হবেই, আর তাতে করে তরুণদের মনও যে উঠবে চঞ্চল হয়ে সে আর নতুন কী!

তারপর সকলে ছাত্রদের রেস্তরাঁ "চড়ুইপাখীর কুলায়ে' এসে মদ খেতে আর হাসি গল্প করতে লাগল। রাত বারোটায় রেস্তরাঁ গেল বন্ধ হয়ে। মদে বুঁদ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সবাই। এখন কোথায় যাওয়া যায়? নিজের নিজের বাড়ী? নাঃ, এত তাড়াতাড়ি, এখনই ছাড়াছাড়ি! এ-ই তো চলেছে বেশ। একবার ছাড়াছাড়ি হলে আর জমবে না। "টিবোলি গার্ডেনে" চলো। না, সে জায়গাও আবার বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে। "তবে সবাই চলো আমার বাড়ীতে," —প্রস্তাব করলে বোলোদিয়া পাব্‌লোব্; বললে,—"আমার কাছে মদ আছে।"

—"দূর, এই দুপুর রাতে গেরস্তের বাড়ী—নাঃ!"

—"তার চাইতে চলো মেয়েদের কাছ থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। সেই হবে যা চাইছ তার অনেকটা কাছাকাছি,"—মেজাজের মাথায় প্রস্তাব করে বসল লিখোনিন।

লিখোনিন হচ্ছে একজন পুরনো ছাত্র—ঢেঙা, একটু যেন কুঁজো মতন, আর বিষণ্ণ গোছের মুখশ্রী তার। মনে-প্রাণে সে ছিল অ্যানার্কিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী, আর কাজেকর্মে ছিল তাস, বিলিয়ার্ড, আর ঘোড়দৌড়ের অতি-বড়ো জুয়াড়ী—তা' জুয়াড়ী হিসেবে ভাগ্যও ছিল তার ভারী অনুকূল। ঠিক আগের দিনই 'বণিকদের আড্ডায়' সে হাজার রুবল জিতে এসেছে, সেই টাকাটা খরচ না হওয়া অবধি স্বস্তি নেই তার।

"সেই ভালো। চলো তবে সব।"—কে যেন সায় দিয়ে ওঠে।

আর একজন প্রস্তাব করে,—"তার চাইতে যে-যার বাড়ী ফিরে যাই এখন।" তারপর একজনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে সে, "প্রফেসর, তুমি কী ঠিক করলে?"

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজ্যজয় করতে পারবে না হে,"—বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে লিখোনিন: "প্রফেসর, তুমিও আসছ তো?"

ওদের দলে ছিলেন একজন ছোকরা অধ্যাপক—অনেকটা পাঠশালার

সর্দার পড়ুয়ার মতন ছিল তাঁর কাজ। নাম তাঁর ইয়ার্‌শেঙ্কো। লিখোনিনের কথায় বাস্তবিক চটে গেছেন বলেই মনে হলো তাঁকে; যেন সভয়ে বলে উঠলেন তিনি: "না না, আমি ওসব নোঙরামিতে নেই। বেশ তো সারাদিন নির্মল আনন্দ হলো; আবার ওসব কেন?"

"বটে!"—উত্তরে বল্লে লিখোনিন,—"আমার স্মরণশক্তি যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে না থাকে তবে, বেশিদিনের কথা নয়, এই গত শরৎকালেই এক ভাবী অধ্যাপক মোমসেনকে* যেন দেখেছি আমাদের সঙ্গে নাচনা-গাওনা আর হৈ-হুল্লোড় করতে···"

মিথ্যে বলেনি লিখোনিন। ছাত্রাবস্থায় এবং তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে, মদের আড্ডা, প্রমোদ-ভবন, সবখানেই ছিল ইয়ারশেঙ্কোর অবাধ গতিবিধি। তাঁর সঙ্গীরা ভেবেই পেত না, পড়াশোনার সময় তিনি পেতেন কখন। অথচ গোড়া থেকেই সব পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে এসেছেন তিনি। তবে সম্প্রতি তিনি আগেকার অভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন।

লিখোনিনের ঠাট্টা শুনে চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি; বললেন,—"হা ভগবান! ছেলেবেলায় কী করেছি না-করেছি তাতে কী এসে যায়? ছেলেবেলায় চিনি চুরি করে খেয়েছি, জামাকাপড় নোঙরা করেছি, পোকামাকড় ধরে তাদের পাখা ছিঁড়ে নিয়েছি।"

বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ইয়ারশেঙ্কো; বলে চল্লেন তিনি: "কিন্তু সব তারই একটা সীমা আছে, আছে মধ্যপন্থা। তোমাদের অবশ্য আমি উপদেশ, কি শিক্ষা, দিতে চাইছি না; তবে সকলেরই উচিত সুসঙ্গত আচরণ করা। এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে, গণিকাবৃত্তি হচ্ছে মানবতার এক মহা-অভিশাপ। আর এ বিষয়েও কোনও মতদ্বৈধ নেই যে, এ মহাপাতকের জন্যে আসলে মেয়েরা দায়ী নয়, বরং দায়ী হচ্ছি আমরা পুরুষরাই, কেন না আমাদেরই চাহিদা হচ্ছে এই যোগানদারির মূল। আর তাই এক-আধ পেয়ালা মদ

* বিখ্যাত ঐতিহাসিক Theodor Mommsen (1817—1903)

বেশি গিলেই, আমার সমস্ত বিশ্বাস সত্ত্বেও যদি আজ আমি যাই কোন-এক গণিকার কাছে, তবে আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে একই সঙ্গে তিন-তিনটে নীচতা: প্রথম অপরাধ হবে ঐ নির্বোধ হতভাগী নারীর কাছে,—তাকে আমি আমার পাপ রুবলের বিনিময়ে হীনতম দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করব; দ্বিতীয়তঃ অন্যায় হবে মানবতার কাছে, কারণ আমার এই ধিক্কারজনক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে, দু'-এক ঘণ্টার জন্যে এক বারবণিতাকে ভাড়া করে, আমি গণিকাবৃত্তির সমর্থনই করে বসব; এবং তৃতীয়তঃ অপরাধ হবে নিজের বিবেকের কাছে—এবং যুক্তির কাছেও বটে।"

"ফুঃ-উঃ-উঃ!"—ঠাট্টা করে শিষ দিয়ে উঠল লিখোনিন: "আমাদের দার্শনিক মশাই দেখছি চর্বিত-চর্বণ শুরু করে দিলেন: 'রশি মানে সাধারণ দড়ি'।"

তাতেও দমলেন না অধ্যাপক; বলতে লাগলেন: "অবশ্য ভাঁড়ামি করার চেয়ে সোজা কাজ আর নেই। কিন্তু আমার মতে আমাদের এই দুঃখময় রুশীয় জীবনে এই ভাবের ঘরে লুকোচুরির চেয়ে পরিতাপ-জনক ব্যাপার নেই আর কিছুই। আজ আমাদের মনে হচ্ছে, 'তা, একটিবার গণিকালয়ে গেলেই কী, আর না গেলেই কী? এই একটি বারের জন্যে তো আর সব কিছু ভালোও হয়ে উঠছে না, মন্দও হয়ে যাচ্ছে না।' পাঁচ বছর পরে বলব, 'ঘুসের কারবারটা বড়ই জঘন্য বটে, কিন্তু বুঝলে তো ভায়া, পুত্রকন্যা···পরিবার···।' তারপর ঠিক এইভাবেই দশ বছর পরে, মেরুদণ্ডহীন রুশীয় উদারপন্থী হিসেবেই আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্যে হা-হুতাশ করতে করতে ইতর বদমাইস লোকদের সুমুখে মাথা নত করে চলতে থাকব, আর তাদেরই বৈঠকখানায় গিয়ে তাদের কৃপা ভিক্ষা করে মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে তখন আমাদের। তখন আমরা বলব, 'জানই তো ভায়া, বাঘের সঙ্গে বাস করতে গেলে বাঘেরই মতো হালুম হুলুম করে চলতে হয়।' সেই যে একজন মন্ত্রী রুশীয় ছাত্রদের ভাবী হেডক্লার্কের দল বলে বর্ণনা করেছিলেন, একতিলও অত্যুক্তি করেননি তিনি···রুশীয় ছাত্রেরা বাস্তবিকই হচ্ছে যত সব ভাবী হেডক্লার্ক!"

"নয়তো প্রফেসার।"—জুড়ে দিলে লিখোনিন।

সে কথায় কর্ণপাত না করেই বলে যেতে লাগলেন ইয়ারশেঙ্কো :

"আর সব চাইতে বড়ো কথা—তোমরা কি কেউ ভেবে দেখেছ, এই কিছুক্ষণ আগে আমরা আমাদের বান্ধবীদের নিয়ে নদীতে, নদীতীরে, কতই না হেসে খেলে বেড়ালাম; কৈ, কেউই তো কোনো অসভ্য আচরণ করিনি তখন! আর যেই বান্ধবীরা সব গেলেন চলে, অমনি সবাই ছুটলাম এই সব ভ্রষ্টা নারীর কাছে! এ যেন বোনকে দেখে কামার্ত হয়ে চলে এলাম ইয়ামাতে! ছিঃ ছিঃ!"

"তা বলে পুরুষমানুষের কাম-প্রবৃত্তিকে তো আর দমিয়ে রাখা যাবে না। আর সে কামনা চরিতার্থ করবার একটা জায়গাও থাকা চাই সমাজে,"—বললে বোরিস সোবাসনিকোব। লম্বা, চশমা-পরা, ফিটফাট ছোকরাটি।

বলেই চলল সে,—"বাড়ীর ঝিয়ের সঙ্গে মাখামাখি করা, কি পরের বৌএর ওপর নজর দেওয়ার চাইতে এ বরঞ্চ ভালো। আর আমার যদি নারী না হলে না-ই চলে, তা হলে যাতে সহজপ্রাপ্য মেয়েমানুষ পাই তার একটা ব্যবস্থাও তো থাকা দরকার সমাজে?"

"এঃ, বেজায় যে দরকার দেখছি!"—বিরক্তিভরে একটা ক্ষীণ হতাশার ভঙ্গি করে বলে উঠলেন ইয়ারশেঙ্কো: "যাই হোক, অন্ততঃ এটুকু স্বীকার করবার মতো সৎসাহসও থাকা উচিত আমাদের যে, আমরা রুশিয়ার শিক্ষিত-সমাজের ব্যক্তিরা, কলেজে থাকতে থাকতেই যাদের সব কাঁধ আসে ঝুঁকে, যারা সব অকালেই হয়ে পড়ে পঙ্গু তারা, নিজেদের মধ্যে বর্বর উন্মাদনা, কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, অনুভব করবার শক্তিটুকুও হারিয়ে বসে আছি সবাই। আমাদের এটা যৌন-ক্ষুধা নয় মোটেই, এ হচ্ছে গিয়ে সামান্য একটা সখ, একটা অসংযম, এক মুহূর্তের ক্ষীণ আত্মবিনোদন। তবে শোনো বলি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা এক বিবরণ। একজন ইঙ্গুশ—না কি এক অসেটিয়ানের গল্প. যাই হোক, সংক্ষেপে বলতে গেলে সে হচ্ছে এক দুর্ধর্ষ পার্বত্য ককেশিয়ানের কাহিনী। কিস্‌লোবোদ্‌স্ক-এ বেড়াতে এসেছিল লোকটা। জায়গাটা হচ্ছে বড়লোকদের এক সৌখীন স্বাস্থ্যনিবাস। মন্দোক্ত সুসজ্জি

সন্ধ্যা। লোকটার কানে এসে ঠেকল গানবাজনার আওয়াজ। শব্দ শুনে আপন. মনেই পা বাড়ালে সে সেইদিকে, গিয়ে পৌঁছুল এক নাচের মজলিশের পাশে। জায়গাটা ছিল চেরা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে তখন চলছিল এক নাচের মহড়া। একজন মহিলার বেশ ছিল এমনই আলুথালু যে তাঁকে প্রায় উলঙ্গ বল্লেই হয়।···তিনিও কী এক খেয়ালের বশে আমোদ করে নাচতে নাচতে বারবার সেই বেড়ার পাশে এসে এমন ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগলেন যে, তাঁর ঘাগরার প্রান্তটুকু সেই স্বরূপ ঘোড়সওয়ারের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আর কী।··· তারপর, কোথাও কিছু নেই—আচম্‌কা শোনা গেল এক আর্ত চিৎকার! ব্যাপার কী? এক লাফে সেই চেরা কাঠের বেড়ার আড়াল ডিঙিয়ে পাহাড়ীটা গিয়ে সেই মহিলার নাচের দোসরকে ধাক্কা মেরে কাছছাড়া করে দিয়েছে; চোখের নিমেষে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলেছে মহিলাটির পরণ থেকে তাঁর নাচের সেই ঝিলমিলে পোষাকখানা, চিৎ করে শুইয়ে ফেলেছে তাঁকে মাটিতে। কত লাঠি আর ছাতা যে লোকটার পিঠে ভাঙা হলো! কে একজন ছুঁড়লে এক রিভলবার। একজন পদাতিক সৈন্য এসে দিলে তার পিঠে বসিয়ে তরোয়ালের এক ঘা। কিন্তু দিলে কী হবে? ঐ অতগুলো ভদ্রলোকের চোখের সুমুখে, মশাই, লোকটা হতভাগিনীকে করলে বলাৎকার!···তারপর পুলিশ এসে যখন ছেঁকে ধরলে তাকে, তখন শান্ত হয়ে সে কী বললে জান? বল্লে—'যা খুসী, জেল দাও, মাথা কাট, কিছুতেই আপত্তি করব না। কিন্তু মেয়েটা ন্যাংটো হয়ে বেড়াচ্ছিল কেন?' এই ব্যাপার। আমি থাকলে ককেশিয়ানটার পক্ষ নিতাম। তার দোষ কী? প্রাণ-শক্তিকে রুখবে কে? কিন্তু তোমরা বলছ তোমাদের প্র-য়ো-জ-নের কথা। হায়রে! আমরা মাথাওয়ালা লোকেরা সব প্রেম করি শুধু কল্পনায়। পুরুষ নই আমরা।"

"কইছ কথা সবার হয়ে,"—বলে উঠল সোবাসনিকোব: "কিন্তু প্রফেসর, তোমার প্রাণটা হচ্ছে ঠিক সেই রোমানের মতো যে এক সাবাইন মেয়েকে এনেছিল চুরি করে। অথচ তোমার মনোভাব হচ্ছে অনুতপ্ত গ্রামীণ ভদ্রলোকের মতো।"

এইখানে বন্ধুমহলে রামেশিস নামে পরিচিত একজন ছাত্র সালিশী করতে এগিয়ে এল। ছাত্র-সমাজে তার চালচলন ছিল একটু অদ্ভুত গোছের। অন্য সব ছাত্র যখন পালা করে রাজনীতি, প্রেম, অভিনয়, আর যৎসামান্য লেখাপড়া করে দিন কাটাত, সে তখন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করত যত সব মামলা-মোকদ্দমার নথিপত্র। এরই ফলে আইনজীবী-মহলে সে বেশ প্রতিপত্তিও গড়ে তুলেছিল; তার বয়স কম হলেও, খুব বড় বড় আইনবিদ্ পর্যন্ত তার মতামত মন দিয়ে শুনতেন। সবারই বিশ্বাস ছিল রামেশিস কালে প্রচণ্ড পশার জমিয়ে ফেলবে। রামেশিস নিজেও কখনও এ ভাব গোপন করার কোন চেষ্টাই করত না যে, বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের মধ্যেই সে আইন-জীবীর কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করে ফেলতে পারবে। তার বন্ধুবান্ধবরাও প্রায়ই তাকে তাদের সভাসমিতিতে সভাপতি নির্বাচন করত; তবে সে-ও আবার সময়াভাবের অজুহাতে এ সম্মান গ্রহণে প্রায় কখনই রাজি হতো না। তবে ইয়ারশেঙ্কোর মতো সে-ও ছাত্র-সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তির কদর বুঝত, আর তাই ছাত্রদের বিপদ-আপদের সময় সালিশীর ব্যাপারে কখনই পেছ-পা হতো না। সে-ই এখন এগিয়ে এসে বল্লে:

"নাও হে, গাব্রিলা পেত্রোবিচ, তোমায় কেউ পাঁকে বসাতে যাচ্ছে না—ভয় নেই। সামান্য একটা ব্যাপার, তা নিয়ে এত তর্কাতর্কি কেন? কয়েকজন রুশীয় ভদ্রলোক একটু ফুর্তি করে রাতটা কোথাও কাটাতে চান, অথচ ঐ সব বাড়ী ছাড়া সে রকম কোনও জায়গাও খোলা নেই এখন, ব্যাপার তো মোটে এই। নাও, চলো!..."

"তাই বলে দেহপসারিণীদের কাছে যেতে হবে আমোদ করতে?"

"ক্ষতি কী? একবার এক ভোজসভায় এক দার্শনিককে অপদস্থ করবার জন্যে আসন দেওয়া হয়েছিল বাজনদারদের পাশে। আসন গ্রহণ করে তিনি বল্লেন, 'সবার শেষের আসনটিকে সবার প্রথমের আসনে পরিণত করার এই হচ্ছে সুবর্ণ-সুযোগ'। তুমিও তাই কোরো: নারীসঙ্গ করতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, তবে শুধু আমাদেরই সঙ্গে থেকো, ফিরেও এসো একেবারে নিষ্পাপ অবস্থায়।"

"তুমি যে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ হে, রামেশিস!"—উত্তর দিলেন অধ্যাপক: "তোমার কথা শুনে আমার মনে পড়ল ঐ সব বুর্জোয়াদের কথা যারা মানুষ-মারা দেখবার জন্যে রাত থাকতেই উঠে বধ্যভূমিতে গিয়ে কেবলই আক্ষেপ করতে থাকে: আমরা কী করতে পারি? আমরা তো প্রাণবধের শাস্তির বিপক্ষেই; কিন্তু কী করব, বিচারকের ওপর তো হাত নেই আমাদের।"

"চমৎকার বলেছ, গাবরিলা পেত্রোবিচ!"—উত্তর দিলে রামেশিস: "একেবারে মিথ্যেও নয়। তবে তোমার ও উপমা আমাদের বেলায় খাটতে না-ও পারে। দেখো, কোথাও অনুপস্থিত থেকে কেউ কখনও কোন কঠিন রোগ আরাম করতে পারে না,—তার জন্যে প্রথমে রুগীকে দেখা চাই। অথচ এই যে আমরা সব এখন পথে দাঁড়িয়ে পথিকদের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি, এই আমাদের সবাইকেই একদিন-না-একদিন এই গণিকাবৃত্তি রূপ মহা-অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়তে হবে; লিখোনিন, আমি, বোরূইয়া সোবাসনিকোব, আর পাবুলোব, এই ক'জনকে লড়তে হবে আইনবিদ্ হিসেবে, আর পেত্রোবৃস্কি আর তোলপাইগিন এদেরকে লড়তে হবে চিকিৎসক হিসেবে। অবশ্য ভেন্টমান-এর কথা আলাদা—সে পড়ছে গণিত। তবে সে হবে শিক্ষক—তরুণদের পরিচালক, আর, যাক গে, জাহান্নমে যাক, বয়সকালে সন্তানের পিতাও হবে সে। আর যদি সত্যিই জুজুর ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাও, তা হলেও তার আগে অন্ততঃ গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা উচিত। আর তুমি নিজে, গাবরিলা পেত্রোবিচ, তুমি হলে ভবিষ্যতে যত সব কবর খোঁড়া হবে তার প্রধান পাণ্ডা, প্রত্নতত্ত্বের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। প্রাচীন থীবীস আর নিনেবে'র পবিত্র দেবদাসী-প্রথার রহস্য উদ্‌ঘাটনকারী, বর্তমান গণিকাবৃত্তির পরিচয় কি তোমার কাছেও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার নয়?..."

"সাবাস, রামেশিস! চমৎকার!"—বাহবা দিয়ে উঠল লিখোনিন: "ঢের হয়েছে, এইবার নে, আমাদের প্রফেসরকে চ্যাংদোলা করে গাড়ীতে তোল।"

অধ্যাপককে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একটা পুলিশ

অনেকক্ষণ থেকে এই সব ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখছিল, এখন এগিয়ে এসে বললে—"আপনারা এখানে জটলা করবেন না।"

একটু ঠাণ্ডা হলেন ইয়ারশেঙ্কো; বললেন, "বেশ, যাব তোমাদের সঙ্গে, তবে ভেবো না যে মিশরের ফেরে৺া রামেশিসের কথায় রাজি হয়েছি,—না, তা মোটেই নয়। না গেলে তোমাদের এই মধুর সঙ্গ ছাড়তে হবে তাই। তবে এক সর্তে, শুধু একটু মদই খাব, তার বেশি কিছু নয়,—গল্প, হাসাহাসি, ফাজলামি, নোংরামি, সে সব কিছু চলবে না। আমরা ভাবী রাশিয়ান, ঘাগরা দেখলেই যদি আমাদের নোলায় জল আসে, তবে সে হবে বড়োই লজ্জার কথা।"

রাজি হয়ে গেল লিখোনিন—"বেশ, তাই হবে।"

সকলেই এই সর্তে রাজি।

ঠেলাঠেলি করে সকলে গিয়ে একটা গাড়ীতে চড়ে বসল। লিখোনিন বললে, "আমরা ডোরোসেনকোতে নামব।"

ডোরোসেনকোতে এসে সকলে একটা রেস্তর৺ায় গিয়ে ঢুকল। সারারাত এটি খোলা থাকে। ওরা এখানে কেউই কিছু খেল না। প্রত্যেকেরই মনে একটা অজানা আশঙ্কা: এ কি ভালো হচ্ছে?—বোধ হয় না। গণিকালয়েই কি চরম আনন্দের সন্ধান মেলে?—না, তার চাইতে বরং নেশায় বিভোর হওয়া যাক। সন্দেহের দোলায় দুলে লাভ কী? তাই তারা সব ঠিক করলে, মদ খেয়ে মনটাকে রামধনুর রঙে রঙীণ করে তুলবে, বিবেকের 'পরে পড়বে এক তরল যবনিকা। —তারপর?

তারপর তাদের হাত কী করলে, পা কী করলে, মুখ কী করলে, জানাবার কোনও দরকারই হবে না···তারা জানবেও না। ···শুধু ছাত্রেরাই নয়, ইয়ামাতে যারাই প্রথম ঢুকতে যায় তাদেরই বোধহয় এই রকমের দ্বিধা আসে, আর তাই বোধহয় এখানকার এই রেস্তর৺ায় রাতে জমে এত ভীড়। কেউই এখানে বেশিক্ষণ বসে না। আসে, —মনের দ্বিধা, বিবেকের অনুশাসন, এ সব কিছুকে ক্ষণকালের জন্যে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে, শয়তানকে সাথী করে নরকে ডুবতে যায়।

ছাত্রদের যখন মদ খাওয়ার পালা চলছে তখন দুয়ে ঘরের এক কোণে উপবিষ্ট দু'টি লোকের দিকে বারবার নিরীখ করে দেখছিল রামেশিস—তাদের একজন ছিল ছিন্নবাস-পরিহিত এক বিশাল বপু বৃদ্ধ, আর অপর জন—যে তার সামনে বসে ছিল সে—ছিল এক ভদ্রবেশ-ধারী ব্যক্তি। বৃদ্ধ তার সম্মুখে রক্ষিত একটি বাদ্যযন্ত্রে আঙুল চালাতে চালাতে নীচু ভাঙা ভাঙা কিন্তু মিঠে সুরে গান গেয়ে চলেছিল :

"ও আমার দেশের মাটি, দেশের মাটি,
ফসল-ভরা দেশের মাটি গো !"

"তোমরা বসো, আমি আসছি,"—বলে উঠে গেল রামেশিস। তারপর সেই ভদ্রবেশধারী লোকটির কাছে গিয়ে, একটু পরেই তাকে ডেকে নিয়ে এসে বল্লে : "শোনো সবাই, এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন ইবানোবিচ্ প্লাতোনোব, একজন সংবাদিক। এমন কুঁড়ে কিন্তু এমন আশ্চর্য প্রতিভাবান সাংবাদিক আর পাবে না কোথাও।"

"তা হলে আসুন একটু পান করা যাক"—প্রস্তাব কল্লে লিখোনিন। ইয়ারশেঙ্কো নবাগতকে বললে,—"আচ্ছা, আপনিই না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিকুলোন্স্কির বিষয়ে কাগজে লিখে-ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, আমিই বটে"—উত্তর দিলেন সাংবাদিক।

"ভারী চমৎকার হয়েছিল সে লেখাটা। ঠিকই লেখা হয়েছিল।"

সংবাদিকের সঙ্গে দেখা হয়ে ভারী খুশী হলেন অধ্যাপক। তারপর সকলের সঙ্গে সাংবাদিকের আলাপ জমে গেল। তখন সবাই বললে,—"ইয়ামায় যেতে হবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।"

"বেশ, আপত্তি নেই"—সাংবাদিক বল্লেন,—"যদি আমার নিয়ে কোনও অসুবিধা না হয়, আপনাদের সঙ্গে যেতে আমি রাজি আছি। আজ 'নীপার জগৎ' কাগজখানা থেকে হঠাৎ কিছু পাওয়াও গেছে। আচ্ছা, আমি আসছি এখখুনি !"

প্লাতোনোব বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে বিদায় নিয়ে বল্লে : "আমি এখন যেখানে যাচ্ছি, ঠাকুরদা, সেখানে

তোমার যাওয়া ঠিক হবে না। তুমি বরং কাল আমার সঙ্গে ঐ জায়গায় দেখা করো। আসি তবে!"

সকলে রেস্তরাঁ ছেড়ে বাইরে এল। বোরিয়া সোবাস্নিকোব লিখোনিনকে আড়ালে ডেকে এনে বললে: "বেশ তো ছিলাম আমরা, ওকে আবার আমাদের মধ্যে টানা কেন? কে না কে?"

লিখোনিন বললে: "চুপ কর ভাই! বেড়ে ফুর্তিবাজ লোক ও।"

—দশ—

আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ের সামনে এসে ইয়ারশেঙ্কো বললেন: "যদি একান্তই কোনও গণিকালয়ে যেতে হয় তবে ভালো জায়গাতেই যাওয়া উচিত। আর একটু এগিয়ে 'ত্রেপেল'-এ গেলে কেমন হয়?"

"আসুন দয়া করে, আসুন কত্তা,"—দরবারী কায়দায় কুর্ণিশ করতে করতে ইয়ারশেঙ্কোকে ঠাট্টা করে বল্লে লিখোনিন: "পায়ের ধুলো পড়ুক গরীবের আস্তানায়।"

"এ কিন্তু ভারী নোংরা জায়গা··· ত্রেপেলে অন্ততঃ মেয়েরা দেখতে সুন্দর।"—আপত্তি করতে লাগলেন অধ্যাপক মশাই।

"না না। এই বেশ,"—হাসতে হাসতে বললে রামেশিস।

সবাই আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়েই এসে ঢুকে পড়ল। সাইমন দেখলে একদল লোক ঢুকছে। একসঙ্গে অত গুলো লোকের আসা সে পছন্দ করে না। তাতে হৈ চৈ, হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা হবার সম্ভাবনা থাকে। সে চায় লোক আসবে একলা একলা, লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে; এদিক-ওদিক চাইবে, কোন চেনা লোক দেখতে পেল কি না। সে রকম আগন্তুককে খাতিরও করে থাকে সাইমন।

বৈঠকখানা ঘর তখন অতিথিতে ভর্তি। কেরানীরা একটু আগে নেচেকুঁদে তখন বিশ্রাম করছিল আর রুমাল নেড়ে হাওয়া খাচ্ছিল। রলি পলি ঢুলছিল একটা চেয়ারে বসে।

ছাত্রেরা এসে ঢুকতেই জনকয়েক মেয়ে তাদের কাউকে কাউকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল তাদের দিকে।

—"তামারোচ্কা, তোর বর এয়েছে রে—বোলোদেন্কা!"—চেঁচাতে লাগল নিউরা: "আমারও বর এসেছে—মিস্কা!"—বলেই সে প্রেত্রোবিস্কির গলা ধরে ঝুলে পড়ল: "সত্যি, মিসেন্কা, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?"

প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো তো কাণ্ডকারখানা দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে খবরগিরণী এম্মাকে বললেন: "আমাদের জন্যে একটা আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত হতে পারে কি?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" এম্মা বলতে লাগল: "পারবে, তা' পারবে, পারবে বৈ কি! আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"আর রঙিন মদ আর কফি?"

"তারও ব্যবস্থা হতে পারবে, পারবে বৈ কি! আর—মেয়েদের কি ঘরে পাঠিয়ে দেব?"

ইয়ারশেঙ্কো গম্ভীর হয়ে বললেন: "দরকার মনে কর তো দিয়ো পাঠিয়ে।"

এক এক করে মাঙ্কা, কিটী, লিউব্কা, আর আরও কয়েকজন মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। যে যার কোল খালি পেলে সে তারই কোলে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরলো: "ওগো আমার খোকা, মাইরি, কী সুন্দর তোমায় দেখতে!···কমলালেবু খাওয়াবে, ভাই?"

—"বোলোদেন্কা, আমায় লজেঞ্জ কিনে দাও,—দেবে?"

—"আমায় চকোলেট।"

প্রফেসরের কাঁধে ভর করেছিল ভেরা। বললে: "আমার এক বন্ধুর অসুখ, তাই তার ঘরে অতিথি নেই। তার জন্যে কিছু চকোলেট আর আপেল কিনে দাও না, ভাই?"

—"ওসব বাজে কথা ছাড়ো। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ওখানটিতে সরে গিয়ে বসো।"—প্রফেসর উত্তর দিলেন।

ঢঙ করে বললে ভেরা,—"কিন্তু তোমার ঐ রূপ দেখে তা' যে পারিনে, প্রিয়তম।"

"পাড়বে, টা পাড়বে, পাড়বে বৈ কী!"—এম্মা এডোয়ার্ডোব্নার জার্মান উচ্চারণ-ভঙ্গি নকল করে গম্ভীর ভাবে বললে তাকে লিখোনিন।

"তবে, মধু, খিদমৎগারকে বলি আমার বঁধুর জন্যে কিছু ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসুক,"—জবাব দিলে ভেরা।

একটু পরেই সাইমন কফি, মদ, ফল, লজেঞ্জ, আর গ্লাস নিয়ে ঘরে এল। মদের বোতল খোলা হলো। গল্প-গুজব চলতে লাগল। কথায় কথায় নিউরা বলে ফেললে: "সাংবাদিক সেরজাই ইবানোবিচ্ আমাদের এখানকার পুরোনো অতিথি।"

"তাই না কি!"—সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে লিখোনিন।

"হ্যাঁ"—গম্ভীরভাবে স্বীকার করলেন সাংবাদিক।

—"সেরজাই হচ্ছে আমাদের ভাইয়ের মতো!"—বুঝিয়ে বললে নিউরা।

"দুর বোকা।"—তামারা ধমকে দিলে তাকে।

কিন্তু সোবাস্নিকোবও লক্ষ্য করছিল সেরজাই ইবানোবিচ্ বেশ ঘরের লোকের মতোই ব্যবহার পাচ্ছে। এ-বাড়ীতে তার বেশ খাতির আছে বলেই মনে হলো। সকলেই মন দিয়ে শুনছে তার কথা। তামারা এসে তার মদের গেলাস দিলে ভরে; মান্‌কা দিলে তাকে একটা পেয়ারা খেতে; অথচ কোনও মেয়েই তার কাছ থেকে চকোলেট কি ফল খেতে চাইছে না। হিংসুটে সোবাস্নিকোব ভাবলে সেরজাই বোধহয় ওদের দালাল; তাই অত আদর।

"সত্যি, আমি এদেরই একজন।"—সেরজাই বললেন: "জানেন না বোধহয়—একসময় চারমাস আমি রোজ এখানেই খাওয়াদাওয়া করতাম।"

—"বটে!—সত্যি?"—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো।

—"হ্যাঁ। সত্যি। এখানকার খাওয়াদাওয়া খুব খারাপ নয়।"

—"কিন্তু কেন?"

—"আমি বাড়িউলীর মেয়েকে পড়াতাম কি না তাই। আমার মাইনে থেকেই অবশ্য খাই-খরচ বাদ যেত।"

—"সে কী! যদি কিছু মনে না করেন তো বলি—আপনি কি ইচ্ছে করে এখানে খেতেন, না, অসুবিধা ছিল বলে?"

—"ইচ্ছে করেই। আমি এদেরই একজন হয়ে এদের পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ জীবনের সন্ধান নেবার চেষ্টা করছিলাম।"

—"বুঝেছি!"—প্রফেসর ইয়ারশেঙ্কো বললেন: "এদের নিয়ে লিখবেন বলে আমাদের বন্ধু এদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। শীঘ্রই বন্ধুর এ বিষয়ে লেখা বই পড়বার সৌভাগ্য হবে আমাদের।"

"গণিকালয়ের ট্র্যাজেডী!"—অভিনয়ের ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠল সোবাসনিকোব।

সাংবাদিক ইয়ারশেঙ্কোর কথার উত্তর দিচ্ছেন সেই অবসরে তামারা উঠে এসে সোবাসনিকোবের কানে কানে বললে: "শোনো, বন্ধু, ঐ সাংবাদিকের কাছে ঘেঁসো না বেশি; তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।"

—"কেন?"—দু' আঙুল দিয়ে নাকের ওপর চশমাজোড়া ঠিক করে নিয়ে মুরুব্বিয়ানার চালে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে সোবাসনিকোব,—"তোমার নাগর না কি ও? না, তোমাদের ফড়ে?"

—"ও কোন জন্মেও আমাদের কারোর সঙ্গে থাকেনি; আমায় বিশ্বাস করো। কিন্তু ঘাঁটিয়ো না ওকে।"—উত্তর দিলে তামারা।

—"বটে? ও হ্যাঁ, তা তো বটেই! আর নয়ই বা কেন!"—বিদ্রূপভরে মুখে ভেঙচি কেটে বল্লে সোবাসনিকোব, "সারা বেশ্যাপাড়াটাই দেখছি ওর হয়ে কথা কয়! ইয়ামা শুদ্ধই ওর প্রাণের বন্ধু—ওর সাঙাৎ!"

—"না, তা নয়,"—কানে কানে কথা বলার ভঙ্গিতে জবাব দিলে তামারা: "তবে এই তোমার ঘাড়ে চিমটি দিয়ে ধরে ছোট্ট কুকুর-ছানাটির মতো জানলা গলিয়ে দেবে ছুঁড়ে ফেলে—এই আর কী! আমি ওকে দেখেছি কি না আর-একবার এ রকমটি করতে। তাই বল্লুম"

"দূর হ, মুখপুড়ী! দূর—দূর!"—ঘুঁসি বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সোবাসনিকোব।

—"তবে চল্লুম, প্রাণ,"—উপেক্ষাভরে লঘু পদক্ষেপে সরে গেল তামারা।

চিৎকার শুনে সবাই ফিরে চাইল ছাত্রটির দিকে।

—"অসভ্যতা করো না হে, ফুলকুমার!"—আঙুল উঁচিয়ে ধমকে

দিলে তাকে লিখোনিন ; তারপর সাংবাদিকের দিকে চেয়ে বল্লে, "কই বলুন, সেরজাই, আপনার কথা—বেড়ে লাগছে।"

"বলছিলুম—এখানে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে আসিনি;"—বলে যেতে লাগলেন সাংবাদিক : "তবে এখানকার এই সব ব্যাপার একেবারে পর্বতপ্রমাণ, সব কিছু পিষে মারে, ভয়ঙ্কর।...অথচ নারী-মাংসের কারবার, রূপোপজীবিনীদের দাসীত্ব, গণিকাবৃত্তির সঙ্গে বড় বড় শহরের ক্ষয়রোগের তুলনা, এই সব যত চোস্ত চোস্ত বুলি, এর কোনটাই কিন্তু তেমন ভয়ানক নয়...এই রকমের আবোল-তাবোল বুকনি শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে সবার! নাঃ, এর আসল বিভীষিকা কোনখানে তা' জানেন? সে হচ্ছে এখানকার প্রতিদিনের যত সব মজ্জাগত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে—এখানকার দৈনন্দিন ব্যবসাদারীতে, লাভলোকসানের খতিয়ানে, সহস্র বৎসরের পুরাতন যুগযুগসিদ্ধ কামকলা চর্চার বিজ্ঞানে, এর এই নীরস রীতিনীতির মধ্যে। এই সব অলক্ষ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় বিরাগ, হীনতাবোধ, লজ্জা, মানবমনের এই সব যত কিছু অনুভূতি। থাকে শুধু একটা রসলেশহীন পেশা, একটা চুক্তির বোঝাপড়া, একটা মতৈক্য, মোটের 'পরে সাধু গোছেরই একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যবসা—তা', এই ধরুন না কেন মুদীর দোকানের কারবারের চেয়ে কোনও অংশে তা উৎকৃষ্টও নয়, নিকৃষ্টও নয়। বুঝতে পাচ্ছেন কি আপনারা এর অন্তর্নিহিত বিভীষিকাটুকু আসলে গিয়ে হচ্ছে কোনখানে? সে হচ্ছে ঠিক এইখানে যে বিভীষিকা বলে নেই এর মধ্যে একদম কিছুই! বুর্জোয়া সমাজে যেমন কাজের দিনের দিনপঞ্জী—ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। আর তার 'পরে রয়েছে গণ্ডিবদ্ধ বিদ্যায়তনের কৌতুককর নির্বুদ্ধিতা, তার কর্কশতা, ভাবালুতা, আর অনুকরণপ্রিয়তার অলস রোমন্থন।"

পানপাত্রের মধ্যে বিষণ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন সাংবাদিক।

"যথার্থ কথা,"—তাঁকে সমর্থন করে বললে লিখোনিন।

"সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে উদ্বিগ্ন অন্তঃকরণের কত বিলাপোক্তি পাঠ করে থাকি আমরা। নারী চিকিৎসাকারিণীরাও এ বিষয়ে কত কী করবার প্রয়াস পাচ্ছেন, তাঁদের সে প্রয়াস বেশ বিরক্তিকরও হয়ে

ওঠে সময় সময়। 'আহা, বাছা ইস্তান! আহা, বাছা, উচ্ছেদ! আহা বাছা, জীবন্ত পণ্য! দাসীত্ব! এই সব বারাঙ্গনা! মানবজাতির হীন কলঙ্ক, রক্ত শুষে খাচ্ছে এরা বেশ্যাদের!'...কিন্তু গলাবাজি করে কাউকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারবে না তুমি, কোনও ক্ষতি করতে পারবে না কারোর। আপনারা সবাই জানেন এ প্রবাদবাক্য—যত গর্জে তত বর্ষে না। সব ভয়ের কথার সেরা ভয়ের কথা—শতগুণ ভীতিপ্রদ বাক্য—হচ্ছে গিয়ে এই রকমেরই এমন কোন-একটি ছোট্ট নীরস কথা যা অকস্মাৎ ঘা মেরে চেতিয়ে তুলবে আপনাদের, মাথায় লগুড়াঘাতের মতো। এই ধরুন না কেন সাইমনের কথা, সাইমন মানে এখানকার ঐ খিদমৎগার। আপনাদের মনে হবে ওর চেয়ে নীচে নামতে পারে না আর কেউই—বেশ্যাবাড়ীর সর্দার, একটা পশু, খুব সম্ভব একটা খুনে, বেশ্যাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে, স্থানীয় ভাষায় বলতে গেলে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেয় তাদের, অর্থাৎ সোজা কথায় করে মারধোর। তবুও, আপনারা জানেন কি কিসের জন্যে তাতে আমাতে হতে পেরেছে মিল, দু'জনের মধ্যে জমে উঠেছে একটা বন্ধুভাব? ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্যে। ধার্মিক লোক ও—অসম্ভব রকমেরই ধার্মিক। আমি ওকে পরিচালনা করতুম, আর ছলছল চোখে গাইত ও:

এসো ভাইসব, দাও চুম্বন—
চির-বিশ্রাম লভিল যে জন।

যারা সাধুসন্ত নয়, সাধারণ লোক, এ হচ্ছে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার একটা অঙ্গ। না, শুধু একবার ভেবে দেখুন: কেবল এক রুশীয় অন্তরাত্মায়ই সম্ভবপর এ হেন স্ববিরোধ!"

"তা' বটে। এই রকমের লোক প্রার্থনামন্ত্রের পর প্রার্থনামন্ত্র আউড়ে যাবে, তারপর গিয়ে ছুরি বসাবে কারও গলায়, শেষে এসে হাত পা ধুয়ে আচমন করে কোন বিগ্রহের সামনে জেলে দেবে এক প্রদীপ,"—বল্লে রামেশিস।

"তাই-ই বটে। এই যে পরিপূর্ণ ভক্তিভাবের সঙ্গে অন্তর্গূঢ় অপরাধপ্রবণতার মিশ্রণ, এর চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার আমি আর কল্পনা

করতে পারিনে। মনের কথা খুলে বলব?...মনের সঙ্গে একা বসে যখন গল্প করি আমি—তা' আমাদের মধ্যে অনেক সময় নিরিবিলিতে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েও থাকে—তখন আচমকা এক-এক সময় কেমন যেন সত্যি সত্যি ভয় ভয় করে আমার। কী একটা যেন অন্ধ ভয়! যেন, এই ধরুন না কেন, ভরসাঁঝে একটা নড়বড়ে পাটাতনের 'পরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, সেটা আবার কাৎ হয়ে রয়েছে এক অন্ধকার পূতিগন্ধময় কূপের মুখের 'পরে, আর ঠিক ঠাহর হয় না, কিন্তু তার নীচে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে যত রাজ্যের সরীসৃপ। তবুও কিন্তু সাইমন হচ্ছে ঐ এক রকমের সত্যিকারেরই ভদ্রলোক; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস কালে সে গিয়ে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়বে, উপবাস আর উপাসনায় ছাড়িয়েও যাবে অনেককে, আর শুধু শয়তানই জানে কোন্ দানবীয় পদ্ধতিতে সত্যিকারের ধর্মানন্দ তার অন্তরাত্মাকে তখন ঘিরে রাখবে তার এই অধর্মবুদ্ধি, পবিত্র বস্তুর প্রতি তার এই বিদ্বেষ, তার এই হুঙ্কারজনক উন্মাদনা, তার নির্মমাচরণজনিত পরিতৃপ্তি, কি এই রকমের আর কোন দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে!"

"যাই হোক, আপনি তো আপনার এই সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাত্রকে রেহাই দেন না,"—চোখের দৃষ্টিতে সযত্নে মেয়েদের নির্দেশ করে বল্লেন ইয়ারশেঙ্কো।

"অ্যাঁ, সে কিছু নয়। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।"

শুধু শেষের কথা কয়টিই ধরতে পারলে বোলোদিয়া পাবলোব, জিজ্ঞেস করলে সে, "কিসের জন্যে?"

"এম্নিই...গল্প করবার মতো ব্যাপার কিছু নয়,"—এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে মৃদু হেসে জবাব দিলেন সাংবাদিক,—"তুচ্ছ ব্যাপার।...আপনার গেলাসটা আনাই, মিঃ ইয়ারশেঙ্কো।"

জিব-আলগা নিউরা কি তাই বলে চুপ করে থাকতে পারে? হঠাৎ মুখের রাশ খুলে দিয়ে বকবকানি শুরু করে দিলে সে:

"কিসের জন্যে আবার! সেরজাই ইবানোবিচ একবার ওর মুখে কষে দিয়েছিল এক ঘুঁসি, তারই জন্যে...মানে ঐ নিনকার জন্যে। সেবার

এসেছিল এক বুড়ো···নিন্‌কার কাছে···এসেছিল সারারাত থাকবে বলে ···আর তার মধ্যে হয়েছে কী, নিন্‌কা দেখেছে ফল···তবুও সারাক্ষণ ধরে ওকে জালিয়ে খাচ্ছে সেই বুড়ো···তাই কাঁদতে শুরু করে দিলে নিন্‌কা, ছুটে এল পালিয়ে।"

"থাক, থাক, নিউরা; ভারী বিশ্রী লাগছে সে কথা,"—ক্লান্তিভরা মুখচ্ছবিতে তাকে থামতে বল্লেন প্লাতোনোব।

"কাটান দে! (থাম)"—বেশ্যালয়ের দুর্বোধ ভাষায় কড়া সুরে হাঁক দিয়ে হুকুম করলে তাকে তামারা।

কিন্তু একবার যখন ছাড়ান পেয়েছে তখন নিউরাকে থামায় কে! বলেই চল্ল সে:

"আর নিন্‌কা বলে 'ওর সঙ্গে আমি থাকব না, থাকব না, থাকব না, কিচ্ছুতেই থাকব না, আমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও থাকব না।' ও বলে, 'লোকটা সারা অঙ্গ আমার থুথুতে ভিজিয়ে দিয়েছে।' আর এদিকে হয়েছে কী, বুড়ো এসে নালিশ করেছে খিদ্‌মদ্‌গারের কাছে, আর খিদ্‌মদ্‌গার, মাইরী, ছুটে এসেছে নিন্‌কাকে ঠেঙিয়ে সিধে করবে বলে। সেরজাই ইবানোবিচ তখন আমার হয়ে বাড়ীতে, মানে দেশে, একখানা চিঠি লিখছিল, কিন্তু যেই না শুনেছে নিন্‌কা চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছে ··"

"ওর মুখ চেপে ধর তো, জো,"—হুকুম করলেন প্লাতোনোব।

"অমনি সেরজাই লাফিয়ে উঠে একেবারে—প্‌ প্‌!"—জো এসে মুখ চেপে ধরতেই নিউরার বাক্যস্রোত আচম্‌কা গেল স্তব্ধ হয়ে।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সেই গোলমালের মধ্যে উপেক্ষার চোখে চেয়ে চাপা গলায় ফরাসী বুলি আউড়ে মন্তব্য করলে শুধু বোরিস সোবাশ্‌নিকোব:

"ওঃ, বীরপুঙ্গব আমার!"

ততক্ষণে তার মাথায় চড়ে গেছে মদের নেশা; দেয়ালে হেলান দিয়ে যেন মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, উত্তেজনায় ক্রমাগত ফুঁকে চলেছে সিগারেট।

"নিন্‌কা মেয়েটি কে ?"—কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করলেন ইয়ার-শেক্কো,—"আছে কি এখানে ?"

"না, এখানে নেই। ছোটখাটো খাঁদানাকী মেয়েটি। সাদাসিধে, ভারী অভিমানী।"—বলতে বলতে বাস্তবিকই ভারী আমোদ পেয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন সাংবাদিক। তারপর হাসতে হাসতেই বল্লেন,—"মাপ করবেন···এম্নি এম্নি হেসে ফেলেছি···একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই। বুড়োর কথা এইমাত্র ভারী স্পষ্ট করে মনে পড়ল আমার—ঠিক যেমনটি প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় কাপড়চোপড় আর জুতো-জোড়া বগলদাবা করে বারান্দা দিয়ে ভয়ে ভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল বেচারা।···এমন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি, মহাপুরুষের মতো চেহারা। কোথায় কাজ করেন তিনি তা' আমি জানি। কেন, আপনারাও সবাই তাঁকে চেনেন। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপার হয়েছিল যখন ছুটতে ছুটতে বৈঠকখানা ঘরে এসে ভাবলেন তিনি এবার নিরাপদ হয়েছেন। বুঝতে পাচ্ছেন—বসেছেন তিনি এক চেয়ারে, পরছেন তাঁর পাৎলুন, কিন্তু তখনও কিছুতেই ঠাহর পাচ্ছেন না পা ঢুকোবেন ঠিক কোথায়, অথচ এদিকে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করে তুলেছেন: 'কী ভয়ানক অন্যায় কথা! লজ্জার অবধি নেই! মজা দেখিয়ে ছাড়ব!···কালই তোমরা দেখবে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখানকার পাট গুটোতে হবে।'··· জানেন আপনারা, কৃপা উদ্রেক করার মতো এই অসহায়তার সঙ্গে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকমের চিৎকারের সংমিশ্রণ এমনই কৌতুককর হয়ে উঠেছিল যে, গোমড়ামুখো সাইমন অবধি হাসতে শুরু করে দিলে। ···যাক, এখন, সাইমনের সূত্র ধরেই দেখুন না।···আমি বলছি কী, জীবনের এই অদ্ভুত জগাখিচুড়ী গোছের ব্যাপারটা লোককে হতভম্ব করে তোলে, দেয় বিভীষিকাগ্রস্ত করে। বেশ্যার দালাল, বেশ্যার অন্নোপজীবী, এদের বিষয়ে হাজারো রকমের শ্রুতিমধুর শব্দ উচ্চারণ করে বেড়াতে পারেন আপনারা, তবুও ঠিক এমন একটি সাইমনের কথা কল্পনায়ও আনতে পারবেন না। জীবন এমনই শতধাবিচ্ছিন্ন, এমনই এক বহুরূপীর খেলা! নয়তো ধরুন না আনা মারকোবনার কথা—এখান-কার স্বত্বাধিকারিণী তিনি। এই রক্তচোষা, হায়েনা, ক্রূরস্বভাবা নারী,

যাই কিছু বলুন না তাঁকে, ইনিই হচ্ছেন আবার যার-পর-নাই স্নেহশীলা জননী। এঁর একটি কন্যা আছে—বার্থা, ইস্কুলে পঞ্চম মানের ছাত্রী সে এখন। যদি একবারটি আপনারা দেখতে পেতেন মায়ের পেশা কী মেয়ে যেন তা' ঘুনাক্ষরেও টের না পায় তার জন্যে এঁর কী অসম্ভব রকমের প্রয়াস! তা' ছাড়া সব কিছুই শুধু বার্ডির জন্যে, শুধুই বার্ডির জন্যে। নিজে তিনি মেয়ের সুমুখে কথা কইতে অবধি ভরসা পান না, ভয় হয় পাছে বৃদ্ধবেশ্যার চিরাভ্যস্ত অশ্লীল বুলি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়ে; শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন তিনি, থাকেন নত হয়ে পুরাতন দাসীর মতো, নির্বোধ স্নেহান্ধ পরিচারিকার মতো, বিশ্বস্ত বৃদ্ধ ঘেয়ো কুকুরীর মতো। বহুকাল হয়ে গেল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম উপভোগের সময় এসেছে তাঁর; তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই, যে কাজ নিয়ে আছেন তিনি তা' শ্রমসাধ্য এবং বিরক্তিজনকও বটে, তা' ছাড়া যথেষ্ট বয়সও হয়েছে তাঁর। কিন্তু তা' হতে পারে না, কিছুতেই নয়; আর একটি হাজারের প্রয়োজন, তারপর আরও একটি, আরও একটি—সবই শুধু বার্ডির জন্যে। চড়ে বেড়াবার জন্যে বার্ডিকে ঘোড়ার পর ঘোড়া কিনে দেওয়া হচ্ছে, তার জন্যে রাখা হয়েছে একজন ইংরেজ অভিভাবিকা, ফি বছর বার্ডিকে বিদেশ-ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়, বার্ডিকে কিনে দেওয়া হয়েছে হীরের গয়না, তাতে লেগেছে চল্লিশ হাজার—কে জানে সেগুলো কার, মানে এই গয়নাগুলো। আর এ শুধু আমার নিশ্চিত বিশ্বাসই নয়, আমি বেশ ভালো করেই জানি যে এই সেই বার্ডির সুখের জন্যে, না ঠিক তার সুখের জন্যেও নয়, বরং ধরুন তার কড়ে আঙুলটির নখের কোণে একটু চামড়া ছিঁড়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে—তা' যদি হয় তবে সেটুকু যন্ত্রণা দূর করবার জন্যে কী ব্যাপার হবে একবার শুধু কল্পনা করে দেখুন! আনা মারকোবনার চোখের পাতাটি পর্যন্ত ক্ষণেকের তরেও কেঁপে উঠবে না, অবহেলে মহাপাতকের মুখে ঠেলে দেবেন তিনি আমাদের ভগ্নী আর কন্যাদের, আমাদের সবার দেহে, আমাদের পুত্রদেরও দেহে, সংক্রামিত করে দেবেন গর্মীরোগ। কী? রাক্ষসী, এই তো বলতে চান? আমি কিন্তু বলব ওঁর এই সব কাজের মূলে রয়েছে ঠিক সেই একই মহৎ, যুক্তিহীন, অন্ধ,

আত্মকেন্দ্রিক অনুরাগ যার জন্যে আমাদের জননীদের আমরা বলে থাকি সাধ্বী রমণী।”

“বাঁকের পথে সামলে চলো, ভাই!”—দাঁতে দাঁত পিষে মন্তব্য করলে বোরিস সোবাশনিকোব।

“মাপ করবেন: আমি কারও সঙ্গে কারও তুলনা করছিলুম না, শুধু মানবমনের প্রবৃত্তির উৎস সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করছিলুম। মানবেতর প্রাণীদের আত্মবিসর্জনশীল মাতৃস্নেহকেও উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপিত করতে বাধা নেই আমার। যাক, একটা ভারী নীরস ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি দেখছি। আলোচনা বন্ধ করাই ভালো।”

“না, আপনার বক্তব্য শেষ করুন আপনি,”—বাধা দিয়ে বল্লে লিখোনিন,—“মনে হচ্ছে আপনার মগজের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ভাব।”

“নিতান্তই সরল ভাব, বলতে পারেন। সেদিন জনৈক অধ্যাপক আমায় জিজ্ঞেস করেন কোনরূপ সাহিত্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানকার জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে যাচ্ছি কি না। তাঁকে আমি বল্লুম আমি শুধু চোখ মেলে চেয়েই দেখতে পারি, লক্ষ্য করে দেখতে জানিনে। এই আমি আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করলুম সাইমন আর এক কুটনীকে। আমি বুঝতে পারিনে কেন, কিন্তু অনুভব করে থাকি এই ব্যাপারটা যে, এদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জীবনের কোন এক অন্তর্গূঢ়, বীভৎস, অলঙ্ঘনীয় বাস্তব সত্য; কিন্তু তা' বুঝিয়ে বলবার, কি চোখের সামনে তুলে ধরবার ক্ষমতা আমার নেই। এর জন্যে প্রয়োজন সেই শক্তির যা' সামান্য, অতি তুচ্ছ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটা ঘটনাকে এমন ভাবে চোখের সুমুখে তুলে ধরবে, এমন অবহেলে তাতে একতিল রস সঞ্চার করবে যে, তা' থেকে নিমেষে যে ভয়ঙ্কর সত্যের উদ্ভব ঘটবে তা দেখে স্তম্ভিত পাঠক হতবুদ্ধি হয়ে এ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে বসে থাকবে যে এতক্ষণ সে মুখব্যাদান করে রয়েছে। শব্দ-সম্ভারের মধ্যে, আর্তচিৎকারে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপে, লোকে খুঁজে মরে ভয়ানকরস। ভালো কথা, উদাহরণস্বরূপ ধরুন আমি পড়ছি কোন-এক

সঙ্ঘবদ্ধ হত্যালীলার বর্ণনা, কি কোন কয়েদখানার মধ্যে পাইকিরি-দরের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী, কিংবা কোন গণবিক্ষোভ দমন করার গল্প। যথেচ্ছাচারের বাহন পুলিশবাহিনী সম্বন্ধে সেখানে বস্তুতঃই পাঠ করছি যে তারা মন্থরপদে অগ্রসর হচ্ছে হাঁটু অবধি উঁচু রক্তস্রোতের উজান ঠেলে, নইলে এরূপ ক্ষেত্রে তারা লিখবেই বা কী ? বাস্তবিকই এ সব বর্ণনা মর্মপীড়াদায়ক, উত্তেজনাপ্রসূ, ঘৃণনীয়, কিন্তু এ সবই বুঝি আমরা মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে নয়। কিন্তু ধরুন লেব্যাঝিয়া স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি, পথ চলতে চলতে দেখতে পেলুম এক জায়গায় জমেছে লোকের ভিড়, ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে—মায়ের সঙ্গে পথ চলতে চলতে পেছনে পড়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটি, নয়তো এমনও হতে পারে তার মা নিজেই ইচ্ছে করে ফেলে গেছে তাকে। আর মেয়েটির সামনে উবু হয়ে বসে আছে এক পাহারাওয়ালা। প্রশ্ন করছে সে মেয়েটিকে—নাম কী, বাড়ী কোথায়, বাবার নাম কী, এই সব। ঘেমে নেয়ে উঠেছে বেচারা পাহারাওয়ালা, টুপীটা খসে পড়েছে ঘাড়ের দিকে, গুঁপো মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এমন মমতা, করুণা, আর অসহায়তার ভাব যে তা' কী বলব ! গলার আওয়াজ কী মৃদু, কী মধুর ! তারপর, বলুন দেখি কী ঘটতে পারে ? মেয়েটি তো এতক্ষণ কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙেছে ; সব্বাইকে তার ভয় ; আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারা—লোকটা, মানে সেই রোঁদে-বেরোনো পাহারাওয়ালা, তখন শক্ত কড়াপড়া হাতের দুই আঙুল, তর্জনী আর কনিষ্ঠা, মুখে পুরে দিয়ে মেয়েটিকে ভোলাবার জন্যে দুধুলী ছাগলের ডাক নকল করতে লেগে গেল ! আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করে চলল এক ছেলেভোলানো ছড়া !...আর তাই যখন আমার চোখে পড়ে এই মনভোলানো মধুর দৃশ্যটি তখন আমি ভাবি যে, আধঘণ্টা পরে সেই লোকটাই যখন থানায় গিয়ে হাজির হবে তখন হয়তো এমন একটা লোকের মুখে আর বুকে বুটশুদ্ধ পায়ের লাথি মারতে শুরু করবে যাকে সে ইতিপূর্বে কখনও চোখেও দেখেনি, যার অপরাধটা যে কী তাও সে কিছুই জানে না। এখন বুঝতে পারছেন ব্যাপারখানা ? এ সব কথা যখন ভাবি তখন যে কী রকম

একটা ছমছমে ভাব, কী একটা বিষণ্ণতা পেয়ে বসে আমায় কী বলব! করি অনুভব তখন হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে নয়। জীবনটা এই রকমেরই এক শয়তানী জগাখিচুড়ী।...কিছু কগ্ন্যাগ চলবে, লিখোনিন?"

"আচ্ছা, আমাদের মধ্যে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' ধরলে কেমন হয়?" —হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল লিখোনিন।

"মন্দ কী! তবে, হ্যাঁ, এখন এই চুমোটুমো খাওয়ার কাজটা বাদ দিয়ে। এই যে, কল্যাণ হোক তোমার, ভাই!"—বলে এক গেলাস কগ্ন্যাক উঁচু করে ধরলেন সাংবাদিক। তারপর সেটা পান করে ফের শুরু করলেন তিনি,—"নয় তো ধরো আর একটা উদাহরণ।... একখানা নামকরা ফরাসী উপন্যাসে আমি পড়েছি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তির চিন্তাধারা ও অনুভূতির বর্ণনা। মধুর বাক্যবিন্যাসের দ্বারা চমৎকার ভাষায় পরম শক্তিমত্তার সঙ্গে লেখক তা' বর্ণনা করে গেছেন। পড়ছি, পড়ছি...কিন্তু তবুও কেন যেন তা' মনে ঠিক রেখাপাত করছে না; বেদনাবোধ কি বিরক্তি কোনটিরই উদ্রেক করছে না মনের ভেতর —শুধুই করছে নীরসতার উদ্রেক। কিন্তু অল্প কয়েকদিন হলো এক খবরের কাগজে ফ্রান্সের কোথায় এক নরহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড বিধানের একটি বিবরণ পড়ছিলাম। জেলদারোগা লোকটার শেষ অঙ্গসজ্জার সময় উপস্থিত ছিল, সে দেখলে লোকটা জুতো পরলে খালি পায়ে, দেখে সে আহাম্মক তাকে মনে করিয়ে দিলে, "মোজা পরলে না?" লোকটা তার দিকে চোখ তুলে চাইলে, একটু যেন চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞেস করলে, "দরকার কী?" বুঝতে পাচ্ছ? দু'টো ছোট্ট কথা, কিন্তু যেন মাথায় লাঠি মেরে চেতনা জাগিয়ে দিলে আমার! মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল আমার কাছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্তর্নিহিত ভীষণতা, তার নির্বিকার মূঢ়তা।...নয়তো শোনো মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটা কথা।...আমার এক বন্ধু মারা যায়, পদাতিক সৈন্যদলের এক ক্যাপটেন—মাতাল, ভবঘুরে, অথচ এমন দিলদরিয়া লোক আর দুনিয়ায় মেলে না। কোন-একটা কারণবশতঃ আমরা তার নাম দিয়েছিলুম বিজলী কাপ্তান। আমি তখন সেই অঞ্চলেই ছিলুম; আমারই 'পরে পড়ল অন্তিম কুচকাওয়াজের জন্যে তাকে সাজিয়ে দেবার ভার। তার উর্দিখানা

নিয়ে আমি তার কাঁধের ফিতেগুলো পরাচ্ছি। তোমরা জানো তাতে একটা দড়ি থাকে, কাঁধের দিককার বোতামগুলোর মধ্যে দিয়ে নিয়ে সেটার মুখদু'টো একসঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। ভারী গোলমেলে কাজ। যাক, সবই তো ঠিক করলুম, কিন্তু দড়ির মুখদু'টোয় ফস্কা গেরো পরাতে পাচ্ছিনে কিছুতেই—হয় একটা মুখ বেশি ছোট হয়ে যায়, নয় গেরোটা ঢিলে হয়ে পড়ে। এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, হঠাৎ আমার মাথায় এল একেবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো এক সহজ বুদ্ধি—মুখদু'টো নিয়ে ফস্কা গেরো বাঁধবার দরকারটা কী? এম্নি গেরো দিয়ে দিলেই তো গোল চুকে যায়—কেউ তো আর সে গেরো খুলতে যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করলুম মৃত্যুকে। তার আগে পর্যন্ত ক্যাপটেনের চোখের দিকে চেয়ে দেখেছি, দেখেছি তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে; তার কপালে হাত দিয়ে দেখেছি কপাল ঠাণ্ডা হিম হয়ে এসেছে, কিন্তু যেই সেই গেরো দেবার কথা মনে পড়ল অম্নি সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে দিয়ে যেন শাণিত তীর চলে গেল, অঙ্গের পরতে পরতে অনুভব করলুম আমাদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, অনুভূতি, সব কিছুরই, এই সমগ্র দৃশ্যমান জগতের, অমোঘ, অনিবার্য বিলুপ্তি; সে অনুভূতি যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আমায়।...এই রকমের শত শত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা বিবৃত করতে পারি আমি।...আমি চাইছি আমার চিন্তাধারাকে বিশেষ একটা লক্ষ্যে উত্তীর্ণ করে দিতে। আমাদের চারপাশে এই যে সব তুচ্ছ ব্যাপার ছড়িয়ে পড়ে আছে, অন্ধের মতো, যেন দেখতে পাইনি বলে, সে সব অগ্রাহ্য করে চলি আমরা। কিন্তু আসবেন শিল্পী, সযত্নে লক্ষ্য করবেন এই সব খুঁটিনাটি, খুঁটে তুলবেন মাটি থেকে; তারপর অকস্মাৎ জীবনের এইরূপ একটি কণাকে সূর্যের আলোয় এনে এমন ভাবে সবার চোখের সামনে তুলে ধরবেন যে, আমরা প্রত্যেকে চিৎকার করে উঠব: "হা ভগবান! এ যে আমি নিজেরই চোখে দেখেছি। শুধু মনোযোগ দিয়ে নিরীখ করে দেখবার কথাটা মাথায় ঢোকেনি আমার।" কিন্তু আমাদের এই রুশীয় সাহিত্যিকেরা—সারা জগতের মধ্যে সব চেয়ে দরদী আর সব চেয়ে বিবেকী রূপশিল্পী এঁরা—কেন কী জানি এ

পর্যন্ত গণিকাবৃত্তি ও গণিকালয়কে এড়িয়েই চলে এসেছেন। কেন? বাস্তবিকই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন আমার পক্ষে। হয়তো-রুচি-বিগর্হিত বলে, কিংবা সাহসের অভাবে—ভয় পান পাছে অশ্লীল রচনার লেখক বলে বদনামের ভাগী হতে হয়; শেষ অবধি হয়তো ভড়কে যান এই ভেবে যে, ইতর লোকে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠবে, সাহিত্যস্রষ্টার জীবনের গুপ্ততথ্যের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগে যাবে তারা। কিংবা হয়তো তাঁরা সময়ও করে উঠতে পারেন না,—জীবনের পঙ্কিল স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সোজাসুজি তার উৎসমুখে এসে মধুর বাক্যজাল, ভীরু দয়া, সব কিছু পরিহার করে, এর যাবতীয় রাক্ষসী সরলতায় প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের পটভূমিতে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে একে বিচার করে দেখবার মতো আত্মত্যাগের স্পৃহা এবং চরিত্রবল সঞ্চয় করে উঠতে অপারগ তাঁরা। ওঃ, তা' যদি সম্ভবপর হতো তবে কী প্রচণ্ড, কী শক্তিমান, কী সত্যময় একখানি মহাগ্রন্থই না উদ্ভব লাভ করতে পারত!"

"কিন্তু তাঁরা তো লিখে থাকেন!"—যেন অনিচ্ছাভরেই মন্তব্য করলে রামেশিস।

"লেখেন বটে,"—ক্লান্তকণ্ঠে রামেশিসের মতোই অনিচ্ছাভরে উত্তর দিলেন প্লাতোনোব: "কিন্তু সে সব লেখা হয় মিথ্যেয় ভরা, নয়, ছেলে-ভোলানো কি মন মাতানোর জন্যে বেশ রঙীন করে নাটকীয় ভঙ্গীতে লেখা, নয়তো সে সব হচ্ছে ভাবীকালের ঋষিদের কাছে বোধগম্য সুচতুর রূপক মাত্র। বাস্তবের ধারকাছ দিয়েও যায়নি সে সব লেখা। শুধু একজন বড় লেখক—স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছিল তাঁর হৃদয়, চরিত্রাঙ্কনে ছিল অদ্ভুত প্রতিভা—তিনি একবার এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।* কিন্তু বাইরের লোকের চোখে যা যা পড়তে পারে শুধু সেই সব জিনিসই প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর মনোমুকুরে। শুধু খিদমদগারের কুকুরের গায়ের লোমের মতো রুক্ষ মাথার চুলের দিকে চেয়ে মন্তব্য করেন তিনি: 'কিন্তু এরও তো মা ছিল।' তাঁর সুতীক্ষ্ণ

* সম্ভবতঃ শেকোবের কথা উল্লেখ করেছেন এখানে কুপরিন।

জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে বেশ্যাদের মুখের পানে চেয়েই চলে গেছেন তিনি ; যে বিষয়ে জানতেন না কিছু সে বিষয়ে লিখতেও ভরসা পাননি তিনি। তা' ছাড়া এ-ও লক্ষ্য করবার মতো বিষয় যে এই সাধু সত্যসন্ধ লেখক একাধিক বার চাষার প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি অন্তরে অন্তরে এ কথা বেশ উপলব্ধি করতেন যে এ সব লোকের কথাবার্তার ভঙ্গি, তাদের মনের গড়ন, তাদের অন্তরাত্মা, এ সবই তাঁর কাছে হচ্ছে অন্ধকার, অবোধ্য।...তাঁর বিস্ময়কর কলাচাতুর্য নিয়ে বিনম্রচিত্তে লোকের অন্তরমন্দির প্রদক্ষিণ করে বেড়াতেন তিনি, কিন্তু তাঁর সে সব অভিজ্ঞতার অপরূপ সঞ্চয় বাইরে প্রক্ষেপ করেছেন তিনি শহরবাসীদের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে। এ কথার অবতারণা করেছি আমি ইচ্ছে করেই। আপনারা জানেন আমাদের লেখকেরা গল্প রচনা করেন গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে, আইনজীবীদের বিষয়ে, রাজস্ববিভাগের পরিদর্শকদের নিয়ে ; শিক্ষক, অ্যাটর্নী, পুলিশ, সামরিক কর্মচারী, এঁদের সকলের বিষয়ে ; কামাতুরা ভদ্রমহিলাদের উপলক্ষ্য করে; ইঞ্জিনীয়ার, সঙ্গীতজ্ঞ এই সব লোকদের সম্বন্ধে—আর বাস্তবিকই ভগবানের নামে শপথ কেটেই বলা যায় যে লেখেন তাঁরা বেশ ভালোই, তাঁদের লেখায় মুন্সীয়ানা আছে, কলাকৌশলের অভাব নেই, প্রতিভারও স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায়। তবুও, এই সব লোকের জীবন নিয়ে লেখবার আছে কী? এরা সব হচ্ছে জীবনের আবর্জনা, তাদের জীবন জীবনই নয়, তা' হচ্ছে জগতের সংস্কৃতি-ভাণ্ডারের এক রকমের কাল্পনিক, প্রেতসদৃশ, অনর্থক প্রলাপ মাত্র। জগতে রয়েছে আপন বৈশিষ্ট্যে স্থিতিশীল দু'টি মাত্র অনুপম বাস্তব—ঠিক এই মানবজাতির মতোই সুপ্রাচীন : এই বেশ্যা আর ঐ চাষা। অথচ এদের বিষয়ে জানিনে আমরা কিছুই—শুধু এক সাহিত্যের খানিকটা রাঙতামোড়া, উগ্রস্বাদ, বিকৃতাঙ্গ চিত্রাঙ্কন ছাড়া। তোমাদের জিজ্ঞেস করছি আমি : গণিকাবৃত্তির এই নিদারুণ দুঃস্বপ্ন থেকে কতটুকু কী উদ্ধার করে আনা হয়েছে রুশীয় সাহিত্যে ?—শুধু এক ঐ সোনেচ্‌কা মারমেলাদোবা।* চাষার বিষয়ে তা' আপনাদের

*দোস্তইয়েবস্কী-রচিত 'অপরাধ ও শাস্তি' নামক বিখ্যাত উপন্যাসের নায়িকা।

কী দিয়েছে এক এই খানিকটা জঘন্য, মিথ্যা, জাতীয়তাভাবে প্রণোদিত পল্লীগাথা ছাড়া? একটি মাত্র, শুধুই ঐ একটি, কিন্তু তবে সত্যি কথা বলতে গেলে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেটি—এক মর্মবিদারক ট্র্যাজেডী, তার সত্যভাষণ শ্বাসপ্রশ্বাসকে রোধ করে দেয়, রোমাঞ্চ জাগায় সর্বদেহে। বুঝতে পাচ্ছেন বোধহয় কিসের কথা বলছি আমি···।"

" 'নখের ডগা বিঁধল এসে—' " *—আস্তে আস্তে আবৃত্তি করে লিখোনিন।

"হ্যাঁ, যা' বলেছ।"—লিখোনিনের দিকে সকৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে বলেন সাংবাদিক।

"কিন্তু সোনেচ্‌কার কথা—কেন, সে তো একটা অবাস্তব টাইপ মাত্র,"—নিশ্চিত বিশ্বাসে মন্তব্য করলেন ইয়ারশেঙ্কো,—"মনস্তত্ত্বের মারপ্যাঁচ দেখাবার কৌশল বলা যেতে পারে।"

"একশো বার শুনেছি একথা, একশো বার! তবুও কথাটা মিথ্যা। তার স্থূল, অশ্লীল পেশাদারির অন্তরালে, তার এই লোকের মা তুলে জঘন্যতম গালিগালাজের অন্তরালে—তার সে মাতাল অবস্থার, সেই অতিকুৎসিত বহিরঙ্গের অন্তরালে—আজও বেঁচে আছে সোনেচ্‌কা মারমেলাদোবা! রুশীয় গণিকার ভাগ্য; ওঃ, কী ভীষণ, মর্মন্তুদ, রক্তকলঙ্কিত, কিম্ভূতকিমাকার, আর পদে পদে নির্বুদ্ধিতায় ভরা সে পথ! সব কিছুই সেখানে যেন এসে ঠেকেছে এক বিপরীতকাণ্ডে: রুশীয় ভগবান, রুশীয় ঔদার্য ও ঔদাসীন্য, জীবনের পথে কারও পদস্খলন ঘটলে সে বিষয়ে রুশীয় হতাশা, রুশীয়দের মধ্যে সংস্কৃতির অভাব, রুশীয় সরলতা, রুশীয় ধৈর্য, রুশীয় নির্লজ্জতা। কেন, যাদেরই তোমরা শয়নকক্ষে নিয়ে যাও তাদের সবাই,—তাদের পানে চেয়ে দেখো, দেখো নিরীখ করে—তাদের সবাই হচ্ছে শিশু; প্রত্যেকেরই বয়স যেন মাত্র এগারো বছর। ভাগ্য তাদের ঠেলে দিয়েছে বেশ্যাবৃত্তির মধ্যে, আর সেই থেকে তাদের

* 'নখের ডগা বিঁধল এসে পাখী পরাণ হারায় শেষে'—রুশিয়ার পল্লী অঞ্চলের একটি প্রবাদ। টলস্টয় তাঁর 'নারকীয় শক্তি' নামক বইখানার পরিচয়-পত্রে প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন।

যাপন করে আসতে হচ্ছে এক ধরণের এক অদ্ভুত, পরীদের মতো, খেলার পুতুলের মতো, এক অবাস্তব অস্তিত্ব; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারছে না তারা, ঘটছে না জীবনের পথে তাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, থেকে যাচ্ছে সবাই অবোধ, নির্ভরশীল, খামখেয়ালী; জানে না তারা কী বলবে বা করবে এই আধ ঘণ্টা পরে—সব কিছু মিলিয়ে একেবারে শিশুর মতন। এই সরল অথচ কিম্ভুতকিমাকার শিশুভাব দেখেছি আমি একেবারে পতনের নিম্নতম স্তরে ডুবে গেছে যারা সেই মাজা-ভাঙা ঠিকে গাড়ীর ঘেয়ো ঘোড়ার মতো কঙ্কালসার বৃদ্ধ-বেশ্যাদের মধ্যে পর্যন্ত। তবুও তাদের মধ্যে কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না এই অক্ষম কৃপাবৃত্তি, মানুষের দুঃখদৈন্য মোচনের জন্যে এই ব্যর্থ কাতরতা।...উদাহরণস্বরূপ..."

বলতে বলতে ধীরে ধীরে শ্রোতাদের সকলের মুখের 'পরে চোখ বুলিয়ে নিলেন প্লাতোনোব; তারপর হঠাৎ হতাশার ভঙ্গিতে হাত দুলিয়ে ক্লান্ত স্বরে বল্লেন:

"যাক গে...মরুক গে যাক! ঢের হয়েছে—যেন দশ বছরের কথা বলে ফেলেছি একদিনে আজ।...কিন্তু সবই বৃথা।"

"কিন্তু, বাস্তবিক, সেরজাই ইবানিচ, এ সব নিজে কেন বর্ণনা করার চেষ্টা কর না?"—জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো; "তোমার মনোযোগ তো এ সমস্যার উপর খুব দৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ হয়েছে।"

"চেষ্টা করেছিলাম,"—হেসে বললেন প্লাতোনোব: "কিন্তু হলো না। লিখতে গিয়ে দেখি, যত রাজ্যের 'কেন,' 'কে,' 'কোথায়' এসে পড়ে কলমের মুখে। এই সব গরম গরম কথা, কাগজে দেখি নরম হয়ে গেছে। তেরেখোবকে জানো নিশ্চয়ই—সে একবার এখানে এসেছিল। সেই যে বেশ নামজাদা—তাকে আমি এদের বিষয়ে অনেক কিছুই বলেছিলাম—যা তোমরা বিরক্ত হবে বলে এখানেও বলিনি। তাকে বললাম—আমার এই সব কথা নিয়ে তুমি কিছু লেখো। সব কথা শুনে শেষে বললে সে: 'প্লাতোনোব, রাগ করো না। পরের কথা নিয়ে বই লেখা যায় না। তুমি যা বললে তা' নিয়ে লেখা উচিত আমি বুঝছি;

কিন্তু কী করব, লেখার মতো লিখতে হলে শুনে লিখলে তো হবে না; তাদের সঙ্গে মিশে, তাদেরই একজন হয়ে তাদের মর্মকথা বুঝতে হবে। তারপর যে প্রেরণা আসবে তা থেকেই সৃষ্টি হবে প্রকৃত রচনা।...তেরেখোবের কথা শুনে মনটা আমার দমে গেল বটে, কিন্তু আশাও হলো এই ভেবে যে, আজ না হোক, পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো একজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব হবে—হয়তো এই রুশিয়াতেই—যিনি এদের জীবনের ধারা এমন সুন্দর, সরল, সহজ করে লিখে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন যে আমরা বিস্ময়ে চমকে বলে উঠব: 'সত্যিই তো—কী ভীষণ! কী ভয়ানক এই গণিকাবৃত্তি!'...আসবে সেদিন।"

"তাই যেন হয়!"—বললে লিখোনিন: "এসো, সেই অনাগত লেখকের সম্মানে পান করা যাক।"

হঠাৎ বলে উঠল ছোট মান্‌কা: "কিন্তু কেউ যদি আমাদের বিষয়ে সত্যি কথা লেখে, ভারী বিশ্রী হবে সে। আমরা যে কত বড়ো পাপী—"

কে যেন এসে দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা খুলে যেতেই ঘরে এসে ঢুকল জেনী—কমলা রঙের ঝকঝকে পোষাক পরণে তার।

—এগারো—

ঘরে ঢুকে সবাইকে সস্মিত ভাবে অভিবাদন করলে জেনী। পরে এসে বসল সেরজাই ইবানোবিচের পেছনের একটা চেয়ারে। এতক্ষণ ছিল সে সেই জার্মান শিক্ষকের সঙ্গে,—মানে, মান্‌কাকে নিয়ে খুশী হতে না পারায়, যোসিয়া তো দিলে পাশাকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে। যথাকালে সে পর্বও চুকল। কিন্তু ভদ্রলোকের প্রাণে বিঁধে ছিল জেনীর তেজ, তার আত্মাভিমান, তার সৌন্দর্য। তাই ঘণ্টাতিনেক ধরে এ-রেস্তরাঁ ও-মদের দোকান—এই রকম ঘুর ঘুর করে সাহস সঞ্চয় করে শেষটায় এলেন তিনি তাঁর মানসীর জন্যে। এসে দেখলেন জেনীর ঘরের দরজা বন্ধ। তার 'বাঁধা-বাবু' চশমাওয়ালা

কার্ল ভার্লোভিচ্ এসে গেছে তাঁর আগে। কী আর করবেন—অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। তারপর যখন ঘর খালি হলো, তখন তিনি এসে ঢুকলেন। আর এই একটু আগেই চলে গেলেন তিনি।

জেনীর দিকে চেয়ে দেখলেন প্লাতোনোব। দেখলেন তার সুন্দর মুখখানি, দীপ্তিময় চোখদু'টি; গরবিনী নারী রয়েছে ঠোঁট চেপে; আভিজাত্য যেন সারা অঙ্গে মাখা তার। বড়ো সুন্দর লাগছিল প্লাতোনোবের। লক্ষ্য করে দেখলেন তিনি এক লিখোনিন ছাড়া আর সব ছাত্রই তাকে দেখছে—কেউ আড়চোখে, কেউ বা বেহায়ার মতো, চোখে তাদের কৌতূহল ও কামনার ছায়া।

—"কী ভাবছ, জেনী?"—জিজ্ঞেস করলেন প্লাতোনোব।

—"কিছু নয়। আমাদের মেয়েলী ব্যাপার। তেমন কিছুই নয়।"

বলেই সে তাদের পাঁচমিশেলী গোপন ভাষায় কী যেন বললে তামারার কানে কানে।

তামারা বললে, "সেরজাইকে ভোলাতে পারবে না। ভারী চালাক ও।"

বুঝতে পেরেছেন প্লাতোনোব। জেনী বলছিল: আজ না কি পাশ্কাকে দশবার দশজন লোককে ঘরে বসাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে নাকি অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু পরে জ্ঞান হতেই আবার না কি এম্মা তাকে এনে বৈঠকখানায় বসিয়েছে—নতুন খদ্দেরের জন্যে। জেনী না কি বলেছিল—ওকে ছেড়ে দাও, আমিই না হয় ওর হয়ে লোক বসাব। তাতে এমমা আপত্তি করে বলেছে, এ রকম করলে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে।

—"কী হয়েছে?"—জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারশেঙ্কো।

—"কিছু না। আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার।···তোমার মদ একটু খাব, সেরজাই?"

নিজের হাতেই আধ গেলাস আন্দাজ ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে সবটা শেষ করে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে জেনী। কিছু না বলে প্লাতোনোব ততক্ষণে উঠে একেবারে দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হয়েছেন।

—"দরকার নেই, সেরজাই ; ছাড়ান দাও,"—বলে তাকে থামাতে গেল জেনী।

—"না, তা হয় না,"—আপত্তি করলেন সাংবাদিক: "এক কাজ করি বরং—পাশাকে নিয়ে আসি এখানে, আর ঐ রাক্ষসীদের পাওনা মিটিয়ে দিই। পাশা ততক্ষণ এখানে শুয়ে একটু বিশ্রাম করুক বরঞ্চ...। নিউরা, চট করে একটা বালিশ নিয়ে এসো তো!"

প্লাতোনোব বাইরে যেতে-না-যেতেই বলে উঠল বোরিস সোবাসনিকোব: "এ সব হচ্ছে কী? কোথায় আমরা এলাম একটু স্ফূর্তি করতে, আর ঐ লোকটা চায় যত ঝঞ্ঝাট বাধাতে! কে না কে! লিখোনিনের যত সব—"

—"লিখোনিন নয়, আমিই ওকে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছি,"—বললে রামেশিস: "আমি জানি ও যা-তা লোক নয়।"

—"কী তবে? পরের মাথায় হাত বোলাতে ওস্তাদ পরের খরচে মদ খাচ্ছে। ওদের দালাল নিশ্চয়। লোক ধরে আনলে দালালী পায়।"

—"ও সব কী বকছো বোকার মতো?"—ধমক দিয়ে বললেন ইয়ারশেঙ্কো।

জেনী এতক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ছেলেটির দিকে ; হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে উঠল: "বাহবা, বাহবা হে ছোকরা! সেরজাই আসুক, সব বলে দেব।"

—"নিজেই সব বলব। ভয় করি নাকি?"—উত্তর দিল সোবাসনিকোব।

—"অত ওস্তাদি করিস নে, বোরিস্; এখানে আমরা সবাই সমান।" —বললে লিখোনিন।

এমন সময় নিউরা এলো বালিশ নিয়ে। "আবার বালিশ-টালিশ কেন?"—চেঁচিয়ে উঠল সোবাসনিকোব: "একি বোর্ডিং হাউস পেলে নাকি?"

—"থাক না কেন, প্রাণ!"—ভারী মিঠে গলায় বলে উঠল জেনী:

"তোমার তাতে কী ?" তারপর বালিশখানা তামারার পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, "দাঁড়াও, প্রাণ, আমি বরঞ্চ তোমার কাছে গিয়ে বসি একটু।"

বলেই টেবিলের পাশ কাটিয়ে সিধে চলে এল জেনী বোরিস-এর কাছে, জোর করে তাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েই ধপ করে বসে পড়ল তার কোলের 'পরে ; তারপর তার গলা জড়িয়ে ধরে নিজের ঠোঁটদু'খানা এমন জোরে তার মুখের 'পরে চেপে ধরে পড়ে রইল যে, সে বেচারার তো এদিকে দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড় ! সোজাসুজি নিজের চোখের 'পরে বোরিস দেখতে পেলে একটি মেয়ের একজোড়া কালো চোখ, অদ্ভুত রকমে ডাগর ডাগর হয়ে উঠে জ্বল জ্বল করছে—তারপরই ঝাপসা, স্থির ! নিমেষের জন্যে মনে হলো তার সে চাহনিতে রয়েছে প্রেতের মতো কী-এক তীব্র উন্মত্ত বিদ্বেষ মাখানো ; সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল সে অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায়। কোনোমতে নিজেকে জেনীর পেলব বাহুলতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, মুখে হাসি টেনে এনে বলে উঠল সে, "ও জেন্কা, তুমি সুন্দরী, মায়াবিনী, ভয়ঙ্করী !"

পাশাকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলেন প্লাতোনোব। মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার, আধো-নিমীলিত চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ক্ষীণ অবোধ হাসির রেশ, ঠোঁটদু'খানা পড়েছে ঝুলে ! হাঁটছে যেন কেমন করে—এক পা বড়ো বড়ো করে ফেলে আর এক পা ছোট ছোট করে টেনে টেনে। "তামারা, একে এক টুকরো চকোলেট আর একটু মদ দাও তো,"—বল্লেন প্লাতোনোব।

উঠে দাঁড়াল বোরিস সোবাসনিকোব। মাথা উঁচু করে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে : "ওহে, কী যেন তোমার নাম ? ও মেয়েটা কি তোমার রক্ষিতা ?" পা দিয়ে দেখিয়ে দিলে পাশাকে।

—"কী বল্লে ?"

—"ঐ হলো। ও তোমার রক্ষিতা নয় যদি, তবে তুমি বোধহয় ওর নাগর। ঐ একই কথা।"

—"শুনুন !"—গম্ভীর হয়ে বললেন্ সেরজাই : "আপনি কেবলই আমার সঙ্গে অযথা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছেন। বেশি মদ খেয়ে

এভাবে মাতলামি করলে ফল অশুভ জানবেন। আপনার বন্ধুদের খাতিরে কিছু বললাম না এবার। কিন্তু ফের যদি আপনি এ ধরণের কথা বলেন তবে তার আগে আপনার চশমা খুলে রাখবেন।"

—"চশমা! কিসের চশমা? কেন খুলব?"

—"আপনাকে ঘা-কতক দিতে হবে কি না তাই। তাতে চশমার কাচ চোখে ঢুকে গেলে ফল খারাপ হতে পারে।"

—"বেশ, এই আমি চললাম। এ রকম লোকের সঙ্গে থাকা আমি লজ্জাকর মনে করি।"—রাগে গরগর করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বোরিস। তার ইচ্ছে করছিল যাবার সময় দেয় সেরজাইয়ের নাকে এক ঘুঁসি বসিয়ে। কিন্তু সেরজাইয়ের বলিষ্ঠ হাত, মোটা কব্জী, আর চওড়া কপাল দেখে তার একটু ভয় হলো। নাঃ, দরকার নেই। নিজের মান নিজের হাতে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে সে।

"নোঙরা আপদ বিদেয় হ'ল, ভালোয় ভালোয় বাঁচা গেল,"—তার দিকে চেয়ে ঠাট্টা করে বলে উঠল জেনী; তারপর তামারার দিকে চেয়ে বললে: "কৈ গো, তামারা রাণী, একটুখানি মদ দাও—খাই।"

পেত্রোবস্কি নামে ছাত্রটি ভাবলে বোরিসের পক্ষ নেওয়া উচিত। তাই সে লাফিয়ে উঠে বললে: "তোমাদের কী মত জানি নে, তবে আমাদের কমরেড, হতে পারে সে ভুল করেছে, কিন্তু যখন অপমান করা হলো তাকে তখন এখানে আমার অন্ততঃ থাকা উচিত মনে করি নে।"

—"হায়রে!"—বললে লিখোনিন: "বুঝিনে বাবা! অভদ্র ব্যবহার করলে বরিস। তবু তার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে?"

—"বেশ তো, তুমি থাক না! তবে আমি চলে যাচ্ছি।"—চলে গেল পেত্রোবস্কি।

—"হ্যাঁ, যাও! মাথায় তোমার বাজ পড়ুক!"—জেনী তার যাত্রা কামনা করলে।

সোবাসনিকোব ঘরের বাইরে এসে ভাবলো: ভালোই হলো। জেনীকে আলাদা ডেকে এনে বেশ আমোদ করা যাবে'খন।

পেত্রোবস্কি ভাবলে : যাক, বোরিসের পক্ষ নিয়েছি যখন, তখন কি আর গোটা তিনেক রুবল তার কাছ থেকে ধার পাব না?

বৈঠকখানায় এসে দু'জনে কী যেন পরামর্শ করল। একটু পরেই যোসিয়া ছাত্রদের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে বললে : "জেনী আর নিউরা, একটু শুনে যেয়ো ইদিকে। বিশেষ দরকার।"

লজ্জা পেয়ে গেলেন সেরজাই, বললেন : "মাপ করবেন আপনারা, আমিই বরং চলে যাই। আমার জন্যেই আপনাদের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে? আর হ্যাঁ, পাশার দরুণ ওদের যা প্রাপ্য তা আমি সাইমনকে দিয়ে এসেছি।"

—"না না। সে কী!"—লিখোনিন বললে : "বোরিস আর বাস্কা অবুঝ নয়। তবে বয়েস কম কি না, তাই একটু রগ-চটা! দাঁড়ান, আমি ডেকে আনছি।"

কিন্তু বাইরে গিয়ে একটু বাদেই ফিরে এসে বললে লিখোনিন : "নাঃ, হলো না। দুই বাবুই এখন বিশ্রাম করছেন।"

—বারো—

এমন সময় ছাত্রদের ঘরে এসে ঢুকল সাইমন। হাতে তার একখানা ট্রে। ট্রেতে একখানা ভিজিটিং কার্ড। হাঁক দিয়ে বললে সে : "এখানে আপনাদের মধ্যে কার নাম গাবরিলা পেত্রোবিচ্ ইয়ারশেঙ্কো— জানতে পারি কি?"

—"আমার নাম", ইয়ারশেঙ্কো বললেন।

—"একজন অভিনেতা ভদ্রলোক এই কার্ডখানা আপনাকে দিতে বলেছেন।"

কার্ড হাতে নিয়ে ইয়ারশেঙ্কো জোরে জোরেই পড়লেন : 'গুমেনি পলুয়েকটোভিচ্, এগমণ্ট-লাব্রেৎস্কি, অভিনেতা, মেট্রোপলিটান থিয়েটার'।

তারপর বললেন : "এঁকে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।" পরে কার্ডের পেছনের লেখা নজরে পড়ল : "ও, পেছনেও কী যেন লেখা আছে। হাতের লেখা তো তেমন ভালো নয়—বোধহয় মদ খেয়ে লেখা ; বানানও ভুল। দেখি পড়ে : 'আমি পান করিতেছি—রুশীয় বিজ্ঞানের জ্যোতিষ্ক গাব্রিলা পেত্রোবিচ্ ইয়ারশেঙ্কোর কল্যাণকামনায় পান করিতেছি। তাঁহাকে বারান্দা দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। একবার সাক্ষাৎ চাই। মনে আছে কি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে 'দারিদ্র্য লজ্জার নয়' নাটকে আমি আফ্রিকাবাসীর চরিত্রে অভিনয় করিয়াছিলাম ?"

—"ঠিক বটে। মনে পড়েছে এবার। গোঁফদাড়ি কামানো বেশ মাতব্বর গোছের লোকটি।"

—"নিয়ে এসো না এখানে !"—লিখোনিন বললে। "কী, আনব ?" —প্রোফেসর জিজ্ঞেস করলেন সাংবাদিককে।

—"আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি বরং ওকে চিনি। এসেই বলবে : কেলনার শ্যাম্পেন।...তারপর তার সুন্দরী বৌয়ের গল্প বলতে বলতে কাঁদতে সুরু করে দেবে। তারপর দেশভক্তি নিয়ে এক বক্তৃতা। শেষে রেস্তরাঁর বিল শোধবার সময় গণ্ডগোল। ও একাই একশো।"

মুটকী কিটীর কাঁধের 'পর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললে বোলোদিয়া : "তাকে আনা হোক !" কিটী তার কোলে বসে পা দোলাচ্ছিল।

—"আর তুমি ভেণ্টমান কী বল ?"

—"কী ? কী বলবো ?"—ছাত্রটি হঠাৎ যেন খেই পেল না কথার : "ও অভিনেতা ! হ্যাঁ, তা আসুক—আসুক না ?"

মানে ছাত্রটি এতক্ষণ মগ্ন ছিল পাশাকে নিয়ে। পাশার ঘাড়ে, মাথায়, কপালে, চুলে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে। আর পাশা আধোনিমীলিত নয়নে তখনও তার সেই অবোধ লালসালুব্ধ হাসি হাসছিল শুয়ে শুয়ে।

ইয়ারশেঙ্কো সাইমনকে দিয়ে অভিনেতাকে ডাকিয়ে আনালেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অভিনেতা মশায় নাটকীয় ভঙ্গীতে টুপী খুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন : "হে ভদ্রমহোদয়গণ ! আমি কি আপনাদের এই গোপন সঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি ?"

"আসুন, আসুন!"

তারপর সুরু হলো 'হাত-ঝাঁকুনি'র পালা। ভদ্রলোক নিজেই যেচে আলাপ করতে লাগলেন সকলের সঙ্গে। দেখতে বেশ চালাক-চতুর; বয়সও তেমন বেশি নয়। তবে মুখখানাতে রয়েছে ঘাগী লম্পট আর মদো-মাতালদের মতো একটা নীচতা, কর্কশতা, আর কাঠিন্যের ছাপ। তাঁর পেছনে পেছনেই ঢুকলেন এসে দু'দুজন কলাবতী—হেনরিয়েটা আর বড়ো মান্‌কা—ভদ্রলোকটির প্রণয়িনীদের দু'জন মাত্র। হেনরিয়েটা হলো এখানকার—এই আনা মারকোবনার গণিকালয়ের—সব চেয়ে বড়ো মেয়ে; অনেক কিছুই দেখা আছে তার, জানেশোনেও সে ঢের। গলার আওয়াজ তার বেশ মোটা, তবে দেখতে তখনও বেশ সুন্দরী রয়েছে সে। গত রাত থেকে হেনরিয়েটা ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, কারণ তিনি ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক হোটেলে।

অভিনেতা মশায় বেশ আমিরী চালে ইয়ারশেস্কোর পাশটিতে এসে বসলেন। হুকুম হলো: 'কে-ল-নার শ্যাম্প-এন!' বলেই সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের 'পরে সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে মিশ্‌কা আর নিকি কেমন করে এসে জুটল ঘরের মধ্যে, আর জোর কদমে জুড়ে দিল গান:

সাঁচ্চা কথা সবাই জানে
আয় ছুটে আয় আমার পানে···সই রে!

হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল ঘরের মধ্যে। রলি পলির ঘুম গেল ছুটে, সে-ও ছুটে এল।

সবাইকে দেখে লিখোনিন তো ভারী খুশী! কিন্তু প্রোফেসর ইয়ারশেস্কো—যতক্ষণ অবধি না মদের নেশা তাঁর মাথায় চড়ে বসেছে ততক্ষণ—এ সব দেখে শুনে চোখদু'টো কপালে তুলে ভয়ে ভয়ে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগলেন শুধু চারদিকে। গোলমাল দেখে সশব্দে জানলাগুলোর শিক এঁটে দিলে সাইমন। লোক বসাবার ফাঁকে ফাঁকে, কি নাচের অবসরে, অন্য সব মেয়েরাও এক-একবার এসে

ঢুঁ মেরে যেতে লাগল এখানে। বৈঠকখানা ঘরে বসতে আর মন সরছিল না তাদের ; তাই মাঝে মাঝে এসে যার-তার কোলে চড়ে, সিগ্রেট ফুঁকে, আবোল-তাবোল সুর ভেঁজে, মদের গেলাসে এক-আধ চুমুক মেরে, দু'চারটে চুমকুড়ি দিয়ে, ফের চলে যেতে লাগল তারা, আবার একটু বাদেই হয়তো বা আসতে লাগল ফিরে। মেয়েরা বৈঠকখানার লোকদের চেয়ে এদের 'পরেই বেশি করে মনোযোগ দিচ্ছে বলে কেরেশকোবস্কীর কেরানীর দল একটু গণ্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সাইমনের দু'চারটে কড়া কড়া মন্তব্য কানে এসে পড়তেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন তাঁরা।

নিউরাও এল। পেছনে পেছনে এল পেত্রোবস্কি; এসে বললে, এতক্ষণ পথে পথে ঘুরছিল সে, কিন্তু ভেবে দেখল সত্যিই যখন সোবাসনিকোব দোষ করেছে তখন তার সঙ্গে যোগ দেওয়াটা ঠিক হবে না।... একটু পরেই এল জেনী—একা। সোবাসনিকোব তখন তার ঘরে ঘুমে অচেতন।

অভিনেতা মশায়ের গুণের অন্ত নেই।...একজন মাতাল কাচের জানলার ধারে একটা ভনভনে মাছি ধরতে গেলে সব শুদ্ধ জড়িয়ে যেমন শব্দ হয় তা নকল করে দেখালেন তিনি। ভীতু মেয়েমানুষ টেলিফোনে কেমন করে কথা কয়—শোনালেন। গ্রামোফোন রেকর্ডের অনুকরণে গানও গাইলেন। পারশ্য-দেশের ছেলেরা কেমন করে বাঁদর নাচায় আর বাঁদরগুলো কেমন করে দাঁত খিঁচোয় তাও দেখালেন। নাকী-নাকী সুরে গানও হলো :

> কসাক ছোঁড়া গেছে চলে লড়্‌ই করবে বলে,
> ছুঁড়ীটা তার পা ছুঁড়ছে শুয়ে বেড়ার কোলে।
> তাইরে না না নাইরে তা না তা না না না না না।

তারপর এক সময় ছোট-মানকাকে তাঁর লম্বা জামা দিয়ে জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে ভবঘুরে ছেলের অভিনয় করে দেখালেন তিনি :

—'কে তুই ?'—কিটী জিজ্ঞেস করলে। এ তামাসাটা ভারী পছন্দ ছিল তার।

'—মুই সার্বিয়া স্থাশের মনিষ্যি, মা-ঠাকরোণ !'

—'তোর ঐ বাঁদরটার নাম কী রে ?'

—'মাত্রেচকা, মা-ঠাকরোণ।...উয়ার ভুখ নাগছে, মা-ঠাকরোণ! কিছু খাতি দ্যান উয়ারে...'

—'বটে! ছাড়পত্র আছে ?'

—'এঁজ্ঞে, মোরা সার্বিয়ার মনিষ্যি...ভিখ মাঙি, মা-ঠাকরোণ...'

আর তারই মাঝে মাঝে থেকে থেকে আমিরী চালে হাঁক দিয়ে উঠছেন তিনি—'কেল-নার শ্যাম্প-এন!' অবশ্য সাইমন কর্ণপাতও করছে না তাতে।

পুরোদস্তুর একটি রুশীয় হুল্লোড় পড়ে গেছে—গোলমেলে কাণ্ড, অর্থহীন ব্যাপার! তোলপাইগীন সেই যে বাজনা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলেইছে তো চলেছে রলি পলি কামারিন্স্কি চাষাদের নাচ, আর মাঝে মাঝে দুই বন্ধুতে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে—'সাঁ-চ্চা ক-থা সবা-ই জা-নে...সই রে!'

তারপর পেড়ে বসলেন তিনি যত সব অশ্লীল গল্প। গল্প শুনে উপস্থিত ছাত্র আর মেয়েরা তো হেসেই অস্থির। হৈ-চৈ হাসি-তামাসায় আসর বেশ সরগরম, তারই এক ফাঁকে ভেণ্টম্যান সুড়ুৎ করে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে। একটু পরে পাশাও তার শান্ত অবোধ লাজুক হাসি হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তারপর একে একে অন্য ছাত্ররাও এক-একটা অজুহাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো,—গেল না শুধু লিখোনিন। 'একটু নাচ দেখে আসি,'—বলে বোলোদিয়া পাবলোব বেরিয়ে পড়ল। তোলপাইগিনের হঠাৎ মাথা ধরে উঠলো; তাই তামারাকে বললে: 'একটা নিরিবিলি ঘর দেখিয়ে দাও তো—একটু শোবো।' পেত্রোবস্কি এবার এক ফাঁকে লিখোনিনের কাছ থেকে তিনটি রুবল ধার করেছিল; তাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে খবরগিরনী যোসিয়াকে বললে সে ছোট-মান্‌কাকে তার কাছে ডেকে দিতে। এমন কি, রামেশিস পর্যন্ত শেষটায় নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না; বললে: 'বাইরে যাই, একটু ঘুমুই।' কিন্তু বাইরে যাবার আগে জেনীকে চোখের ইসারা করে গেল সে। ইঙ্গিতটা বুঝলো জেনী, চোখের পাতা বুজিয়ে সম্মতিও জানালো। সবই লক্ষ্য

করছিলেন প্লাতোনোব; জেনীর চোখের পাতা উঠলে পর দেখতে পেলেন সে-চোখে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ছাপ। মিনিট পাঁচেক বাদেই জেনী উঠে পড়লো: 'আমি আসছি এখুনি।' বলেই স্কার্ট দুলিয়ে বাইরে চলে গেল সে।

"এবার লিখোনিনের পালা"—বলে উঠলেন সাংবাদিক।

"না, ভাই, ভুল করলে!"—জবাব দিলে লিখোনিন: "অবশ্য কোনো রকমের ধর্মবুদ্ধি কি ন্যায়নীতির খাতিরে এ থেকে বিরত থাকছি নে আমি; বরং একজন অ্যানার্কিস্ট হিসাবে আমি বলি কী গতিক যতই মন্দ হয়ে উঠবে ততই হবে সেটা শুভ লক্ষণ। তবে, ভাগ্য ভালো যে আমি হচ্ছি গিয়ে একটি জুয়াড়ী, খেলার নেশায়ই মশগুল। তাই এ অপার্থিব বাসনার চেয়ে সাদাসিধে কেতাদুরস্ত ভাবই হলো প্রবল আমার মধ্যে। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমিও যে ঠিক ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তোমায়!"

—"আমি? নাঃ! যদি কখনও বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ি তবে ইসাইয়া সাবিচের কাছ থেকে তার ছোট কামরাখানার চাবিটা চেয়ে নিয়ে সেখানে গিয়ে পাটাতনের 'পরে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দি। এখানকার মেয়েরা জানে আমি পুরুষও নই, প্রকৃতিও নই—একেবারে নির্গুণ পরব্রহ্ম।"

—"সত্যি নাকি? কখনও—?"

—"নাঃ, কখনও নয়।"

—"সত্যিই"—বলে উঠল নিউরা: "সেরজাই আমাদের সাধু মহাপুরুষ!"

—"প্রায় বছর পাঁচেক আগে,"—আরম্ভ করলেন সেরজাই—"আমার এই অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ভারী বিশ্রী আর বিরক্তিকর সে—বুঝলে? এই যে অভিনেত্ম ভদ্রলোকটি মাছিমারার খেলা দেখালেন অনেকটা প্রায় সেই রকম! জানলার ঝিলমিলে সেগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আটকা পড়বে, তারপর অবাক হয়ে বোকার মতো পেছনের ঠ্যাং দু'টো তুলে পিঠ চুলকে যে-যার মতো আলাদা আলাদা হয়ে উড়ে পালাবে। আর এখানে এসে প্রেম প্রেম খেলা?...আরে, ওদের মনের মতো পাত্রই নই আমি। দেখতেও তো আমি সুশ্রী নই, তা'

ছাড়া মেয়েদের সামনে আমি কেমন যেন হয়ে পড়ি লজ্জায়, সঙ্কোচে, সৌজন্যে। আর এখানে ওরা হাসলে মরছে বর্বর উন্মাদনা, হিংস্র ঈর্ষ্যা, অশ্রুধার, বিষদান, প্রহার, প্রাণপাত—এক কথায়, উন্মত্ত ভাবালুতার জন্যে। আর তার কারণ কী তা-ও সহজেই বুঝতে পারা যায়। নারী-হৃদয় চায় নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, অথচ এখানে প্রতিদিন প্রেম-কাহিনী শুনছে এরা তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো ভাষায়। নিজেরই অজ্ঞাতসারে সবাই প্রেমের মধ্যে চায় ঝাঁঝ; তাই কারোরই আর শুধু স্নেহমমতার কথায় মন ওঠে না, চায় তারা সাংঘাতিক রকমের মদমত্ত কাজ। আর তাই চোরডাকাত, খুনে, বেশ্যাসক্ত বেশ্যার অন্নে প্রতিপালিত ঢ্যামনারাই সবক্ষেত্রে হয়ে থাকে এদের প্রণয়ী।"

"আর সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে এই যে,"—একটু দম নিয়ে বললেন প্লাতোনোব: "প্রণয়ী হবার চেষ্টা করতে গেলে এদের সঙ্গে এই এতদিনের বন্ধুত্ব হারাতে হবে আমায়।"

—"ঠাট্টা করছো তুমি!"—অবিশ্বাসের সুরে বললে লিখোনিন: "নইলে এখানে দিনরাত পড়ে থাক কেন? যদি একজন লেখক হতে, বুঝতাম তথ্য সংগ্রহ করতে এখানে আস; যেমন ঐ জার্মান প্রোফেসর বানরের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্যে তিন-তিনটি বছর কাটিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে। কিন্তু লেখার কারবার তো কর না তুমি।"

—"তা' যে করিনে তা' ঠিক নয়; তবে কী করে লিখতে হবে বুঝে উঠতে পারিনে।"

—"ধর্মপ্রচারকও তো নও তুমি। তা'লে না হয় বুঝতাম—এদের এখানে এসে এদের মনে ধর্মজ্ঞান জাগাবার চেষ্টা করছ।"

—"না, তা নই।"

—"তবে কেন ছাই এখানে পড়ে থাক? অথচ এসব নোঙরামি, মারামারি তো তোমার ভালো লাগে না দেখছি। কে কোন্ মেয়েকে ধরে ঠেঙালে, আর অমনি তোমার প্রাণ উঠল কেঁদে!"

তখনই কোনও জবাব দিলেন না সাংবাদিক:

—"দেখো,"—থেমে থেমে প্রত্যেকটি কথার দিকে এই যেন প্রথম নজর রেখে আর তা ওজন করতে করতে বলে যেতে লাগলেন তিনি:

"দেখো, এদের এই জীবন আমাকে কেন যেন আকর্ষণ করে থাকে, কৌতূহল জাগায় আমার প্রাণে এদের এই···কী বলব···এর নিষ্ঠুর নগ্ন সত্যের জন্যে। বুঝতে পারছ, এ হচ্ছে গিয়ে যেন সকল রকম সংস্কারের বাঁধন ছেঁড়া। এতে নেই কোনও মিথ্যা, নেই কোনও কপটতা, নেই ন্যায়-নীতির লোক-দেখানো ভণ্ডামি, কোনও রকমেরই আপোষ নেই এতে —না, জনমতের সঙ্গেও নয়, আমাদের পিতৃপুরুষদের উদ্ধত বিধিনিষেধের সঙ্গেও নয়, নিজ নিজ বিবেকের সঙ্গেও নয়। কোনও রকমেরই ভ্রান্তির অবকাশ নেই এখানে, নেই কোনও মোহ। রয়েছে শুধু একটি মেয়ে —'আমি'—বলছে যেন সে—'আমি হচ্ছি এক বারবণিতা, বহু-ব্যবহার্য জলপাত্র, নগরীর সঞ্চিত কাম-লালসার নির্গম-পথ। আয়, কে আসবি তোরা, আয় আমার কাছে; আমি তোকে বঞ্চিত করব না, ঐ তো আমার কাজ। কিন্তু সে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে তোকে তোর ঐ অর্থ, ঘৃণা, রোগ, আর হীনতাবোধ দিয়ে।' আর কিছু নয়। মানব-জীবনের এমন কোনও অধ্যায় নেই যেখানে তার মূলতত্ত্ব এমন প্রচণ্ড, বিকট, উলঙ্গ স্পষ্টতায়, কোনও রকমেরই মানবিক দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষার প্রলেপে আবৃত না হয়ে, একেবারে স্পষ্টাক্ষরে জলজ্বল করছে।"

—"ওহো, তা' কী জানি! তবে এই সব মেয়েদের তো দেখি একেবারে শয়তানের মতো মিছে কথা বলতে। একবার যদি জিজ্ঞেস কর কাউকে এ-পথে সে এল কী করে, এমন ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে সুরু করবে!"

—"বটে! জিজ্ঞেস না করলেই হয় তবে। তোমার তাতে কী? আর যদিই বা এরা মিছে কথা বলে, দেখবে একদম ছেলেমানুষের মতো মিছে কথা বলে এরা। আর জানই তো শিশুরাই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো কিন্তু সবচেয়ে মনকাড়া মিথ্যুক, আর তারই সঙ্গে হলো গিয়ে তারা সব চেয়ে অকপট লোক এ সংসারে। মজার ব্যাপার এই যে, এদের দু'দলই—এই গণিকা আর শিশুরা—মিছে কথা কয় শুধু আমাদেরই কাছে—পুরুষমানুষ আর বয়স্ক লোকদের সামনে। নিজেদের মধ্যে তারা মিছে কথা কয় না—উদ্দীপনায় মুখর হয়ে বানিয়ে বলে শুধু। কিন্তু আমাদের কাছে মিছে কথা বলে তারা, কারণ আমরা নিজেরাই তাই

দাবি করি তাদের কাছ থেকে, আমরা আমাদের বিমূঢ় কৌশল আর অহেতুক কৌতূহল নিয়ে তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে ঢুঁ মেরে প্রবেশ করতে যাই—কিন্তু তাদের মন হচ্ছে একেবারে আলাদা ছাঁচে তৈরি, আর মনে মনে তারা জানে আমাদের নিরেট মূর্খ আর ভণ্ডতপস্বী বলে। যদি চাও তো আমি আঙুলে গুণে বলে দিতে পারি একজন বেশ্যা ঠিক কী কী নিয়ে মিছে কথা বলে থাকে, আর তা হলেই বুঝতে পারবে তুমি যে পুরুষরাই তাকে মিছে কথা বলতে প্রবৃত্ত করে থাকে।”

—“বেশ, বেশ, দেখাই যাক না!”

—“প্রথমতঃ নিজেকে সে ক্যাটক্যাটে করে রঙচঙ মেখে সাজায়, এমন কি নিজের শরীরের ক্ষতি করেও। কেন? কারণ বসন্ত-সমাগমে মিলিটারী ইস্কুলের কোন্-এক ছোকরা, মুখময় ব্রণ ভর্তি তাঁর, উঠলেন তিনি ক্ষেপে বনমোরগের মতো; নয়তো কোন্ সরকারী আপিসের এক পুঁচকে কেরানী, ঘরে তাঁর পোয়াতি বৌ আর গুটি নয়েক কাচ্চাবাচ্চা, —বেশ, এলেন এঁরা দু'জনেই, কিন্তু বিচক্ষণের মতো সিধেসিধি নিজ নিজ বাড়তি লালসাটুকু লাঘব করে চলে যাওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এঁদের। লোকটা, এদিকে তো হচ্ছে গিয়ে একদম অপদার্থ, এসেছে কিন্তু রসের সন্ধানে; চান তিনি রূপ—বুঝেছ, আরে তিনি যে হলেন মস্ত বড় এক সৌন্দর্যের পূজারী! আর এই সব মেয়েরা, এই সরল অনাড়ম্বর উদার মহারুশের কন্যারা—তারা এই সব রসিক নাগরদের নিয়ে কী করবে তখন? 'মিঠে হ'লেই স্বাদু আর রাঙা হলেই সুরূপ।' ব্যস, তবেই হলো, রূপ যদি চাও তো নাও এই এন্টিমনি, সাদা সীসের গুঁড়ো, আর রুজ!

“এই হলো গিয়ে পয়লা নম্বর। তারপর সে রসের নাগরের শুধু রূপ হলেই চলবে না,—না, চাই তাঁর প্রেমের আদল, অতএব তাঁর আদরে মেয়েটিকে দিতে হবে সাড়া; অঙ্গভঙ্গী করে, গদগদ স্বরে কথা বলে, ঘনঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে, পুরুষটিকে বুঝিয়ে দিতে হবে: আহা, তুমি কী রসের নাগর! তোমায় পেয়ে ধন্য আমি! অথচ মনে মনে সে-ও জানে যে এ সব হচ্ছে নিছক ছলাকলা; তবুও নিজে থেকেই সে চায় ঠকতে আর নিজেকে বোঝাতে আমি কী হনু রে! মেয়েরা

আমায় কত ভালোবাসে। কিন্তু প্রশ্ন হলো : কে প্রবৃত্ত করলে মেয়েটিকে মিথ্যাচার করতে ?

"তারপর তৃতীয় কথা হচ্ছে : তুমি কেন তার গত-জীবনের কথা জানতে চাইবে ? সে চায় জানতে তোমার সেই স্বর্গীয় প্রথম প্রণয়-কথা ? সে চায় জানতে তোমার ঘরের কথা, তোমার মা-বোনেদের কথা, তোমার বৌয়ের কথা ?……তুমি যে জন্যে টাকা খরচ করছ তাই আদায় করে নাও হিসেব করে মেয়েটির কাছ থেকে ; তার গত-জীবনের ইতিকথায় দরকারটা তোমার কী ? কুটনী, দালাল, পুলিশ, বস্তি, গবর্ণমেণ্ট, সবাই মিলে তোমার স্বার্থরক্ষা করছে ; গ্যারাণ্টি রয়েছে তোমার—যাকে তুমি ভাড়া করলে তার কাছ থেকে প্রেম আদায়ের, সৌজন্য আর সদ্ব্যবহার পাবার, আর রোগের ভয় থেকেও মুক্ত তুমি……যদিও তোমার অনর্থক গায়ে-পড়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তরে তোমার পাওয়া উচিত ঠাস করে গালে একটি চড়। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তুমি চাও সত্য—বটে ? বেশ, বলবে তারা তোমায় এমন এক কেতাদুরস্ত গল্প বানিয়ে যা— নিজেও তুমি কেতাদুরস্ত আর ইতর বলে—অনায়াসে পারবে হজম করতে। নয়তো শুধু শুধু জীবনটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কাছে ভারী একঘেয়ে আর নীরস, নয়তো এমনই এক অসম্ভব কাণ্ড যার পার নেই। তাই সেই একই কাহিনী ঘুরে ফিরে শুনতে পাবে তুমি—সেই মান্ধাতার আমলের মিলিটারী অফিসারের কাণ্ড, নয় কোন দোকানের মুহুরীর কেচ্ছা, নয় তো পেট হওয়ার কথা, দূর পাড়াগাঁয়ে বুড়ো-হাবড়া বাপের হারানো মেয়েকে ফিরে পাবার জন্যে কাতরানি—এই সব।……তাই বলে তোমায় এ সব বলছিনে, তোমার মধ্যে আন্তরিকতা আছে, মহত্ত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে…এসো, তোমার কল্যাণে এক চুমুক মদ খাওয়া যাক—কী বল ?"

মদ খাওয়া হলো।

—"আরও বলব ? বিরক্ত হচ্ছ না তো ?"—প্লাতোনোব জিজ্ঞেস করলেন।

—"না, না, বলো, বলো !"

—"তা ছাড়া এরা মিছে কথা বলে, আর বলেও খুব সরলবিশ্বাসে,

তাদের কাছে যারা নিজ নিজ রাজনৈতিক মতামতে দীক্ষিত করতে চায় এদের।”—বলে যেতে লাগলেন প্লাতোনোব: “ওদের কোনও নিজস্ব মতামত নেই। তুমি যদি গিয়ে ওদের বল: জমিদার-মহাজনদের বংশ নির্বংশ না করলে দেশের উন্নতি হবে না—ওরা সায় দেবে: ঠিক বলেছ। আবার কেউ যদি এসে বলে: রগচটা ছাত্রদের যদি ফাঁসীতে লটকানো না হয় তবে ওরা দেশটাকে দিন-দিন উচ্ছন্নে দেবে।—অমনি ওরা সায় দেবে: বটেই তো!…তারপর ওরা এতই সরল যে, যদি ওদের কেউ একজন একবার তোমায় ভালবেসে ফেল্লে, তবে আর দেখতে হবে না! তুমি তাকে জাহান্নমে নিয়ে যাও—আপত্তি করবে না। বুঝলে, লিখোনিন?

“হয়তো মেয়েটির চোদ্দ বছর বয়সে কেউ তাকে নষ্ট করলে; ষোল বছর বয়সে, দেখবে, রীতিমতো পেশাদার দেহ-বিলাসিনী হয়ে উঠেছে সে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছে একখানা হলদে টিকিট আর রতিজ রোগ। সংসারের গণ্ডির বাইরে বিরাট এক অচলায়তনের মধ্যে তখন তার ঠাঁই। মন দিয়ে শুনো ওদের কথা—দেখতে পাবে মোটে গোটা চল্লিশেক কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না ওরা—ঠিক একেবারে শিশুর মতো, কি বর্বরদের মতো! পানাহার, নিদ্রা, নানান জাতের পুরুষ, বিছানা, পোষাক, বাড়িউলী, রুবল, প্রণয়ী, ডাক্তার, হাঁসপাতাল, পুলিশ—এই শুধু! মানসিক উন্নতি বলতে কিছুই নেই। মন রইলো কাঁচা, দেহ হলো অকালপক্ক।……তার দেহের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে! প্রতি সপ্তাহে ডাক্তারী পরীক্ষা; বোরিক জল! প্রতি রাত্রে যত পুরুষই আসুক, সঙ্গসুখ দিতে হবে তাদের।……আর এদের মধ্যে পাবে তুমি, একেবারে প্রত্যেকেরই মধ্যে, সমস্ত পুরুষজাতির প্রতি মর্মান্তিক বিদ্বেষ, আর তারই শূন্যতা পূরণ করে এরা নিজেদের মধ্যে অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনচর্চা করে, আর সে ব্যাপারে মোটেই কোনও রকমের ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই এদের এখানে। এদের এই সঙ্গতিহীন জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসই রয়েছে আমার নখদর্পণে—এর অন্তর্নিহিত আত্মাশূন্য মনোভাব, এর নিদারুণ স্থূল অবিচার; কিন্তু এদের মধ্যে পাবে না তুমি নিজের বা অপরের প্রতি সে মিথ্যাচার, সে কপটতা, যা উঁচুনীচু

সকলকেই রেখেছে আচ্ছন্ন করে আমাদের এই মানবসমাজে। একবার ভেবে দেখো, লিখোনিন, কী রকমের গায়ে-পড়া, টানাহেঁচড়া, বিরক্তিকর প্রবঞ্চনা, কতখানি বিরাগ, লুকিয়ে রয়েছে শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে বৈবাহিক সহবাসের মধ্যে। কী অন্ধ, নির্মম নির্দয়তা—ঠিক পাশবিক নয় বটে, তবে মানবিক, সুচিন্তিত, দূরদর্শী, একেবারে মাপজোক করা নিষ্ঠুরতা—রয়েছে পবিত্র মাতৃত্বের সহজাত প্রেরণার মধ্যে, আর দেখো কী কোমল বর্ণরাগেই না সুশোভিত করে তোলা হয়েছে সে সহজাত প্রেরণাকে!

"সত্যি, লিখোনিন, আমি বুঝিনে কেন মানুষ এই গণিকাবৃত্তির প্রশ্রয় দিলে,—নিজের ঘর-সংসারকে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে পবিত্র রাখতে? কিন্তু নিজেরা? নিজেরা তো সেই ঘৃণ্য কলুষিত কামনার দ্বারে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ঠিক কাঙালই বটে! সত্যি, এ-সব দেখেশুনে এখন ঐ-সব বড়ো বড়ো গালভরা কথা, যেমন—কর্তব্য, প্রতিবেশী, আত্মোন্নতি, পবিত্র প্রেম, এ সবই যেন হাস্যাস্পদ মনে হয়।

"মানুষ জন্মেছে উদার আনন্দলাভের জন্যে, নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির প্রেরণায়—তাই তো সে হলো বিশ্ববিধাতা; উদার উন্মুক্ত তার প্রেম, তাতে নেই কোনও বাধা, নেই বিচার—ঐ যে একটি গাছ, ঐ যে নীলাকাশ, এই যে মানুষ, এই যে কুকুর, এই যে মধুর স্নেহময়ী ধরণী—আহা, বিশেষ করে এই ধরণী আর তার অপার্থিব মাতৃত্ব, তার প্রভাত, তার রাত্রি, প্রতিদিনের পরমাশ্চর্য বিভূতি! কিন্তু মানুষ কী মিথ্যাবাদী, কী কাঙালই না হয়ে পড়েছে, কত নীচে নেমে গেছে সে!"

—"অ্যানার্কিস্ট হিসাবে তোমার কথা বুঝছি বোধহয় কিছু কিছু"; লিখোনিন বললে: "কিন্তু এর প্রতিকারের চেষ্টা কর না কেন?"

প্লাতোনোব বললেন: "প্রতিকার! প্রতিকার কী করব? আমি বলে নিজেকেই নিজে চিনলাম না আজ পর্যন্ত! দেখছ, আমি একটি ভবঘুরে; ভালোবাসি কেবল জীবনকে। এককালে কারখানায় কাজ করেছি আমি, তামাকের জমিও চাষ করেছি, আজব সাগরে পাড়ি দিয়েছি। ইট বয়েছি, সার্কাস দলে খেলা দেখিয়েছি আমি, আবার অভিনয়ও করেছি। আরও কত কী যে করেছি সব মনেও নেই। অবশ্য পয়সার জন্যে

এসব করিনি; করেছি জীবনটাকে দেখব বলে—করেছি কুতূহলী হয়ে।······হেসো না, এক-এক সময় আমার কী মনে হয় জানো? যদি ঘোড়া, কি গাছ, কি মাছ হয়ে জন্মাতাম তো জানতে পারতাম তাদের জীবনটা কেমন! কিংবা মেয়েমানুষ হতাম যদি, তা'হলে ছেলে হতে গিয়ে কেমন লাগে জানা যেত।······দেখবার, জানবার, ভারী সখ আমার। তাই তো আমি শহরে শহরে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াই অকারণে। আর ঘুরতে ঘুরতে আজ আবার এসে পৌঁচেছি এই গণিকালয়ে। কিন্তু এই গণিকাচরিত্র আমি যতই দেখি ততই ভয়ে, ক্রোধে, বোধশক্তি হারিয়ে কেমন যেন হয়ে যাই।······এখানকার পালাও শেষ করব শীগগীর। যাব এবার এক রেল-লাইন তৈরি করবার কারখানায়। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে—সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে।—ঐ হ্যাখো, লিখোনিন, অভিনেতা মশায়, ফের শুরু করেছেন—।"

সত্যিই, এবার তিনি কুকুর-বেড়ালের ঝগড়া নকল করতে আরম্ভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে যেন ঝিমিয়ে আসছিলেন তিনি; পর পর একটি একটি করে যেন অন্তরাত্মার গ্রন্থি খসে পড়ছিল তাঁর। শেষে ছলছল চোখে বলতে লাগলেন তিনি: "আমি এসেছি এখানে, তাই আমাকে আপনারা ঘৃণা করতে পারেন বটে! কিন্তু আমার বৌ আছে—সতীসাধ্বী। সে যদি জানে আমি এখানে এসেছি—আহা, যদি সে জানতে পারে! সত্যি আমি কী পাষণ্ড, চরিত্রহীন, পাজী, বদমায়েস··· প্রোফেসর ইয়ারশেঙ্কো, আপনি চলুন আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে। দেখবেন কেমন দেবীর মতো স্ত্রী আমার! আমার জন্যে রাত জেগে বসে রয়েছে সে; খোকাখুকুদের হাতে হাত মিলিয়ে করযোড়ে বলছে: হে ঠাকুর, বাবাকে বাঁচিয়ে রাখো, ভালো রাখো।"

—"হ্যাঁ, হ্যাখো গে যাও, দিব্যি আরামে শুয়ে আছে সে তোমারই বিছানায় পরপুরুষের সঙ্গে,"—চেঁচিয়ে উঠলো ফর্সা ছোট মানকা; মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছিল সে তখন।

—"তবে রে খানকী!"—বলেই মদের বোতল তুলে নিয়ে মাথার 'পরে দোলাতে লাগলেন ভদ্রলোক: "দেখি কার সাধ্যি ঠেকাক সে

এসে আমাকে! নইলে দেব মাগীর মাথা ফাটিয়ে। ফের যদি মুখ খারাপ করবি তো—”

—“তুই চুপ কর্, ড্যাকরা মিন্‌সে।”—মুখ খুল্‌লো মানকা: “নিজে এসেছেন মাগীবাড়ি ফুর্তি মারতে আর বৌ নষ্টামি করলেই যত দোষ? না! অত চোখ রাঙাস নি—কে তোকে ভয় করে রে বিটকেল মিনসে?”

ইয়ারশেঙ্কো বহুকষ্টে দু’জনের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। অভিনেতা মশায় অভিমানে অপমানে কেঁদে ফেললেন। হেনরিয়েটা তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল সবাই। বুঝি শেষ হয়ে এল ছাত্রদের অভিসার-রাত্রি। এবার বিদায়ের পালা।

—“তুমি কোথায় যাবে এখন?”—সাংবাদিককে জিজ্ঞেস করলে লিখোনিন।

—“কী করে বলি! দেখি না হয় ইসাইয়ার ঘরেই গিয়ে শোব। না, তার চেয়ে বরং স্নান সেরে স্টীমারে করে ঘুরে আসি লিপ্‌স্কি মঠ থেকে। কিন্তু কেন বলো তো?”

—“সবাই চলে গেলে তোমাকে দু’একটা দরকারী কথা বলতাম।” লিখোনিন বললে।

একে একে সবাই বিদায় নিতে লাগল। সবার শেষে গেলেন প্রোফেসর ইয়ারশেঙ্কো। খানিক বাদে প্লাতোনোব উঠে গিয়ে লিখোনিনকে জানলার ধারে টেনে এনে বল্লে—“ঐ দেখো!”

দেখা গেল প্রোফেসর ইয়ারশেঙ্কো গিয়ে ত্রেপেল-এর দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। একটু পরে দরজা খুলে যেতেই তিনি ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

“কী করে বুঝলে?”—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে লিখোনিন।

—“সে কিছুই নয়! লক্ষ্য করছিলাম প্রোফেসর ভেরকার বডিসে হাত বুলোচ্ছে। আর সবাই সংযমের বাঁধ ভেঙে ফেলেছিল, উনিই শুধু লজ্জায় তা’ পারেন নি!”

—“যাক গে, চলো যাই। তোমায় আর বেশিক্ষণ আটকাব না”,—লিখোনিন বললে।

—তেরো—

মেয়েদের মধ্যে ঘরে এখন শুধু জেনী আর লিউব্কা। জেনীর গায়ে রাতের ব্লাউজ। লিউব্কা সেই কথাবার্তার মধ্যেই একটা আরাম-চেয়ারে শুয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল—মুখখানায় তার কচি মেয়ের মতো শান্ত শ্রী, ঠোঁটদু'টিতে মৃদু হাসির ছোঁয়াচ। জেনী চোখ নীচু করে হাঁটুদুটো জড়িয়ে ধরে বেঞ্চির 'পরে বসে ছিল। প্লাতোনোব দেখতে পেলেন ধিকিধিকি জ্বলছে সে-চোখে কিসের যেন জ্বালা। ধোঁয়ায় আর মদের গন্ধে ঘর ভরপুর।

—"মোমবাতিটা নিবিয়ে দিই?"—বলেই লিখোনিন গিয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল মোমবাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়লো ভোরের ফ্যাকাশে আলো। লিখোনিন বললে: "কথাটা সামান্যই, কিন্তু আরম্ভ করি কী করে?" বলে চোখ তুলে শূন্যদৃষ্টিতে চাইল সে জেনীর দিকে।

—"উঠে যাবো?"—জিজ্ঞেস করলে জেনী।

—"না।"—উত্তর দিলেন সেরজাই: "কথাটা বোধহয় গণিকাবৃত্তি নিয়ে? তাই না লিখোনিন?"

—"হ্যাঁ,...সেই রকমই বটে।"

—"জেনী থাকুক তা'হলে। ওর মতামতের দাম আছে।"—সাংবাদিক বললেন।

মুখখানা দু'হাত দিয়ে ভালো করে রগড়ে নিলে লিখোনিন; তারপর দু'হাত জড়িয়ে বারদুই আঙুল মটকালে। শেষে হঠাৎ বলে উঠল: "এই সব মেয়ের বিষয়ে তুমি যা বললে, সেরজাই, তা' এমন নতুন কিছু নয়। অথচ তা আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে এদের সমস্যাকে আমার কাছে নতুন করে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করি: শেষ পর্যন্ত গণিকাবৃত্তিটা কী? নাগরিক জীবনের এক প্রচণ্ড প্রলাপ, না, চিরন্তন

ঐতিহাসিক সত্য ? এর কি শেষ আছে, না, পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে এ-ও থাকবে ততদিন ? কে আমায় দেবে এর উত্তর ?"

মন দিয়ে শুনছিলেন প্লাতোনোব। বললেন : "এই ব্যবসার কবে যে শেষ হবে কেউ তা' বলতে পারে না। তবে মনে হয় যেদিন এই পৃথিবী সাম্যবাদী কি নৈরাষ্ট্রবাদীদের আদর্শে চলবে, যেদিন এই পৃথিবী হবে আমাদের সকলের—কারোর একলার নয়, যখন প্রেমকে দিতে শিখবে সবাই সম্মান, মানুষ হবে সুখী, তোমায় আমায় থাকবে না কোন ভেদ, সেই শুভদিনে এ জগতে নেবে আসবে স্বর্গীয় আনন্দ ; মানুষ আবার হবে নিষ্পাপ—নগ্ন আদম-ইভের মতো। হয়তো তখন—"

—"তা হলে কি বলতে চাও সেই শুভদিনের প্রতিক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে ? মেনে নিতে হবে, এ বৃত্তি মানব-সমাজের এক অপরিহার্য অঙ্গ ?"

—"ঠিক অপরিহার্য নয়, তবে দুস্তর বটে। কিন্তু তুমি তো বিপ্লবী —তোমার এতে কী এসে যায় ?"

—"সত্যি, আমার কী এসে যায় ! তাই তো ভাবি মাঝে মাঝে— এ ভালোই হচ্ছে। হোক মানুষে মানুষে মারামারি। ছিঁড়ুক এ-ওর গায়ের চামড়া। চলুক অত্যাচার শিশুর 'পরে, নারীর 'পরে। চলুক গোলামী ; চলুক নারী-মাংসের কারবার। ভালোই হবে। যতই অবনতি হবে ততই ভালো ; কারণ ততই এ-সবের শেষ হবে তাড়াতাড়ি। তাই নয় কি ? পাপের তো একটা শেষ আছে ! যেমন ফোঁড়া ক্রমে বড় হয়, পাকে, শেষে একদিন যায় ফেটে—তেমনি। নিদারুণ যন্ত্রণায় এ পাপ যাবে ফেটে ; বেরুবে পুঁজ ; ভেসে যাবে বিশ্বসংসার ! তারপর ? —তারপর শান্তি ! নতুন করে জীবন আবার গড়ে উঠবে—সুন্দর, সবল, সরল, সত্য !"

এক বাটি কালো ঠাণ্ডা কফি খেয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলো লিখোনিন : "কিন্তু হায়, ভাবি তো তাই। শুধু আমি নই— আমার মতো অনেকেই ঘরে বসে চা-রুটি খেতে খেতে আরাম করে মানুষের দুঃখের কথা বেশ হিসেব করেই ভাবেন, আর মানুষের নির্মম অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন সবাই।

কিন্তু যখন দেখা যায়, একটি ছোটছেলের 'পরে অত্যাচার চলেছে তখন শিরার রক্ত কি গরম হয়ে ওঠে না? তখন কি মানুষের ঐ অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকা যায়? এই যে—কেন যেন আজ আমার মনে হচ্ছে এই গণিকাবৃত্তির জন্যে আমিই দায়ী। কেন আমি উদাসীন থেকেছি এতদিন? কেন আমি এই ঘৃণিত ব্যবসা বন্ধ করবার চেষ্টা করিনি?……সত্যি, প্লাতোনোব, আমি কী করি বলো তো?"—বিষাদে চুপ করলো ছাত্রটি।

"কেন! সেই রকম করো না,"—কঠিন শ্লেষের স্বরে বলে উঠলো জেনী: "একজন ইংরেজ মহিলা এসে যেমন করেছিলেন? একদিন বারকেশ দারোগা এসে বললে: একজন তোদের দেখতে আসবে। খবরদার, কারও মুখ দিয়ে যেন কোন রকম কুচ্ছিৎ কি বাজে কথা না বেরয়। যদি শুনতে পাই, চাবকে ঠাণ্ডা করে দেব।…এলেন মহিলাটি; বিদেশী ভাষায় কী সব বললেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে। বুঝলাম অে ঘোড়ার ডিম! শেষে যাবার সময় আমাদের সবাইকে দিয়ে গেলেন এক-একখানা করে পাঁচ কোপেক দামের বাইবেল!……তুমিও সেই রকম করো না কেন, প্রাণ?"

হো হো করে হেসে উঠলেন প্লাতোনোব। কিন্তু দেখতে পেলেন তিনি বিষাদে ভরে উঠেছে লিখোনিনের মুখখানি; জেনীর ঠাট্টাও বুঝতে পারেনি সে! প্লাতোনোব তখন গম্ভীর হয়ে বললেন: "তুমি কী করতে পার, লিখোনিন? সম্পদ যতদিন থাকবে, দারিদ্র্যও থাকবে! বিবাহ থাকলে, বেশ্যাবৃত্তিও থাকবে। জানো তুমি এই সব বারাঙ্গনাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন কারা? যাঁরা সংসারী লোক, যাঁরা সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোক, হয়তো কোন পতিব্রতার স্বামী, কোন বোনের স্নেহশীল ভাই—এঁরাই! এঁরাই গণিকাদের বাঁচিয়ে রাখেন, লুকিয়ে রাখেন! এঁরা জানেন, এঁরা বোঝেন যে গণিকাবৃত্তি আছে, তাই তাঁদের শয়নকক্ষের আর ছেলেমেয়েদের খেলাঘরের শুচিতা বজায় রয়েছে। শুধু তাই নয়। এঁরা—এই সব সংসারের বুড়ো বুড়ো মুরুব্বিরাও চান একটু-আধটু বৈচিত্র্য—লুকিয়ে-চুরিয়ে একটুখানি নষ্টামি। নইলে সেই মান্ধাতার আমলের বৌ, বাড়ির ঝি, কি পাশের

সঙ্গিনীটিকে নিয়ে আর চলে না, ভারী পানসে লাগে। মানুষ আসলে হচ্ছে বহুবিলাসী জানোয়ার, তাই তার সে-প্রবৃত্তির স্ফূর্তির জন্যে চাই ত্রেপেল কি আনা মারকোবনার এই নানাফুলের বাগান। অবশ্য দাম্পত্য প্রেমে সুখী কোন স্বামীর, কিংবা ছ' সাতটি আইবুড়ো মেয়ের বাপের মনে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে ভয়ানক ভীতিও থাকে বটে। তিনি হয়তো সেণ্ট মাগদালেন আশ্রমের মতো পতিতা-রক্ষা-সমিতির সাহায্যের জন্যে কোন জলসা কি লটারীতে চাঁদাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু গণিকা-বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করতে তিনি রাজী হবেন কখনও ?"

—"মাগদালেন আশ্রম !"—কাষ্ঠহাসি হেসে যেন মনে মনেই উচ্চারণ করলে জেনী ; এতদিনেও বুঝি শুকোয়নি তার অন্তরের কী একটা পুরাতন ক্ষত।

"কথাটা ঠিকই বটে। তবুও এর একটা বিহিত যা হোক করতেই হবে। সেজন্যে হাস্যাস্পদ হই—ক্ষতি নেই। কিছু করবো না ; কেবল দর্শক হয়ে হায় হায় করতে থাকব—এ আত্মার সইবে না।"

—"তুমি কি, লিখোনিন, তা' হলে খেলনা পীচকিরী নিয়ে দাবানল নিবোতে চাও ?"—যেন রূঢ়স্বরেই বললেন প্লাতোনোব।

—"তাতে কি একজনকেও বাঁচাতে পারবো না ? অন্ততঃ সেইটুকুই করতে দাও আমায়। আমায় সাহায্য করো, প্লাতোনোব। ঠাট্টা করে দমিয়ে দিয়ো না আমায়।"

—"তুমি এখান থেকে কোন-একটি মেয়েকে বার করে নিয়ে যেতে চাও নাকি হে, তাকে বাঁচালে বলে ?"—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লিখোনিনের মুখের দিকে চাইলেন সেরজাই।

—"ধরো, যদি তাই হয় ?"

—"সে আবার এখানে ফিরে আসবে।"

"নিশ্চয় !"—বলে উঠলো জেনী।

হঠাৎ উঠে জেনীর কাছে গিয়ে লিখোনিন তার হাতদু'টি চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললে : "জেনেচ্‌কা, ধরো, তোমাকেই যদি আমি—। আমি তোমাকে আমার প্রণয়িনী হতে বল্‌ছিনে, বন্ধু বলেই বলছি। আমরা দু'জনে অন্য কোন ব্যবসা করবো, —বেশ হবে।"

বিরক্ত হয়ে হাত টেনে নিয়ে বললে জেনী: "তোমার সঙ্গে যাব! মরণ আর কি! তোমার মোজা সেলাই করতে হবে, না হয় তোমায় রেঁধে খাওয়াতে হবে। তুমি যাবে আড্ডা মারতে—আর আমাকে হবে হাঁ করে বসে বসে রাত জাগতে? তারপর যখন তুমি কোন চাকরী পাবে কি ডাক্তার কিংবা উকিল হবে, তখন তো আমার পিঠে লাথিচড় মেরে বলবে: বেরো মাগী আমার বাড়ী থেকে। আমার যৌবনটা নষ্ট করেছিস্ তুই! এখন একটি সদ্বংশজাত কুমারীকে বিয়ে করে সংসারী হবো আমি—"

—"না, না, আমি তা' ভাবিনি। আমি ভাইয়ের মতো—"

—"রেখে দাও তোমার ভাই! অমন ভাই-বেরাদার ঢের ঢের দেখা আছে আমার। বড়ো জোর একরাতের জন্যে সাধু হয়ে থাকবে তুমি—তারপরেই ব্যস্! থামো এখন। তোমার ঐসব বাজে বুকনি শুনতে শুনতে আমার মাথা ধরে গেল!"

—"শোনো লিখোনিন"—সাংবাদিক বললেন: "যা পারবে না তা' করতে যেয়ো না। অনেক আদর্শবাদী ছাত্র দেখেছি আমি; নিজেদের আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে চাষার মেয়ে বিয়ে করেছে তারা। কিন্তু দেখা গেছে—হয় সে-মেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পয়লা নম্বরের কুঁড়ে আর শুধু সাজগোজেই পোক্ত হয়ে উঠেছে, নয় হয়েছে অসতী—লুকিয়ে কোন গাড়োয়ানের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে আর প্রেম করছে, কেন না ঐ হলো স্বাভাবিক তার কাছে।"

এর পর কিছুক্ষণের জন্যে কেউই কোন কথা খুঁজে পেলে না। লিখোনিন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে: "মরুক গে যাক! তোমাদের কথা মানিনে আমি!... লিউব্কা!—লিউবোচ্কা!"...

লিউব্কা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল; এখন ডাক শুনে জেগে উঠলো; তারপর হাতের চেটো দিয়ে ঠোঁটের দুই কোণ মুছে, হাই তুলে, শিশুর মতো রঙ্গ করে মুচকি হেসে বল্লে: "ঘুমুই নি, ভাই, ঘুমুই নি। স-ব শুনেচি। একটু তন্দ্রা এসেছিল মোটে!"

"তুমি যাবে, লিউব্কা, আমার সঙ্গে? একেবারে? চিরকালের

জন্যে? আর যাতে এই নরকে ফিরে আসতে না হয়?"—তার হাত-দু'খানি ধরে মিনতি করে বললে লিখোনিন।

অবাক হয়ে জেনীর মুখের দিকে চাইলে লিউব্‌কা, তারপর বললে: "ওঃ, বুঝেছি। কিন্তু তুমি তো সবে একটি পড়ুয়া গো! আমায় বাঁধা রাখবে কী করে?"

—"না, না, তা নয়! তোমায় আমি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে চাই এখান থেকে। এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে লাভ কী তোমার আর!"

—"লাভ আর কী! তবুও যদি জেনেচ্‌কার মতো মানিনী কি পাশার মতো মনভুলুনী হতে পারতাম···কিন্তু এখানে আমি কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারব না।"

—"তবে চলো আমার সঙ্গে। তুমি তো কাটছাঁট, সেলাই-ফোঁড়াই, এসব হাতের কাজ জানো কিছু কিছু?"

—"ওসব কিচ্ছু জানিনে।"—লজ্জা পেয়ে হাসতে হাসতে রাঙা হয়ে উঠে উত্তর দিলে লিউব্‌কা, তারপর খোলা হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে বললে: "একটু-আধটু রাঁধতে পারি শুধু। পুরুত ঠাকুরের বাড়ীতে যখন ছিলাম তখন রাঁধতাম।"

—"ব্যস্‌, তা' হলেই হবে। তুমি হোটেল খুলবে, আমি তোমায় সাহায্য করবো। একটা সস্তার হোটেল। আমি বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব।"—খুশী হয়ে উঠল লিখোনিন।

—"থাক, থাক, ঢের হয়েছে! আর মস্করা করতে হবেনি, বাপু!—" একটু বিরক্ত হয়েই জবাব দিলে লিউব্‌কা, সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসু চোখে চাইল সে জেনীর দিকে।

—"না রে, তামাসা করছে না, সত্যি-সত্যিই বলচে ও",—অদ্ভুত রকমের কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিলে জেনী।

লিউব্‌কার হাত চেপে ধরে লিখোনিন বললে: "সত্যিই বলছি, লিউব্‌কা, ভগবান সাক্ষী!" বলেই ক্রশ-চিহ্ন আঁকলে সে।

জেনী বললে: "তাই করো। ওকেই নাও, লিখোনিন। ওর প্রাণে মায়ামমতা আছে; আমার মতো পাষাণী নয় ও। আমাকে

নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না।···কী দেখছিস্, লিউব্‌কা, হাঁ করে? বল, হাঁ কি না!"

—"না বলব কেন? ঠাট্টা নয় যদি, আর সত্যি হলে···জেনেচ্ কা কী করতে বলিস, ভাই, আমায়?"—লিউবকা বললে।

—"ওর হাতে চুমু দে, নেকী! না, বসলেন এখন হিসেব কষতে! ও তোর ত্রাণকর্তা—বুঝলি?"—যেন রাগত ভাবেই বললে জেনী। ভালোমানুষ লিউব্‌কাও তাই শুনে সত্যি সত্যি মুখ বাড়ালে লিখোনিনের দিকে; তাই দেখে হেসে উঠল সবাই, কিন্তু প্রাণেও যে একটু লাগল না সবার তা-ও নয়।

আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো লিখোনিন। বললে: "যাও, লিউব্‌কা, বাড়ীউলী মাসীকে বলে এসো গে যে জন্মের মতো চলে যাচ্ছ তুমি। আর সঙ্গে তোমার যা' না নিলে নয়—শুধু তাই নিয়ে এসো।"

—"অত সোজা নয় গো, বন্ধু! দশ রুবল খরচ করতে প্রাণে সইবে তো?"—বললে জেনী।

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়···!"

"তবে দশটি রুবল বাড়ীউলীকে দক্ষিণা দিয়ে, লিউব্‌কাকে আজকের মতো ভাড়া করে নিয়ে যাও। ঐ হচ্ছে বাঁধা রেট! পরে কাল ওর হলদে টিকিট আর জিনিষপত্তর চাইতে এসো। সে ব্যবস্থা আমরা করিয়ে দেব। পরে ঐ হলদে টিকিট নিয়ে পুলিশে গিয়ে বলবে, লিউব্‌কা অমুকতমুক বলে মেয়েটা তোমার ঝিগিরি করতে রাজি হয়েছে, ওর এই হলদে টিকিট বদলে একখানা আসল 'পাশপোর্ট' দিতে হুকুম হোক। ···যা, এখুনি দৌড়ে যা, লিউব্‌কা! রুবল নিয়ে গিয়ে গিন্নীঠাকরুণকে দিয়ে আয়। দেরি করিস নে। সাবধান! কুত্তী আবার টের না পায়! মাগী ভারী ঠেঁটা!"

আধঘণ্টা পরে সেই গণিকালয়ের সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে লিখোনিন আর লিউব্‌কা উঠে চড়ে বসল। জেনী আর সাংবাদিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

"মস্ত ভুল করলে হে, লিখোনিন!"—ক্লান্তকণ্ঠে বলছিলেন সাংবাদিক:

"তবু তোমার সদ্ভাবকে শ্রদ্ধা করি আমি। যেই না ভাবা সেই না কাজ! সাহস আছে তোমার, চমৎকার ছেলে বটে তুমি।"

—"এই তো সবে সুরু! তবে গোড়ায়ই বলে রাখি!"—হাসতে হাসতে বললে জেনী: "দেখো, নামকরণ-উৎসবে আমায় খবর দিতে ভুলে যেও না যেন।"

—"সে গুড়ে বালি! অনন্তকাল অপেক্ষা করে বসে থাকলেও সে খবর পাবে না বলে রাখছি!"—লিখোনিনও হেসে টুপী দোলাতে দোলাতে জবাব দিলে।

চলে গেল তারা। সাংবাদিক জেনীর দিকে ফিরে চাইলেন, দেখলেন জেনীর চোখে জল; আপন মনে বলছে সে: 'তাই যেন হয়, হে ভগবান, তাই যেন হয়!'

—"কী হয়েছে তোমার, জেনী? বলবে আমায়?"

প্লাতোনোবের দিকে পেছন ফিরিয়ে সিঁড়ির হাতল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল জেনী। হঠাৎ ধরাগলায় জিজ্ঞেস করলে সে: "বলবার যেদিন সময় আসবে—কোথায় তোমায় পাবো বলো তো!"

"কেন, সে তো খুব সোজা—প্রতিধ্বনি আপিস, সম্পাদকীয় বিভাগ, ব্যস। চটপট ওরা পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে।"

"আমি···আমি···আমি,"—কী যেন বলতে চাইল জেনী, কিন্তু কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল, দু'হাতে মুখ ঢাকলে সে, বল্লে: "বেশ, তোমায় লিখবো তখন।"

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে; দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

দ্বিতীয় ভাগ

—এক—

তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ দশ বৎসর। আজও কিন্তু ইয়াম্‌কার প্রাচন অধিবাসীদের মন থেকে সেদিনকার সে-দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে যায় নি। বাস্তবিক কী দুর্বৎসরই না পড়েছিল সেবার! প্রথমে সুরু হয় নানা-রকমের ছোটখাটো অশান্তি আর উপদ্রব, তারপর দেখতে দেখতে দেখা দিল সেখানে খুন, জখম, রাহাজানি, আত্মহত্যা—প্রায় প্রতিদিনই! যে-গবর্ণমেন্টের অনুমোদনে তিল তিল করে সেখানে একদিন গড়ে উঠেছিল গণিকাবৃত্তির নিশ্চিন্ত নীড়, শেষে একদিন আবার তারই হস্তক্ষেপের ফলে সেখানে তা পড়ল ছিন্নভিন্ন হয়ে—আর তারই ধ্বংসা-বশেষ দিয়ে তৈরি হলো শহরের জেলখানা, হাসপাতাল, পথঘাট! সেদিনের কথা স্মরণ করে আজও বুড়ী বাড়িউলীরা নির্বোধ, শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকে।

বস্তা খুলে ফেললে তা থেকে যেমন হুড় হুড় করে আলু ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তেম্নি করে পড়ে গেল সেখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরিডাকাতি, খুনজখম, আধিব্যাধির মরশুম। বাড়িউলীরা অবশ্য কোনও দিনই শোনেনি যে মারাত্মক একটা-কিছু ঘটতে পারে সেখানে; তবুও সবাই যেন অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল দুর্নিবার নির্বন্ধ এগিয়ে এসেছে ইয়ামাতে।

আর বাস্তবিকই তাই। যেখানেই মানুষ কোন-না-কোন কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সমাজে পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে—তা সে সমস্বার্থই হোক, রক্তসম্পর্কই হোক, অথবা হোক না কেন তা কোনও ব্যবসার খাতিরে—সেখানেই দেখতে পাই একদিন দুর্নিবার নিয়তির রহ লীলা, তিলে তিলে পুঞ্জীভূত ঘটনাবলীর অকস্মাৎ একত্র সমাবে মহামারীর মতো তাদের বিস্তার, তাদের অন্তর্নিহিত অদ্ভুত পার ও সঙ্গতি, তাদের দুজ্ঞের্য় পরিব্যাপ্তি। পারিবারিক জীবনেও এমন

ঘটে থাকে—দেখতে পাই ব্যাধি আর মৃত্যু এসে এক-এক করে স্বজনদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—অনিবার্য সে গতি, দুর্জ্ঞেয় তার বিধান। প্রবাদ আছে দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। লোকে বলে, অমঙ্গল রয়েছে তোমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মঠ, ব্যাঙ্ক, সরকারী দপ্তরখানা, সৈন্যদল, বিদ্যালয়—এককথায় যে-কোনও রকমের যৌথ-প্রতিষ্ঠানেই এটি দেখতে পাই। দিনের পর দিন নদীর মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলেছে জীবনধারা—চলেছে দীর্ঘকাল ধরে; অকস্মাৎ একদিন অতি তুচ্ছ কোন-একটা ঘটনা উপলক্ষ্য করে হলো সেখানে পরিবর্তনের প্রথম সূত্রপাত; তারপর দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল স্থানান্তর, পদবিভ্রাট, কর্মচ্যুতি, ক্ষয়ক্ষতি, আধিব্যাধি! প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যেন চক্রান্ত করে—কেউ করলে মৃত্যুবরণ, কেউ হয়ে গেল উন্মাদ, কেউ ধরা পড়ল চুরির দায়ে, কেউ কেউ বা করে বসল আত্মহত্যা; সঙ্গে সঙ্গে চলল শূন্যপদে বারংবার লোক-নিয়োগ, নিম্নপদ থেকে উচ্চপদে উন্নীয়ন, ক্রমাগত নতুন নতুন লোকের আবির্ভাব,—তারপর? তারপর হয়তো মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই পুরোনো লোকদের একজনকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সেখানে; আগাগোড়া সবই তার নতুন—যদি না ইতিমধ্যে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়ে থাকে। বড় বড় নগর, সাম্রাজ্য, জাতি, দেশ—এমন কি হয়তো সমগ্র সৌরজগৎও এই অভাবনীয় দৈবেরই অধীন—কে জানে?

এইরূপ কোন্ এক দুজ্ঞেয় দৈবেরই তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল সমগ্র ইয়ামস্কায়া শহরের বুকের 'পরে, আর তারই ফলে হলো তার এত দ্রুত, এমন কলঙ্কময়, অবসান। যে-ইয়াম্‌কায় এককালে হৈ-হল্লা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে এখন হয়েছে এক শান্ত সাধারণ শহরতলীর উদ্ভব—সেখানে আজ বাস করে সাধারণ চাষী গৃহস্থ আর ছোটখাটো ব্যবসাদারেরা। নির্বিঘ্নে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অতীতের ইয়ামকার কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্যে এখানকার বর্তমান অধিবাসীরা কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে লিখে পড়ে স্থানীয় বড় ব্যবসায়ী ও গির্জার অধ্যক্ষ গলুবোবের সম্মানে জায়গাটার নাম বদলে রেখেছে গলুবোবুকা।

প্রতি গ্রীষ্মে যে বার্ষিক মেলা বসে সেটা সেবার খুব জমকালো ধরণের হয়েছিল ; আর সেই হলো ইয়ামকার 'পরে প্রথম রূঢ় আঘাত। এ-রকম আশাতীত সাফল্যের কারণও ছিল অনেক। ইয়ামকার পাশেই বসেছিল তিন-তিনটি নতুন চিনির কল। ফসলও ফলেছিল সেবার প্রচুর—গম আর বিশেষ করে বীটচিনি। বৈদ্যুতিক ট্রলি হলো, খাল কাটা হলো, আর তৈরি হলো যত লম্বা লম্বা রাস্তা। নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার হুজুক লোককে যেন পেয়ে বসল একেবারে। আগাছার মতো চতুর্দিকে গজিয়ে উঠতে লাগল ইটের কল। খোলা হলো প্রকাণ্ড এক কৃষি-প্রদর্শনী। দু'দুটো নতুন স্টীমার কোম্পানী ব্যবসা খুলে বসল। তারা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে এমনই পাল্লা জুড়ে দিলে যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পঁচাত্তর কোপেক থেকে নেমে প্রথমে পাঁচে, শেষে একেবারে একে, এসে ঠেকল। তবুও সেখানেই কি শেষ? একটা কোম্পানী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দিতে লাগল। অন্যটা শুধু তাই-ই নয়, আবার আধখানা করে রুটিও দিতে লাগল তারই সঙ্গে। কিন্তু সব চাইতে বড় আর গুরুতর ব্যাপার যা সে হলো এখানকার নদীর বন্দরে ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজ; তারই জন্যে হাজার হাজার শ্রমিকের নিত্য আমদানী হতে লাগল সেখানে। এতে কত যে ব্যয় হয়েছিল তা' একমাত্র ভগবানই জানেন।

আর ঠিক সেবারই পড়ল স্থানীয় মঠের সহস্রবার্ষিক সমাবর্তন উৎসব। সারা রুশিয়ায় এটিই ছিল প্রাচীনতম আর সব চেয়ে বিত্তশালী মঠ। রুশিয়ার চতুর্দিক থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী আসতে লাগল। সুদূর সাইবেরিয়া, হিমসাগর-পারের দেশ, দক্ষিণপ্রান্তের কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের তীর—নানা দেশ থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রী এসে জুটল স্থানীয় দেবদেবী সাধুসন্তকে পূজো দিতে। সন্ন্যাসীরা বাস করতেন গভীর গুহাতে নিজেদের আশ্রমে। মঠ থেকে প্রত্যহ চল্লিশ হাজার যাত্রীকে খাদ্য-পানীয় দেওয়া হতো। মঠের অতিথিশালায় যাদের স্থানসঙ্কুলান হতো না, রাত্রে তারা শুয়ে থাকত অলিন্দে, নয়তো মঠেরই কোনও একপাশে পড়ে থাকত শূয়রের পালের মতো।

বুঝি রূপকথার কোন-এক মনোরম গ্রীষ্মকাল! শহরের জনতা বেড়েছে প্রায় চতুর্গুণ। হরেক রকমের লোক—রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, চিত্রকর, ইঞ্জিনীয়ার, কারখানার শ্রমিক, বিদেশী, চাষী, চোরাই মালের কারবারী, মাঝিমাল্লা, বেকার বদমাইস, ভ্রমণকারী, চোর, জুয়াড়ী—কত কী! লোকের ভিড়ে শহরে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই। কোনও হোটেলেই একটুখানি জায়গা খালি পাওয়া যায় না—তা সে যত নোংরাই হোক, কিংবা হোক না কেন তার বিলি-ব্যবস্থা যতই সন্দেহজনক। সামান্য একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের জন্যে লোকে অসম্ভব ভাড়া দিতে রাজি। স্টক-এক্সচেঞ্জে এর আগে বা পরে এমন উঁচুদরের ফাটকাবাজি আর কখনও হয়নি। লক্ষ লক্ষ টাকা যেন জলের মতো শুধু এ-হাত থেকে ও-হাত আর পরক্ষণেই সে-হাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাত্র ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কেউ হয়তো হয়ে উঠল বিপুল বিত্তের অধিকারী, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর পুরোনো কারবার গেল দেউলে হয়ে,—কাল যে ছিল লক্ষপতি আজ সে হয়ে দাঁড়াল দীনভিখারী। সামান্য দিন-মজুররাও এই অর্থের বন্যায় নেয়ে উঠে আরামে গা শুকোতে লাগল। আর এই কলরবমুখর প্রবাসীর দল সহজ অর্থের আকর্ষণে, এই প্রাচীন প্রলোভনময়ী নগরীর লালসাদীপ্ত সৌন্দর্যে মত্ত হয়ে, দক্ষিণের মন্দোষ্ণ মনোরম রাত্রের সুখস্পর্শে মুগ্ধচিত্তে, শুভ্র অশোকস্তবকের মদির গন্ধে অন্ধ হৃদয়ে, মানুষের মূর্তিতে লক্ষ লক্ষ অতৃপ্ত কামান্ধ পশুর মতো তাদের অন্তরের সমবেত বাসনাকে শুধু একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করে তুলত—'নারীসঙ্গ চাই আমাদের!'

একমাসের মধ্যেই নিত্য নূতন আনন্দের বান ডাকল। ছোট ছোট হোটেল-রেস্তরাঁ—সঙ্গে হয়তো ছোট্ট একখানা করে বাগানও—হঠাৎ খুলে বসল ব্যবসা। বসে গেল বড় বড় রাস্তার মোড়ে ছোট ছোট নৈশ আড্ডা; উদ্দাম হয়ে উঠল সেখানে কুৎসিৎ ব্যাভিচারের স্রোত। কত সংসার যে ভরে উঠল অশান্তিতে কে তা বলবে! কত যুবক যে ঘৃণিত ব্যাধি নিয়ে বাড়ী ফিরলে তার শেষ নেই; তাদের জন্যে বুড়ো বাপমায়ের অশান্তি, সে আজও ঘোচেনি। গ্রাম থেকে দলে দলে আসত যত সব গরীবের মেয়ে—আসত কাজের জন্যে, নয়তো এম্নিই—মজা

দেখতে; আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হতে পারে তাই ফলতে লাগল,—অনেকেই তাদের শুচিতা হারিয়ে বাড়িয়ে তুললে গণিকার সংখ্যা। চুরিডাকাতি বেড়ে উঠল ভয়ানক। পুলিশের আধিক্য থাকলেও ঘুষের প্রাচুর্যে আর কর্তব্যের যথেষ্ট ত্রুটিতে মানুষের বাস হয়ে দাঁড়াল অত্যন্ত বিপজ্জনক। উপদ্রব এত বেড়ে উঠল যে দিনের বেলাতেও যেখানে-সেখানে হতে লাগল খুনখারাপি।

ইয়ামকার তখনকার সে অবস্থা বর্ণনাতীত। যদিও বাড়িউলীরা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের 'পণ্য', দরও চড়িয়ে দিয়েছিল তিনগুণ, তা' সত্ত্বেও খদ্দেরের ভীড় এত বেড়ে যায় যে বেচারীরা কেউই আর তাদের সন্তুষ্ট করে উঠতে পারছিল না। সর্বদা লোকে গিস্ গিস্ করছে বৈঠকখানা, কোনও কোনও মেয়েকে দিনে সাতবার-আটবার, এমন কি দশবারও, হতে হয়েছে পুরুষের অঙ্কশায়িনী।

সেই হলো ইয়ামকার কাল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আমাদের সেই চেনা মুটকী বুড়ী ঝাপসা-চোখী আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ও।

—দুই—

প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা সানন্দে ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, নিমেষে পেরিয়ে চলেছে যত সব সোনালি গমের ক্ষেত আর মনোহর ওক-কুঞ্জ। ঐ তো গুড় গুড় করতে করতে লোহার পোলের 'পর দিয়ে তা পার হয়ে এল কত ঝকঝকে তকতকে নদীনালা—পেছনে পড়ে রইল শুধু রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাখানার সবক'টা জানলাই রয়েছে খোলা, তবুও ভেতরটা ভয়ানক গুমোট হয়ে উঠেছে—তেতেও উঠেছে বেশ। ইঞ্জিনের কুটকুটে ধোঁয়ায় গলা জ্বালা করছে সবার। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আর ভেতরের গরমে বড়ই কাবু হয়ে পড়েছে যাত্রীর দল—খালি একজন ইহুদী ছাড়া। লোকটা বেশ হাসিখুসি, চটপটে, মিশুক, আর বড় বাচাল;

চালচলন দেখে বেশ সহৃদয় লোক বলেই মনে হয় তাকে। সেজেছে সে পরিপাটী করে। সঙ্গে একজন তরুণী। তাদের দেখলেই—অন্ততঃ মেয়েটিকে দেখলেই—বেশ বুঝতে পারা যায় সদ্য-বিবাহিত তারা; লোকটার সামান্য একটু আদরে-সোহাগে থেকে থেকে অসম্ভব রকমে রাঙা হয়ে উঠছে মেয়েটি, আর যখনই সে নম্র ভীরু চোখদু'টি তুলে চাইছে তার দিকে, মনে হচ্ছে আকাশের বুকে বুঝি হঠাৎ দু'টি তারা ফুটে উঠে নিমেষেই হয়ে পড়ল বাষ্পাকুল! মেয়েটির সুন্দর মুখখানিতে এমনই একটি অপরূপ শোভা ফুটে উঠেছে যা শুধু এক ইহুদী কুমারীদের মুখেই দেখতে পাই নব অনুরাগের আবির্ভাবে—পেলব রক্তিম মুখখানি, রক্তিম ওষ্ঠাধর, অপার্থিব সরলতায় মাখা, আর কালো চোখদু'টির নিবিড় অন্ধকারে যেন এক হয়ে মিশে গেছে চোখের তারা আর চোখের মণি!

তিনজন অচেনা লোকের সামনেই, একটুও লজ্জিত না হয়ে, থেকে থেকেই মেয়েটিকে আদরে-সোহাগে ছেয়ে ফেলছিল লোকটা; তাতে যে শালীনতার অভাব না ছিল এমন নয়। চালচলনে তার স্পষ্ট ফুটে বেরুচ্ছিল মালিকানার সস্মিত ভাব,—এ হলো গিয়ে সেই একান্ত আত্মতান্ত্রিক প্রেম যা বিশ্বজগৎকে যেন ডেকে বলতে চায়: 'চেয়ে দেখো কী সুখী আমরা—এতে করে তোমরাও সুখী বোধ করছ, নয় কি?' এই হয়তো লোকটা তার সঙ্গিনীর কটিতটের 'পরে নিলে হাত বুলিয়ে, এই দিলে তার গাল টিপে, তারপরই হয়তো নিজের পাকানো কড়া কড়া গোঁফজোড়া মেয়েটির ঘাড়ের 'পরে বুলিয়ে দিলে তাকে সুড়সুড়ি······আর তাতে করে যদিও সে নিজে আনন্দে ঠিক আত্মহারা হয়ে পড়ছে না, তবুও তার ঘন ঘন পলক-পড়া চোখে, তার কম্পিত ওষ্ঠের 'পরে, তার ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চৌকো থুৎনিতে, কেমন যেন একটা লালসাময় ভীরু অস্বাচ্ছন্দ্য উঠেছে ফুটে।

এদের সামনের আসনেই বসে ছিলেন তিনজন যাত্রী; প্রথম, একজন অবসর-প্রাপ্ত জেনারেল—পাতলা, ফিটফাট, ছিমছাম, ছোটখাটো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক; দ্বিতীয়জন, এক জোতদার—বেশ মোটাসোটা দেখতে, গরমে গলার কলার খুলে ফেলে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না

ভদ্রলোক, মিনিটে মিনিটে একখানা ভিজে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলেন আর হাঁপাচ্ছিলেন বসে বসে; তৃতীয়জন হলেন পদাতিক সৈন্যদলের একজন তরুণ সেনানী।

অনবরত বকবক করেই চলেছে ইহুদী যুবকটি। এরই মধ্যে সে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে তার নাম হলো সাইমন ইয়াকোবালবিচ হোরাইজন। ভাপ্সা গরমে যদি একটা মাছি ঘরের মধ্যে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে করতে বারে বারে জানালার কাচে এসে ঠোকা খেতে থাকে তবে সেটা যেমন বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, সাইমনের বকবকানিও এঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল তেম্নি বিরক্তিকর। কিন্তু সাইমন জানত সময় কাটাবার রহস্য। নানা রকম ম্যাজিক দেখাতে সুরু করে দিলে সে, ইহুদীদের মধ্যে চলতি নানা রকমের মজার মজার গল্পও বলতে লাগল। ট্রেন থামলে সাইমনের বৌ একটু ঠাণ্ডা হবার জন্যে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছে, অম্নি সাইমন এমন সব কথা পেড়ে বসেছে যে তা শুনে দন্তপাটি বিকাশ করেছেন জেনারেল, জোতদার মশায় হ্রেষাধ্বনি করে হাসতে সুরু করেছেন, আর তরুণ সেনানী বেচারা—মোটে বছরখানেক হলো স্কুল থেকে বেরিয়েছে সে—হাসি চাপতে না পেরে বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

হোরাইজনের বৌ খুব যত্ন করে মাঝে মাঝে স্বামীর মুখ রুমালে মুছিয়ে দিচ্ছিল. পাখা দিয়ে তাকে হাওয়াও করছিল, আর এই রকম সেবাযত্ন পেয়ে সাইমনের মুখে মূর্খের মতো ফুটে উঠছিল আত্মশ্লাঘা।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৃদ্ধ জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, —"কিছু যদি মনে না করেন তবে জিজ্ঞেস করি আপনি এখন করেন কী?"

"হা ভগবান!"—বেশ সরলপ্রাণেই উত্তর দিলে সাইমন,—"এই দুর্দিনে আমার মতো এক বেচারা ইহুদী কী-ই বা এমন করতে পারে? এই ঘুরে ঘুরে মালপত্র খরিদবিক্রী করি আর কী, দালালীও করি তার সঙ্গে সঙ্গে। তবে এখন সে সব কিছুই করছি নে—মানে, কী আর বলব বুঝতেই তো পারছেন এই মধুচন্দ্র যাপন করতে বেরিয়েছি আর কী—না, না, সয়োচ্কা, রাঙা হয়ে উঠো না—বছরে এ তো আর বার বার

ঘুরে ফিরে আসবে না। তবে হ্যাঁ, তারপরই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, আর খাটাখাটনিও করতে হবে অনেক। এখন সরোচ্‌কাকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করব। তারপর পথই হবে আমার সঙ্গী। সিদ্রিসের আর দু'টো ইংরেজ কারবারের প্রতিনিধি আমি। একবার দেখবেন তাদের জিনিস ? এই দেখুন সব নমুনা…" বলেই পাকা দরজির মতো চট করে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল খুলে বসল সে। সুরু করে দিলে—"দেখুন, কী চমৎকার সব নমুনা। এটা হলো বিলিতি, আর এটা দেশী—দেশীটা কোনও অংশেই হীন নয়। এটাই কি রুশিয়ার উন্নতির পরিচায়ক নয় ?"

বলেই চলল সে—"তারপর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাশোনা করব। একটু প্রমোদ-ভ্রমণও করব। তারপর ভল্‌গা থেকে জারিৎসিন হয়ে কৃষ্ণসাগর, শেষে একদম নিজের দেশ ওডেসাতে চলে যাব।"

—"চমৎকার প্ল্যান আপনার ?"—ভদ্রভাবে বল্লে তরুণ সেনানীটি।

—"বটেই তো!" বললে সাইমন: "কিন্তু কী জানেন, ঐ যে কথায় আছে—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ব্যবসায়ী লোকের কাজ বড়োই কঠিন। তার শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি থাকলেই চলে না, আরও একটা জিনিস থাকা চাই তার, সেটা কী বলব—ধরুন, এই মানুষের মনের খোঁজখবর রাখা। ধরুন, একজন ভদ্রলোক কিছুতেই কিছু শুনবেন না, মালের অর্ডারও দেবেন না; তাঁকে পথে আনতে তখন অমানুষিক খাটুনি খাটতে হয়। আর আমার হচ্ছে কী জানেন ? —কোনও বাজে মাল, কি নকল জিনিস রাখিনে আমি। যদিও তাতে হয়তো আমি ঢের বেশি আয় করতে পারতাম। আমার কথা যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সবাই একবাক্যে বলবে: সাইমনের মতো মানুষ আর দু'টি নেই, এমন লোক সে"—বলেই সাইমন তার একটা সাস্‌পেণ্ডার আর রঙবেরঙের বোতামের বাক্স খুলতে সুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাও চলতে লাগল তার:

—"যখন একই জায়গাতে অনেক ভ্রাম্যমান দালাল এসে জোটে তখনই বাধে যত গণ্ডগোল। সেখানে তেমন সুবিধে করে উঠতে পারা যায় না। লোকে কথাই শুনতে চায় না মোটে। আমি কিন্তু

তাতে ঘাবড়াইনে। হোরাইজনকে চেনে সবাই। কথায় মানুষকে এমন বশ করতে পারি—বনের পশুও বশ হয়। যখন একই জিনিসের জন্যে দু'জন দালাল একই জায়গাতে আসে—তাতে হয় কী, দু'জনেরই ব্যবসা নষ্ট। নানা রকম ফন্দিফিকির খাটাতে হয় তখন। সে যাই হোক, আমি নকল চোখ আর নকল দাঁতের ব্যবসাও করি, তবে এতে বিশেষ লাভ হয় না, ও-কাজ ছেড়ে দেব। তা ছাড়া এ রকমের সব ব্যবসাই ছেড়ে দেব ভাবছি। যদ্দিন যৌবন থাকে, দেহে মনে শক্তি থাকে কানায় কানায় ভরা, তদ্দিনই চলে এ-সব কাজ—এই গুটিছেঁড়া প্রজাপতির মতো এখানে-সেখানে উড়ে বেড়ানো; কিন্তু যেই বৌ এনে ঘরে তুলেছি আর তারপর সন্তান-সন্ততিও হয়েছে"—খেলাচ্ছলে স্ত্রীর হাঁটুতে টোকা মারতে লাগল সাইমন, আর সে বেচারাকে লজ্জায় লাল হয়ে অপরূপ সুন্দর দেখাতে লাগল—"তা ভগবান আমাদের ইহুদীদের সকল রকমের দুর্ভাগ্যের বদলে দিয়েছেন প্রচুর প্রজনন-শক্তি···বিয়ে করে মানুষ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে চায়, চায় নিজেই কোনও একটা ব্যবসা ফেঁদে বসতে, এ-সব তাই বিয়ের আগেই ভালো।" তারপর বৃদ্ধ সেনানীটির দিকে চেয়ে বল্‌লে সে—"আপনার কী মত ?"

—"বটেই তো, বটেই তো।"

—"আর সেই জন্যেই"—সাইমন শেষ করেনি তখনও,—"সরোচকার সঙ্গে একটু যৌতুকও নিয়েছি ; যদিও খুব সামান্যই, তবুও আমার কাছে তা অমূল্য। আমার নিজেরও কিছু অর্থ আছে, আর যাঁদের কাছে কাজ করি তাঁরাও কিছু ধার দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। ভগবানের আশীর্বাদে খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া সাবাথের দিন একটু বিশেষ আয়োজন··· ।"

—"ভাবছি" —সাইমন বলেই চলল : "হোরাইজন এণ্ড সন্‌ নামে একটা কারবার খুলবো। কী বল সরোচকা—'এণ্ড সন ?'—যদি কোনও দিন আমাদের দোকানের সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, হয়তো তখন মনে পড়বে যে একদিন এক হতভাগা প্রেমপাগলের সঙ্গে ট্রেনে একত্র ভ্রমণ করেছিলেন। আশা করি তখন আপনি আপনার অর্ডার দিয়ে বাধিত করবেন আমায়।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয় !"—সায় দিলেন জোতদার মশায়।

—"জমির দালালিও করি আমি; জমি কেনাবেচা করে দিই, বন্ধকীর বন্দোবস্তও করি। আপনার যদি সে রকম কোনও কাজের দরকার হয়"—বলেই তিনখানা কার্ড জোতদার আর অন্য দুইজনকে দিলে সে।

পকেট হাতড়ে জোতদার মশায়ও তাঁর একখানা কার্ড সাইমনের হাতে গুঁজে দিলেন। চেঁচিয়ে নামটা পড়ল সাইমন,—'যোসেফ ইবানোবিচ্ ডেন্‌জেসেবস্কি।' বেশ বেশ! যদি কোনও দিন দরকার হয়—"

—"নয়ই বা কেন? হতেও তো পারে"…ভাবতে ভাবতেই বল্লেন তিনি, —"হ্যাঁ, ঠিক, বোধহয় ভাগ্যই আমাদের দু'জনকে আজ মিলিয়ে দিয়েছে। আমি এখন যাচ্ছি ক—তে একটা জমিদারি বিক্রীর ব্যাপারে; আপনি যদি এসব কাজ করেন তবে দেখা করবেন আমার সঙ্গে। আমি বরাবর গ্র্যাণ্ড হোটেলেই গিয়ে উঠি।"

—"নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি"—উৎসাহিত হয়ে উঠল যেন সাইমন, "এই শর্মা যদি কোনও কাজে হাত দেয় সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

আধঘণ্টা পরে গাড়ীর প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে সাইমন আর সেই তরুণ সব-লেপ্টেনাণ্ট ছোকরাটি ধূমপান আর আলাপ করছিল :—

সাইমন।—আপনি কি প্রায়ই ক—তে যান?

সেনানী।—না, এই প্রথম যাচ্ছি। আমার রেজিমেণ্ট রয়েছে শেরনোবোব্-এ। আমার নিজের জন্মস্থান হলো মস্কৌ।

—"বটে! আপনি এতদূর এলেন কী বলে তবে?"

—"কী করব? আমি যখন সৈনিক হই, তখন ও ছাড়া আর কোনও জায়গা খালি ছিল না।"

—"কিন্তু শেরনোবোব যে একেবারে অতল পাথার! সারা পডোলিয়ার মধ্যে এমনতর জঘন্য স্থান বোধহয় আর নেই।"

—"তা' সত্যি, কিন্তু উপায় কী?"

—"তার মানে তরুণ ভদ্র সেনানী আপনি ক—তে যাচ্ছেন একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে ?"

—হ্যাঁ, ভাবছি দিন দুই থাকব সেখানে। দু'মাসের ছুটি পেলাম, ভাবলাম যে মস্কো যাবার পথে এ জায়গাটা একবার ঘুরে যাই। শুনেছি চমৎকার জায়গা।"

—"হ্যাঁ, ভারী চমৎকার জায়গা! পুরোদস্তুর একটি ইয়োরোপীয়ান শহর! যেমন চওড়া রাস্তা, তেমনি বিজলী আলো, থিয়েটার, নাচঘর। আপনি অতি-অবিশ্যি 'সাভুয় ছ ফ্লুও' দেখতে যাবেন তা হলে—তিবোলিতে; আর চট করে একবার দ্বীপটাও ঘুরে আসবেন। ওখানকার কথাই আলাদা! কী সব মেয়েমানুষ, কী মেয়েমানুষ সব, আহা!"

রাঙা হয়ে উঠল সৈনিকপুরুষটি, একটু যেন কাঁপা গলায়ই বল্লে, "হ্যাঁ, আমিও তা' শুনেছি; কিন্তু সত্যিই কি ?"

—"হ্যাঁ, মাইরি! বলতে কি, সুন্দরী বললে ঠিক বলা হয় না।"

—"কী রকম!"

—"শুনুন তবে! পাগল করা রূপ তাদের, আর বুঝছেনই তো কত রকমের রক্তের সংমিশ্রণ সেখানে—পোলিশ, ক্ষুদে রুশিয়ান, হিব্রু···কত কী! আপনি স্বাধীন, আপনি একা,—হিংসে হয় আপনাকে। তেমন তেমন হলে আমিও একবার দেখে নিতাম! সব চেয়ে বড়ো কথা—অসম্ভব তাদের লালসা, একেবারে যেন আগুন! আর জানেন একটা কথা ?"—জিজ্ঞেস করলে সাইমন গভীর অর্থপূর্ণভাবে কানে কানে।

—"কী ?" —ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে যুবকটি।

—"অবাক কাণ্ড! বিশ্বাস করুন আমায়, যারা সারা দুনিয়া চুঁড়ে বেড়িয়েছে তাদেরই কাছে শুনেছি, দুনিয়ার কোথায় কখনো—লণ্ডন কি পারী যেখানেই হোক না কেন—এ রকমটি পাবেন না আপনি। ওর মধ্যে বিশেষত্ব আছে—আমরা ক্ষুদে ইহুদীরা যেমন বলে থাকি। এরা এমন সব কলা-কৌশল ভেবে ভেবে বার করেছে যা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারে না। পাগল হয়ে যাবেন আপনি।"

—"সত্যি ?"—শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে এল ছেলেটির।

—"শুনুন তবে। এখন না হয় আমি অকর্মণ্যদের দলে গিয়ে পড়েছি, তা' বলে চিরদিনই তো আর এমনটি ছিলাম না। বয়সও ছিল আমার, আর বয়সকালে সব্বাই পাপ করে থাকে···আচ্ছা, আপনাকে দেখাচ্ছি কয়েকখানা ছবি। খুব সাবধানে দেখবেন কিন্তু।"

চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে চট করে একটা মরক্কো বাঁধাই কেস্ পকেট থেকে বার করে দেখালে হোরাইজন—"এই যে, দেখুন এদিকে ; কিন্তু মিনতি করে বলছি, খুব সাবধান!"

যুবকটি এক-এক করে কার্ডগুলো উল্টে যেতে লাগল—নানা রকমের অশ্লীল ছবি যত, কামকলার বিবিধ ভঙ্গি, এক-একটা অসম্ভব রকমের কায়দা, যাতে করে মানুষ পশুরও অধম হয়ে ওঠে। হোরাইজন যুবকটির ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, আর মাঝে মাঝে খোঁচা মেরে মেরে জিজ্ঞেস করছিল,—"বলুন, চমৎকার নয়? পারী কি ভিয়েনার মেয়েরা এদের কাছে লাগে?"

সেনানীটি যখন ছবিগুলো ফেরৎ দিলে তখন তার হাত-পা কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, দৃষ্টি আবছা হয়ে এসে গালে একটু রঙও ফুটে বেরিয়েছে।

হোরাইজন বলতে লাগল,—"এখন আর আমার এ-সব বিষয়ে রুচি নেই একেবারে। ভারতীয় বৈরাগ্য এসে গেছে। তাই ভাবছি কাউকে দিয়ে দেব ছবিগুলো। দামের জন্যে কিছু আটকাবে না। আমি বলি কী ···তা' আপনিই নিন না কেন? আলাপ-পরিচয় আমাদের এখন বন্ধুত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি নেন তবে পঞ্চাশ কোপেকে ছাড়তে পারি।···ত্রিশেও ছাড়তে পারি।···কেন, এটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে?···মোটেও তা নয়। বেশ তো, তাই যদি হয় তবে পঁচিশই দিন —তাও নয়?···কী সাংঘাতিক লোক আপনি! আচ্ছা, কুড়ির নীচে নামবার উপায় নেই কিন্তু।···আমি যখনই এদিকে আসি, হারমিটেজে এসে উঠি। সেখানে অনেক সুশ্রী যুবতীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আপনাকেও পরিচয় করিয়ে দেব। অর্থের প্রত্যাশী নয় তারা, তারা চায় শুধু আপনার মতো একজন সুদর্শন যুবকের সঙ্গ। এই কার্ডগুলো এমনই জিনিস যে এগুলো এন্নি পড়ে থাকবে না ; যারা এসব মালের কদর

বোঝে তারা হয়তো এক-একটাই তিন রুবলে কিনে নিতে চাইবে।"—চোখ একটু কুঁচকে মুখটা নীচু করে বললে সে, "কত মেয়েই যে এসব ফটো পছন্দ করে।"

সাইমন যুবকটির হাত ধরে এমন ভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল যেন কিছুই হয়নি।

তা' সাইমন লোকটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। অনেকক্ষণ ধরে একটি বাচ্চা বছর তিনেকের সুন্দরী মেয়ের 'পরে চোখ রাখছিল সে, এখন তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তার সঙ্গে তারই মতো আধো আধো ভাষায় আলাপ জুড়ে দিলে, "খুকুমণি, দাত্তো কোতা মায়েল কোল খেলে···উই, উই, উই···!" হঠাৎ কোত্থেকে এক তন্বী সুন্দরী তরুণী এসে রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করলে তার এই গায়ে-পড়া আলাপের জন্যে। সাইমন বললে, "কিছু মনে করবেন না; ভারী সুন্দর আপনার ছোট মেয়েটি! আমারও এই রকম একটি মেয়ে আছে। আমি—কী বলে গিয়ে—সামলাতে পারিনি, তাই একটু আদর করছিলাম···।" কোনও কথা না বলে বাচ্চাটির হাত ধরে সরে পড়লেন মহিলাটি।

এক্সপ্রেস্ ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে তিনজন সুন্দরী এক দাড়িওয়ালা, গোমড়ামুখো লোকের সঙ্গে বসে ছিল। সাইমন আর সেই লোকটা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল অদ্ভুত এক ভাষায়। মেয়েরা সাইমনকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে চায় অথচ সাহস করে বলতে পারছে না। যাই হোক, দুপুরের দিকে একজন এসে জিজ্ঞেস করলে, "জায়গাটার সম্বন্ধে আপনি যা বলেছিলেন তাই সত্যি, কী বলেন? কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ করছি যেন।"

—"কী যে বল, মার্সারিতা তিবানোবা"—বললে সাইমন: "আমি যা বলি সব খাঁটি কথা।....লেজার, শোনো", দাড়িওয়ালাকে ডেকে বললে সে, "সামনেই একটা স্টেশন পড়বে। সেখানে এরা যা চায় কিনে দিও। পঁচিশ মিনিট ট্রেন থামবে।"

এক মুটকী বুড়ীর সঙ্গে আর একটা কামরায় আরও একদল মেয়ে যাচ্ছিল। বুড়ীর খনখনে গলার আওয়াজ, ট্রেনের ঘটাংঘটাং শব্দ,

তার সঙ্গে সঙ্গে তার স্থূল চিবুক আর পীন পয়োধরের দোলন মিলে বেশ একটা ছন্দের সৃষ্টি করেছিল যেন। পোষাক-আষাক আর চেহারাতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এদের জীবিকা কী ? কেউ বেঞ্চির 'পরে শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, কেউ করছিল ধূমপান, আর কেউ বা পিঠছিল তাস। যদিই বা কোনও যাত্রী এদের কোলাহলে বিরক্তি প্রকাশ করেছে অম্নি এদের কুৎসিৎ গালাগাল খেয়ে চুপটি মেরে গেছে একেবারে। আর ছোকরা যাত্রীরা তাদের মদ আর সিগারেট নিয়ে বেশ আলাপ জমিয়ে বসেছিল তাদের সঙ্গে। সাইমনকে দেখে চেনবার উপায়ই নেই এখানে, তার ভাবখানা এমন যেন কে-এক মস্ত মাতব্বর বেরিয়েছেন। তার অধীনস্থ মেয়েরা ছিল নানা দেশীয়,—রুমানীয়ান, ইহুদী, পোল, রুশিয়ান —এই সব। তাদের সব খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে চলে গেল সে। এখানে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক পশু-ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝে নেবে এসে এদের তদারক করে যাওয়া, খাবার বন্দোবস্ত করা, সবই ঠিক চলছে, তারপর আবার নিজের কামরায় গিয়ে বৌকে আদর করা আর নানা রকমের গালগল্প—সে সবও চলছে।

—"খাবার সম্বন্ধে আমার কোনও বাচবিচার নেই ; কিন্তু এখানকার খাবারে আমার বিশেষ আপত্তি।"—ফিরে এসে বলতে লাগল সে : "এখানে তিন রুবল খরচ করে হয়তো কিছু খেলেন, তারপর তার জের পোয়াতে ত্রিশগুণ খরচ হয়ে গেল ডাক্তারের পেছনে।" তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু, সরোচকা, তোমার কিছু খাওয়া দরকার।"

রাঙা হয়ে উঠল সরোচকা সৌভাগ্য-গর্বে, মুখে বললে, "না না না, আমার ক্ষিদে নেই, কিছু খাব না।"

সাইমন কিছু না শুনে একটা ঝুড়ি থেকে মুরগীর মাংস, রুটি, শসা, মদ এই সব বের করে, দু'জনে খানিকটা খেয়ে বাকিটা আবার তুলে রেখে দিলে।

ট্রেন চলেছে ছুটে, উন্মত্ত বেগে গাড়ীর সামনে এসেই আবার উন্মত্ততর বেগে পেছনে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরের গাছপালা।

কন্ডাক্টর এসে সাইমনকে কী যেন ইশারা করতেই, সাইমন বেরিয়ে এল। "ইন্স্পেক্টর এখ্খুনি এখান দিয়ে যাবে, দয়া করে

আপনার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ান একটু।"—বল্লে সে।

"বেশ তো।"

"তা', টাকাটা কি এখন দেবেন?"

"কত?"

"যেমন চুক্তি হয়েছিল, ভাড়ার অর্ধেক,—দুই রুবল, আশি কোপেক।"

"কী!"—চটে উঠল সাইমন, "এ-ত! আমায় বোকা পেয়েছ—না! এই এক রুবল দিচ্ছি, এর বেশি নয়। যাও এখন।"

"মাপ করতে হবে, কথা মতো টাকা দিতে হবে।"

"কথা মতো! মানে? আচ্ছা, এই দেড় রুবল নাও। বেশি কথা বললে এখ্খুনি ইন্স্পেক্টরকে ডাকব। বলব যে বিনা ভাড়াতে ঘুষ নিয়ে তুমি গাড়ীতে লোক চড়াও। আমাকে কচি খোকা পাওনি—বুঝলে?"

ভীষণ চটে উঠল কন্ডাকটর, "দেখে নেব তোমায়, হতভাগা পাজি কোথাকার!"

—"কী!"—গর্জে উঠল সাইমন, "তুমি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! দাঁড়াও, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করছি। তোমায় পুলিশে দেব।"—বলেই গাড়ীর এলার্ম-চেনের কাছে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন কণ্ডাকটর মশাই।

সাইমন এসে স্ত্রীকে বললে: "সারা, এসো, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। কী চমৎকার জায়গাটা!"

অনুগতা সারা তার দামী নূতন পোষাকটা সন্তর্পণে ধরে বেরিয়ে এল।

গোধূলির সোনার রঙ এসে পড়েছে দূরে গীর্জার চূড়ার 'পরে। মেঘে আচ্ছন্ন পাহাড়ের উপরকার শুভ্র গীর্জার চতুর্দিক, মনে হচ্ছে যেন ফুল দিয়ে ঘেরা কী বুঝি উড়ছে আকাশে। উঁচু থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে ছোটবড় বন। নদীর নীল জলে নেয়ে ওঠা শুভ্র গিরি-শৃঙ্গগুলি ছোট ছোট বনেজঙ্গলে ছেয়ে আছে,—গিরিগাত্রে যেন ছোট ছোট সবুজ শিরা-উপশিরা। উপকথার মতো মনোরম প্রাচীন শহরটিকে মনে হচ্ছে যেন ছুটে আসছে ট্রেনখানার দিকে।

ট্রেন থামলে পর কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে সাইমন তার স্ত্রীকে নিয়ে চলল। নারী-বাহিনীর খবরগিরণী সেই স্থূলাঙ্গীকে বললে সে, "ম্যাডাম বারমান, হোটেল আমেরিকা, ইবাস্থকোব স্কোয়া বাইশ।" দাড়ি-ওয়ালাটাকে বল্লে : "লেজার, মনে থাকে যেন, এদের বেশ করে খাইয়ে দাইয়ে কোনও সিনেমাতে নিয়ে যাবে। রাত এগারটার সময় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে। যদি কেউ এর মধ্যে ডাকে আমায়, আমার ঠিকানা তো জানই—হারমিটেজ—দিয়ে দিও। ফোন কোরো, কোনও কারণে সেখানে না থাকলে রেইমান কাফে বা তার উল্টো দিকে যে হীক্র হোটেল আছে, সেখানে যেও, আমায় সেখানে পাবে। যাত্রা তোমাদের শুভ হোক।"

—তিন—

নিজের ব্যবসা সম্বন্ধে হোরাইজন যে-সব গালগল্প ফেঁদে বসেছিল, সবই তার নির্লজ্জ চটুল মিথ্যা কথা। মালপত্রের যে-সব নমুনা দেখিয়েছে সে, তা-ও হলো গিয়ে তার আসল যে ব্যবসা, অর্থাৎ নারীদেহ নিয়ে কারবার, তা চাপা দেবার একটা ফন্দি। সত্য বটে, অনেকদিন—প্রায় বছর দশেক—আগে কোন্-এক অজানা কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে লুকিয়ে চোলাই-করা মদের কারবারে তাকে সারা রুশিয়া চুঁড়ে বেড়াতে হয়েছিল ; সেই থেকেই সে পেয়েছে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মতো তার এই অবাধ সহজ বাকচাতুরী, আর তখনই সে তার আসল কারবারের সংস্পর্শে আসে প্রথম। কী-একটা কাজে তাকে একবার 'রোস্তোব-অন-দন'-এ যেতে হয়েছিল ; সেখানে এক অল্পবয়সী মেয়ে-দরজীকে ফুসলিয়ে বার করে এনে তার সঙ্গে প্রেম চালাতে থাকে সে। মেয়েটার তখনও পুলিশের খাতায় নাম ওঠেনি বটে, তাই বলে দেহমন সম্বন্ধে কোনও সংস্কারের বালাইও ছিল না তার। হোরাইজন তখন তরুণ যুবক—দিলদরিয়া রসিক নাগর ; মেয়েটাকে সঙ্গে করে সে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল—ঘটলও অনেক রোমাঞ্চকর অভাবনীয় কাণ্ড-

কারখানা পথে-প্রবাসে। মাসছয়েক যেতে না যেতেই কিন্তু এল তার অবসাদ—মেয়েটা হয়ে উঠল তার গলার কাঁটা। তা ছাড়া বহুদিন একত্র বসবাসের ফলে যা হয়ে থাকে—ঈর্ষ্যা, অবিশ্বাস, জবরদস্তি, কান্না-কাটি, সবই দেখা দিতে লাগল একে একে।…তারপর ক্রমে ক্রমে সে মারধোরও স্থুরু করে দিলে মেয়েটাকে। প্রথমবার মার খেয়েই একেবারে যেন হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু তারপর থেকেই সে একদম ঠাণ্ডা আর ভারী বাধ্য হয়ে উঠল। এ তো জানা কথাই যে, প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরা কোনও রকমের মধ্যপন্থা মানে না; হয় তারা হবে প্রচণ্ড মিথ্যুক, ছলনাময়ী, কপটী, বিকৃতচিত্ত—অন্তর হবে তাদের কুটিলতা আর কালিমায় অন্ধকার, নয় তারা দেবে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন, হয়ে উঠবে অন্ধ অনুরাগিনী, নির্বোধ, একেবারে একটি পোষা প্রাণী—বুঝবে না নিজের ভালোমন্দ, জানবে না ত্যাগ আর আত্মমর্যাদা-হানির মধ্যে ছেদ টানতে হয় কোথায়। এই মেয়েটি ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের; তাই সামান্ত চেষ্টায়ই হোরাইজন কিছুদিন বাদে তাকে পথে নামালে—বেশ্যাবৃত্তির জন্তে। তারপর যেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে পর মেয়েটা তার প্রথম-রাতের রোজগার পাঁচটি রুবল এনে দিলে তার হাতে তুলে, সেদিন থেকেই হোরাইজন অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল মেয়েটার প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা। আশ্চর্যের কথা এই যে, এর পর থেকে হোরাই-জন যত মেয়েরই সংস্পর্শে এসেছে—আর এসেছে-গিয়েছেও তার হাত দিয়ে কত শত মেয়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই—সর্বদাই তাদের প্রতি তার এই পুরুষসুলভ বিতৃষ্ণা অটুটই রয়ে গেছে। বেচারা মেয়েটাকে তো সে যত রকমে পারে অপমান করতে স্থুরু করে দিলে, সব চেয়ে ব্যথার বিষয়গুলো বেছে বেছে নিয়ে নানা রকমে আরম্ভ করলে তার 'পরে নৈতিক উৎপীড়নও। কথা কইতে পারত না মেয়েটা, নিঃশব্দে কাঁদত কেবল, আর শেষে নতজানু হয়ে সাইমনের হাতে খেত চুমো। তার এই নীরব নতি-স্বীকার হোরাইজনকে করে তুলত আরও অধৈর্য, মেয়েটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিত সে; একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা বাদেই কিন্তু ফিরে আসত মেয়েটা—শীতে কাঁপতে কাঁপতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ভিজে টুপি হাতে করে, জামা-কাপড় থেকে সপ সপ করে জল ঝরছে হয়তো তখন।

শেষে এক নরপিশাচ সাইমনকে পরামর্শ দিলে মেয়েটাকে গণিকালয়ে বেচে দিতে। সাইমনও পেলে একটা নতুন পথের সন্ধান।

বলতে কী, কাজটা বাস্তবিকই উৎরোবে কি না সে বিষয়ে মনে মনে হোরাইজনের দারুণ সন্দেহই ছিল। কিন্তু শেষটায় দেখা গেল, এরই জন্যে যেন সব কিছু বসে ছিল হাঁ করে—এমন চমৎকার ভাবে কিছুই ওৎরাতে পারে না কখনও।

খারকোবের এক গণিকালয়ে গিয়ে প্রস্তাব পেশ করতেই বাড়িউলী রাজি হয়ে গেল। জানত সে সাইমনের কী রকম লোক বশ করবার ক্ষমতা আর কী রকম মজলিশি লোক সে। কিন্তু সব চাইতে মুস্কিল হলো মেয়েটাকে নিয়ে; সে সাইমনকে ছেড়ে কোথাও একদণ্ড থাকতে রাজি নয়; সাইমন পীড়াপীড়ি করাতে সে ভয় দেখাতে লাগল আত্মঘাতী হবে বলে, দেবে এসিড ছিটিয়ে সাইমনের চোখদু'টো কানা করে, নয়তো পুলিশের কাছে গিয়ে করবে নালিশ—আর বাস্তবিকই সাইমনের এমন দু'একটা কাণ্ডকারখানার কথা তার জানা ছিল যা ফাঁস হয়ে গেলে, চাই কী তার গলায় দড়িও পড়তে পারত। বেগতিক দেখে সাইমন অন্যপথ ধরলে। হঠাৎ সে হয়ে উঠল প্রেমে গদগদ, একেবারে যেন প্রাণের দোসর—আদরে সোহাগে মাতিয়ে তুললে সে মেয়েটাকে আবার। তারপর হঠাৎ আবার একদিন ভারী বিমর্ষের ভাণ করে রইল পড়ে; মেয়েটা চিন্তিত হয়ে যতই তাকে জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে, ততই সে যেন গুম হয়ে যায়, যেন এড়িয়ে যেতে চায় তার প্রশ্ন; কখনও হয়তো বেসামাল হয়ে এক-আধটা ভয়ের কথা মুখ থেকে খসিয়ে ফেলেই আবার তক্ষুণি চুপ মেরে যায়! শেষে সুরু করলে সে এলোপাথাড়ি মিথ্যের ছড়াছড়ি—ভীষণ বিপদ তার সুমুখে, অনিবার্য জেল······না, খালি জেল হয়ে চুকে গেলে এমন কী আর এসে যেত···ফাঁসিও হতে পারে···হতে পারে কেন, হবেই নির্ঘাৎ! তবুও যদি মাসকয়েকের মতো গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যেত! হায়, কী ভুলই না করেছে সে! ওরই মধ্যে আবার বিশেষ জোর দিয়েই বলত সে কী-একটা মনগড়া ব্যবসার কথা ······তাতে মন দিতে পারলে নাকি লক্ষপতি হতে পারে সে···এক্ষুণি! এত সব দেখে শুনে মেয়েটা বাস্তবিকই গেল ভড়কে। স্বভাবতঃ সে ছিল

মাতৃজাতি—প্রেমাস্পদের জন্যে তার অন্তরে সেই একান্ত নিঃস্বার্থ নারী-সুলভ স্বর্গীয় শঙ্কার উদয় হলো যার উৎস হচ্ছে নারীর অন্তরতম মাতৃত্ব। চোখের জলে সাইমনকে বিদায় দিলে সে—তারপর দিন গুণতে বসল আবার কবে দেখা হবে! ইতিমধ্যে তার পাসপোর্টখানা বদলে একখানা হলদে টিকিট আনা হয়েছিল, হতভাগী জানতও না তার মানে কী। বাড়ীউলীর কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল দক্ষিণা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সাইমন। চেয়েছিল সে দু'শো—তা' পঞ্চাশেই বা ক্ষতি কী এমন? সবে তো মোটে হাতেখড়ি!

গণিকালয়েই বন্দী হয়ে রইল মেয়েটা। সাইমন তার কথা একদম ভুলে গেল—বছরখানেকের মধ্যেই সে নাকি শতচেষ্টায়ও আর তার মুখখানা মনে আনতে পারত না, কিংবা কে জানে ভাণই করত বুঝি?

রুশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সাইমন এখন নারীদেহের একজন বড়ো ব্যবসাদার। সুদূর কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল্‌ আর আর্জেন্তিনার সঙ্গে চলে তার কারবার। ওডেসার বেশ্যাপল্লী থেকে দলে দলে মেয়েমানুষ চালান দেয় সে কীয়েব-এ, কীয়েব থেকে খারকোব-এ, আবার খারকোব থেকে ওডেসায়। তা' ছাড়া বড়ো বড়ো প্রাদেশিক রাজধানীতেও রয়েছে তার ঘাঁটি। বিরাট এক মক্কেলের দল জুটেছে এসে তার, তাদের মধ্যে রয়েছেন সমাজের অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি—লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এবং বড়ো বড়ো জমিদার আর বণিক গোষ্ঠীর লোক। সারা লাম্পট্য-জগৎটার নাড়ীনক্ষত্র, অন্ধিসন্ধি, গলিঘুঁচি, সমস্তই রয়েছে তার নখদর্পণে—জ্যোতিষীর কাছে যেমন থাকে তারা-ভরা ঐ আকাশখানার খবর! বাড়িউলী, হাফগেরস্ত, দালাল, বাইজী, খেমটাওয়ালী—চেনে না সে হেন কেউ নেই অত বড়ো ঐ অঞ্চলটাতে; আর স্মরণশক্তি তার এমনই প্রখর যে কখনও খাতাপত্রে কিছু টোকাটুকি করতে হয় না তাকে—সে ভালোই বটে তার পক্ষে; হাজার হাজার মেয়ের নাম, তাদের ডাকনাম, বংশপঞ্জী, ঠিকানা, চেহারা, চালচলন, সবই একেবারে কণ্ঠস্থ তার। মক্কেলদের মধ্যে কে কী চায়, কার কেমন মর্জি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে সে; তাদের কেউ কেউ চায় যত সব বিশ্রী মোঙরামি, কেউ কেউ হচ্ছে

অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ কুমারীর জন্যে মুক্তহস্তে ব্যয় করতে উৎসুক, অপর কারও-কারও লোভ নাবালিকাদের প্রতি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মেয়ে জোগাড় করা বড়োই কঠিন, আর বেশ ভয়ের কথাও বটে, কিন্তু এতে করে এক-এক দাঁওয়ে লাভও হয় হাজার হাজার টাকা। সকল রকমের চাহিদারই যোগান দিতে হয় তাকে—কারুকলায় কেউ হচ্ছে নির্মম-নিষ্ঠুর, কেউ বা দুঃখবিলাসী, আবার কারও কারও ঝোঁক হলো যত সব অস্বাভাবিক রকমের যৌন বিকৃতির দিকে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাত সে কচিৎ কখনও—শুধু যখনই বড়ো রকমের দাঁও মারবার নিশ্চয়তা থাকত তখনই। এ জন্যে বারকয়েক জেলও খাটতে হয়েছে তাকে। তাতে তার ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়েই বরং লাভই হয়েছে : বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে তার সাহস, বুদ্ধি, আর আগ্রহ। এ পর্যন্ত সে বারবার পনরবার করেছে বিয়ে; প্রত্যেক বারই নিতে পেরেছে বেশ চলনসই গোছের যৌতুক গ্রহণেরও ব্যবস্থা করে। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, সুবিধে বুঝে একদিন একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে সে, পাত্তা মেলার উপায় রেখে যায়নি কিছুই, আর যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই বৌকে দিয়েছে বেচে—হয় কোন গোপন আড্ডাখানায়, নয় কোনো কায়দাদুরস্ত গণিকালয়ে। কনের বাপ-মা পুলিশে ডায়েরী করে, হুলীয়া বার করিয়ে, তার টিকির নাগালও পায়নি; তখন হয়তো নানান ছদ্মনামে সে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যাবৎ সে এতগুলো ছদ্মনাম ব্যবহার করে এসেছে যে, সময় সময় আসল নামটার 'পরে তার নিজেরই মনে জাগে ঘোর সন্দেহ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তার এ কারবারে অন্যায় বা গর্হিত কিছুই দেখতে পায় না সে। মাছমাংস, আটাময়দা, কাঠকুটো, এই রকম আর পাঁচটা মালের কারবারের মতোই মনে করে সে এটাকে। নিজ রুচি-অনুযায়ী ধর্মেও মতি আছে তার। সময়ে কুলোলে প্রতি শুক্রবারে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই সে যায় সমাজে উপাসনা করবার জন্যে; আর এখন যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেকটি পাল-পার্বণ নিয়মমতো মেনে চলে। সংসারে আছে তার শুধু এক বুড়ী মা আর বুড়ো-থোড়

একটি—থাকে তারা ওডেসায়; নিয়মিত ভাবে না হোক, প্রায়ই সে কিছু কিছু করে তাদের টাকা পাঠায়—তা সে কুর্কস, ওয়ার্জা, সামারা, যেখান থেকেই হোক না কেন। ব্যাঙ্কেও জমে উঠেছে তার প্রচুর টাকা, আর কেবলই বেড়ে চলেছে তা; সুদটুকু পর্যন্ত তাকে ছুঁতে হয় না কখনও। কিন্তু লোভ কি অর্থ-লালসা কাকে বলে তার কিছুই জানে না সে। এ-কারবারে ব্রতী হয়েছে সে শুধু এক ওই কারবারটার বিশেষ কদর, বিপদের ভয়, আর আত্মশ্লাঘার জন্যে। মেয়েমানুষের সম্পর্কে সে হলো একেবারে উদাসীন; তবে সে তাদের বোঝেও বেশ, তাদের দর যাচাই করার একজন মস্ত বড় জহুরী—এ যেন সেই ময়রার মতন যে মিঠাইমণ্ডার ভালোমন্দ বেশ বোঝে কিন্তু নিজেব তার সে-সব তাতে ধবে গেছে অরুচি। যে-কোনও মেয়েকে ভুলিয়ে বশ করতে, ফুসলিয়ে বার করে আনতে, তাকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নিতে, একটুও বেগ পেতে হয় না তাকে; মেয়েরাও যেন তার ডাক শুনলেই সাড়া দিয়ে এসে জমায়েৎ হয়, আর তার হাতে এসে নাচে সব যেন কলের পুতুল! মেয়েদের প্রতি তার ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আর আত্ম-প্রত্যয় রয়েছে যাতে করে চোখের নিমেষে তারা বশ হয়ে পড়ে—বদমাইস ঘোড়া যেমন জব্দ হয় জবরদস্ত সওয়ারের সামান্য একটি মুখের কথায়, চোখের চাউনিতে, কি গায়ে হাত-বুলুনিতে।

নিজের মতো থাকলে মদ সে কখনই খায় না, দলে পড়লেও খায় খুব কমই। খাওয়া দাওয়াতেও তার কোনো আগ্রহ নেই। যা-কিছু দুর্বলতা রয়েছে তার স্বভাবে সে হলো ওই এক পোষাক-আষাক নিয়ে—সাজে সে সদাসর্বদা পরিপাটী করে, ফুলবাবুটি যেন।

বৌকে নিয়ে সোজা চলে এল সে হারমিটেজে। দু'জনেরই সাজ-পোষাক খুব পরিপাটী। সাইমনের হাতে রূপো-বাঁধানো এক বেতের ছড়ি, হাতলে তার বসানো রয়েছে এক নগ্ন নারীমূর্তি।

বিশালকায় এক দ্বারী জিজ্ঞেস করলে, "এখানে থাকবার ছাড়পত্র নিশ্চয়ই আছে আপনার কাছে?"

"আঃ, জাভার! বারবার সেই একই কথা—'ছাড়পত্র!'"—বলে স্ফূর্তির ঝোঁকে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে সাইমন, "সব শুদ্ধ দিন

তিনেক থাকব। কাউণ্ট ইপাটিয়েবের সঙ্গে দেনাপাওনার চুক্তিটা হয়ে গেলেই সোজা চলে যাব। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন! সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাকো তোমরা। আর দেখো, তোমার জন্তে কেমন একটি খেলনা এনেছি ওডেসা থেকে। ভারী খুশী হবে দেখে।"
—বলেই চট করে লোকটার থাবার মধ্যে গুঁজে দিলে সে একটি মোহর। তারপর ঘরে ঢুকে সব ঠিকঠাক করে নিয়েই চাকরকে ডেকে একসঙ্গে একেবারে ছ'-ছ'জোড়া জুতো বার করে দিয়ে বল্লে, "ওরে, সব ক'জোড়া এক্ষুণি পালিশ করে নিয়ে আয়, একেবারে যেন আর্শির মতো ঝকঝক করতে থাকে—বুঝলি? তোর নাম তিমোথী—না? তবে তোরও তো আমাষ চিনতে পারার কথা। তা দেখ, তিমোথী, আমার কাছে কাজ করলে সে অমনি যাবে না। সাবধান, মনে থাকে যেন একেবারে আয়নার মতো পালিশ হওয়া চাই!"

—চার—

তিনদিন তিনরাত্রের বেশি হোটেল-হারমিটেজে থাকেনি হোয়াইজন; তারই মধ্যে দেখা করেছে সে আন্দাজ শ'তিনেক লোকের সঙ্গে। তার পদার্পণে শহরময় যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। তার কাছে আসত চাকরবাকরদের কাজ জুটিয়ে দেবার আপিসের মালিকরা, সস্তা হোটেলের কর্ত্রীরা, মেয়েমানুষের দালালিতে চুল পাকিয়েছে এমন সব লোক, আরও কত কে!

এখানে এসে পৌঁছুবার ঠিক পরদিনই সে গেল ছবিওয়ালা মেৎজের-এর দোকানে; সঙ্গে তার এক গৌরাঙ্গী মেয়ে—বেলা। তার সঙ্গে নানান ছাঁদে শুয়েবসে খানকয়েক ছবি তোলালে সে। প্রত্যেকটি ছবির জন্তে পেলে সে তিন রুবল করে দক্ষিণা; মেয়েটাকে কিন্তু শুধু এক রুবল দিয়েই দিলে বিদায় করে। তারপর গেল সে বারসুকোবার সঙ্গে দেখা করে আসতে।

এই বারসুকোবা মেয়েমানুষটা আসলে ছিল যাকে বলে 'বৃদ্ধবেশ্যা

তপস্বিনী।' তার জুড়ি মেলে শুধু এক দক্ষিণ-রুশিয়াতেই ; না-ছিল সে পোল, না-ছিল রুদে রুশিয়ান ; বয়সও মন্দ হয়নি তার, তবে তারই মধ্যে এত টাকা কামিয়ে ফেলেছে সে যে এখন দিব্যি কোথেকে বেশ সুশ্রী আর ভালোমানুষ গোছের এক পোলকে বর বলে ধরে নিয়ে এসে পুষছে, আর দু'জনে মিলে চালাচ্ছে এখন একটা মার্চের মজলিশ। হোরাইজন আর বারসুকোবা পুরোনো বন্ধুর মতোই আলাপ করতে লাগল ; তাদের সে-সব কথাবার্তার মধ্যে না-ছিল ভয়ডর, না-ছিল লাজলজ্জা, কি বিবেকবুদ্ধির বালাই।

—"মাদাম বারসুকোবা, তোমায় আমি খাসা মালের যোগান দিতে পারি—তিন-তিনটে মেয়ে : একটা হলো শ্যামবর্ণ, ভারী শান্ত ; আর একটা বেশ ছোট্টখাটো ফর্সা মেয়ে, বুঝতেই পারছ সব তাতেই রাজি সে ; আর একটা হচ্ছে এক 'রহস্যময়ী নারী,' খালি হাসে, কোন কথা কয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে ঢের কাজ আদায় হবে,—আর হ্যাঁ, সুন্দরীও বটে মেয়েটা।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তার দিকে চেয়ে বসে বসে মাথা নাড়ছিল মাদাম বারসুকোবা। "তুমি কি বোকা বোঝাতে চাও আমায়, মিঃ হোরাইজন? সেবার যা করেছিলে এবারও কি সে রকম কিছু করতে চাও?"

—"হায় ভগবান! এই করেই দিনগুজরান করি আমি, আর আমিই তোমায় ঠকাব! যাক্ গে, আসল কথা সেটা নয়। তোমায় আমি একটি বেশ লেখাপড়া জানা মেয়েও দিচ্ছি। তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই কোরো। খুব সম্ভব সমজদার লোকই খুঁজে পাবে তুমি।..."

চতুরের হাসি হাসে বারসুকোবা। "কের একটি বৌ?"—জিজ্ঞেস করে সে।

—"না, তবে বনেদী ঘরের মেয়ে।"

—"না বাপু, পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে আবার।"

—"কী যে বল! তোমার কাছে তো বেশি দাম চাইতে পারিনে। মোটে এক হাজার রুবল পেলেই তিনটেকে ছাড়তে পারি।"

—"বটে? তবে সিধে কথায় এসো—পাঁচশো।...আর ঝক্কি পোয়াতে পারব না, বাপু।"

—"দেখো, মাদাম বারসুকোবা, এই আমাদের নতুন কারবার নয়। তোমায় ঠকাব না আমি, সিধে নিয়ে আসছি আমি মেয়েটাকে, কিন্তু মিনতি করে বলছি ভুলে যেও না যে তুমি হলে আমার মাসী, আর বরাবর ঠিক সেই চালেই চলবে তার সামনে। তিন দিনের বেশি থাকব না আমি শহরে।"

খুশীর হাসিতে একসঙ্গে দুলতে থাকে মাদামের বুক, পেট, আর থুৎনি। "খুঁটিনাটি নিয়ে দরদস্তুর করব না আমরা—বিশেষ যখন আমরা কেউ কাউকেই ঠকাব না। আজকাল মেয়েদের চাহিদা খুব—তা তুমি একটু মদ খাবে?"

—"ধন্যবাদ।"

তারপর তারা অন্য কথা পাড়ে। যথা—'বছরে কত আয় হয় তোমার?"

—"কত আর, বারো থেকে কুড়ি হাজার। তা ঘোরাঘুরিতেও তো কত খরচ হয়ে যায়।"

—"কিছু জমাতে পার না?"

—"যৎসামান্য। বছরে মোটে দু'তিন হাজার।"

—"আমার তো ধারণা ছিল তার বেশি—দশবিশ হাজার—"

কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? মনে মনে সাবধান হয়ে উঠে হোরাইজন।

আনা মিখাইলোব্না (বারসুকোবা) বিদ্যুতের ঘণ্টা টিপে পরিচারিকাকে ডেকে কয়টা ক্রীমরোল আর এক বোতল শ্যাম্পেন আনতে বলে দেয়; হোরাইজনের রুচি অরুচি জানা আছে তার। তারপর জিজ্ঞেস করে সে, "তুমি মিঃ শেপ্‌শেরোবিচ্‌কে চেন?"

একেবারে যেন লাফিয়ে ওঠে হোরাইজন।

—"শেপ্‌শেরোবিচ্‌! হা ভগবান! কে না চেনে তাঁকে। মানুষ নন তিনি—একেবারে একটি দেবতা, অদ্ভুত প্রতিভাশালী লোক!" ক্ষেপে ওঠে হোরাইজন, ভুলে যায়, যে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকে সে: "শুধু একটিবার ভেবে

দেখো গত বছর কী করেছেন শেপশেরোবিচ্‌! কব্‌নো, বিল্‌নো, আর ঝিতুমির থেকে একেবারে ত্রিশ-ত্রিশজন মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি সিধে আর্জেন্তাইনে। প্রত্যেকটিকে বেচে দিলেন তিনি এক-এক হাজার রুবলে—দেখো হিসেব করে, মাদাম,—মোট হলো ত্রিশ হাজার রুবল! তাতেই কি ঠাণ্ডা হয়েছেন না কি শেপশেরোবিচ্‌? এই টাকা দিয়ে, তাঁর যাতায়াতের খরচা মেটাবার জন্যে, জনকয়েক নিগ্রো মেয়েকে কিনে আনলেন তিনি; তারপর দিলেন তাদের বিলি করে মস্কো, পিটার্সবার্গ, কীয়েব, ওডেসা, আর খারকোব-এ। তবে জানোই, তো মাদাম, মানুষ নন তিনি, একেবারে একটি শকুনী। হ্যাঁ, তবে ওই একটা লোকই যে ব্যবসা বোঝে!"

সোহাগ করে হোরাইজনের হাঁটুর 'পরে হাত রাখে বারসুকোবা; এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে, তাই বেশ সহৃদয়তা মাখানো স্বরে বলে: "আমিও বলি কী মিঃ……হ্যাঁ, তোমার এবারকার নামটি কী জানিনে তো……"

—"হোরাইজন, ধরোই না……"

—"আমি, ভাই, বলি কী, মিঃ হোরাইজন, তুমি জনকয়েক কুমারী মেয়ের জোগাড় করতে পার? এদের চাহিদা আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে। টাকার কথা ভেবো না, তাতে এলব না আমরা। এই হলো এখনকার দস্তুর। দেখো, হোরাইজন, তোমার এই সব মেয়ে-মক্কেলদের ফের একেবারে আগেকার মতো অক্ষত অবস্থায়ই ফেরৎ পাবে তুমি। বুঝতেই তো পারছ—এ হচ্ছে একটু ইতরোমো আর কী—ঠিক এর মানেও বুঝিনে, বাপু……"

নীচের দিকে চেয়ে, কপালটা একটু রগড়ে নিয়ে হোরাইজন বলে: "দেখো, আমার এক বৌ আছে……তুমি প্রায় তা' আন্দাজ করেই ফেলেছ দেখছি।"

—"তাই। আবার 'প্রায়' কেন?"

—"খুলে বলতে লজ্জাই করছে যে সে—কী বলব গিয়ে—সেটি ঐ বাবৎ আমার বিয়ের কনে হয়েই রয়েছে……।"

খুসিতে হেসে গড়িয়ে পড়ে বারসুকোবা।

—"দেখো, হোরাইজন, আমি একদম ভাবতে পারিনি যে, তুমি এমন নরকের কীট হতে পার। বেশ তো, তোমার বৌকেই দাও না আমাদের কাছে। সে ঐ একই কথা। কিন্তু এও কি সম্ভব যে তুমি ছোঁওনি তাকে ?"

—"এক হাজার ?"—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করে হোরাইজন।

—"আঃ, কী আপদ! বেশ তো, হাজারে বেজার নই আমি। কিন্তু কথা হচ্ছে কী, সামাল দিতে পারব তো তাকে ?"

—"বাজে কথা।"—দৃঢ়স্বরে বলে হোরাইজন: "এ কথা ভুলে গেলে চলবে কেন যে তুমি হলে আমার মাসী, আর তোমার কাছে আমি বৌকে রেখে যাচ্ছি। একবার ভেবে দেখো—মেয়েটা একেবারে পোষা মেনি বেড়ালটির মতো ভালোবাসে আমায়। তাকে যদি বল যে আমারই ভালোর জন্যে তাকে এই এই করতে হবে তো তার দিক থেকে কোনই কথা উঠবে না।"

ব্যস! আর কিছুই বলা-কওয়ার দরকার রইল না। মাদাম বারসুকোবা একখানা প্রমিসারী নোট নিয়ে এসে বহু কষ্টে তার 'পরে নিজের নাম, বাপের নাম, আর এর আগের বার তার নিজের যে নাম ছিল তা লিখে হোরাইজনের হাতে দিলে। প্রমিসারী নোটখানা অবশ্য বানানো; তবে চোর-ছ্যাঁচড়দের মধ্যে কথার খেলাপ হয় না। এসব কারবারে কেউ ঠকায় না কাউকে। ঠকালে অনিবার্য মৃত্যু। কয়েদ-খানায়ই হোক, পথঘাটেই হোক, কি বেশ্যাবাড়ীতেই হোক—সর্বখানেই এই একই নিয়ম।

পরমুহূর্তেই, যেন এক গুপ্তদুয়ার ভেদ করে বিভীষিকা-মূর্তির মতো সেখানে হঠাৎ এসে আবির্ভূত হলেন এক তরুণ পোল,—গোঁফজোড়া উঁচু করে পাকানো তাঁর। লোকটা হলো গিয়ে মাদাম বারসুকোবার প্রাণের দোসর, তার স্বামী, আর তাদের সেই নাচঘরের মালিক। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে মদ খেতে লাগল, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগল এটা-সেটা নিয়ে দু'একটা কথা—বিশেষ করে ব্যবসা-সংক্রান্ত গোল-যোগের কথা। তারপর হোরাইজন হোটেলে নিজের ঘরে টেলিফোঁ করে বৌকে ডেকে আনলে। এসে পৌঁছুলে পর তার সঙ্গে মাসী আর

মার্গারীর কুটুমের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললে, "গোপন রাজনৈতিক কারণে এখুনি আমায় শহর ছেড়ে যেতে হচ্ছে।" তারপর মমতাভরে সারাকে চুমো খেয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, দিব্যি গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল সে।

—পাঁচ—

হোরাইজনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই (ভগবান জানেন লোকটার আসল নাম কী) ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের একে একে সব কিছুই যেন যেতে লাগল উল্টে। সুরু হলো প্রচণ্ড রদবদল, ওলট্‌পালট্‌। ত্রেপেল থেকে চালান হয়ে মেয়েরা সব আসতে লাগল আনা মারকোব্‌নার আস্তানায়, আবার সেখান থেকে অনেকে এসে ঠেকল হয়তো কোনও এক-রুবলের বাড়ীতে, আর এক-রুবলের বাড়ী থেকে চালান হয়ে এল সব আধ-রুবলের বাড়ীতে। উঁচুতে উঠতে পেল না কেউই, নীচুতেই নামতে লাগল সব একে একে। এই রকমের প্রত্যেকটি রদবদলে হোরাইজন উপায় করত পাঁচ থেকে একশ' করে রুবল। লোকটার উৎসাহ ছিল যেন প্রায় ঐ ইমাত্রার জলপ্রপাতেরই মতো।

দিনের বেলা। আনা মারকোব্‌নার বাড়ীতে বসে সিগ্রেট ফুঁকছে হোরাইজন, আর পায়ের 'পরে পা রেখে এক পা দোলাচ্ছে অনবরত। সিগ্রেটের ধোঁয়ার জন্যে চোখদুটো টেরা করে বলে উঠল সে,—"মানে কথাটা হচ্ছে……সেই একই সোন্‌কাকে নিয়ে কী আর করবে তোমরা? এসব সভ্যভব্য জায়গায় ঠাঁই নেই ওর। তার বদলে ওকে যদি ভাঁটার টানে ছেড়ে দাও তো তোমরা ছাঁকা একশোটি রুবল এক্ষুণি কামাতে পার,- আমিও পাই গোটা পঁচিশেক রুবল। আচ্ছা, খোলাখুলিই বলো না আমায় ওকে কে আর এমন পোঁছে এখানে আজকাল?"

—"মিঃ শাৎস্কি, তোমার সঙ্গে কথায় পারবে কে বলো! কিন্তু বুঝে দেখো মেয়েটার জন্যে মায়া হয় আমার। এমন লক্ষ্মী মেয়েটি……

ভাবতে লাগল হোরাইজন। একটা সময়োপযোগী প্রবচন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। —"টোল টোল টুলুনি, সাবড়ে দে রে এখুনি।...আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাদাম শোইবেস, এ মাল এখন একদম অচল।"

ইসাইয়া সাবিচ্ দেখতে ছোটখাটো, রোগা-পটকা, ঘ্যানঘেনে বুড়ো-মানুষটি হলে কী হয়, দরকারী কাজের বেলায় ভারী একবগ্গা লোক সে। হোরাইজনের সঙ্গে সায় দিয়ে বল্লে সে,—"এ তো সিধে কথা। সত্যিই, একদম অচল হয়ে পড়েছে ছুঁড়ীটা। ভেবেই দেখো না, আম্নেচ্কা, মাগীর পোষাক-আষাকে খরচা পড়ছে পঞ্চাশ রুবল, মিঃ শাৎস্কি নেবেন পঁচিশ, আর বাদবাকি পঞ্চাশ রুবল তোমার আর আমার। ভগবানের অপার মহিমা, ছুঁড়ীর দায় থেকে রেহাই পাওয়া গেল—অন্ততঃ ওর জন্যে আর খরচা পোয়াতে হবে না।"

এই রকম হতে হতে বেচারী সোন্কা শেষে এক-রুবলের বাড়ী থেকে বদলি হয়ে এল আধ-রুবলের এক বাড়ীতে। সেখানে যত রাজ্যের সব ইতর লোক খেয়ালমাফিক মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সারা রাত। এসব ক্ষেত্রে যা হচ্ছে একান্ত প্রয়োজন তা' হলো অপরিমিত স্বাস্থ্য আর অসম্ভব রকমের স্নায়বিক শক্তি। এক রাতে থেক্লা বলে পর্বতপ্রমাণ এক মেয়েমানুষ—তা ওজনে কিছু না হোক কম-বেশি আড়াই মণ তো হবেই—এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এয়েছে বারান্দায় —সেখানেই কী একটা দৈহিক গ্লানি লাঘব করবে বলে, এমন সময় বাড়ীউলী সে দিক দিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে: "গিন্নীদি, ভাই, শোনো—ছত্রিশ নম্বরের খদ্দের!......ভুলে যেও না যেন!" দেখেশুনে সোন্কা বেচারীর হাত-পা তো পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলো।

তা' সোন্কার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে তাকে বিশেষ কেউ বিরক্ত করে না এখানে। এখানকার পক্ষেও সে ছিল বড্ড সাদাসিধে। বড়-কেউই একটা তার ডাগর ডাগর চোখদু'টির দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। নেহাৎ আর কেউ হাতের কাছে না থাকলেই লোকে এসে তাকে নিয়ে যায়।

নেমান এখানে এসেও খুঁজে বার করলে তাকে, আর সেই থেকে

প্রতি সন্ধ্যায় সে এখানেই আসে। কিন্তু ভীরুতাই হোক, আর হীনরুচির জন্যেই হোক, কিংবা কে জানে হয়তো দৈহিক ঘৃণাবশতঃই হবে, মেয়েটিকে সে এ বাড়ী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে চেষ্টাও করেনি কোনদিন। সারারাত ধরে তার পাশটিতে গিয়ে বসে থাকে সে, আর দৈবাৎ কখনও কোনও খদ্দের এসে সোনকাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলে, আগের মতোই তার ফিরে আসার অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে বসেও থাকে। আর সোনকা ফিরে এলেই সেই চিরন্তন দৃশ্যের অবতারণা—ঈর্ষ্যা, ভর্ৎসনা, তিরস্কার! তবু প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সে মেয়েটাকে, আর দিনের বেলায় ওষুধের দোকানের কোণটিতে বসে বড়ি তৈরি করতে করতে একটানা তারই কথা ভেবে ভেবে সারা হয়ে যায় বেচারা।

—ছয়—

শহরতলির এক কাবারেৎ। ঢুকতেই রং-বেরঙের বিজলী-বাতি দিয়ে তৈরি একটি কৃত্রিম পুষ্পস্তবক, তারপর দু'ধারে এই রকম আলো দিয়ে তৈরি চাওড়া আর্চ—আস্তে আস্তে সরু হয়ে একেবারে বাগানের মাঝখানটিতে এসে শেষ হয়েছে। আর একটু এগিয়ে এলে হলদে বালি-ছড়ানো চওড়া এক স্কোয়ার; বাঁদিকে একটি খোলা মঞ্চ, একটা থিয়েটার আর এক চাঁদমারি; সোজা নাক বরাবর চলো গিয়ে মিলিটারী ব্যাণ্ডের এক আস্তানা (ঝিনুকের মতো করে তৈরি), আর সারি সারি বীয়ার আর ফলের স্টল; ডাইনে রেস্তরাঁর লম্বা চাতাল। উঁচু উঁচু থামের গায়ে গোল গোল বিজলী বাতি; তা' থেকে আলো এসে পড়ায় নীচে ছোট স্কোয়ারখানিকে ফ্যাকাশে, শাদা-ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। তারের জাল দিয়ে ঘেরা ঘসা-কাঁচের গায়ে গায়ে মেঘের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে পড়েছে দেওয়ালী পোকা, আর নীচে মাটির 'পরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এলোমেলো হয়ে নড়াচড়া করছে তাদের ছায়া। ক্ষুধার্ত মেয়ের দল ভারী সৌখিন কায়দায় কিম্ভুত-

কিমাকার বেশে সেজে, বলতে গেলে আদুড় গায়েই, জোড়ায় জোড়ায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে সেখানে—তাদের কেউ বা চোখেমুখে একটা নিরুদ্বেগ হাসিখুসির ভাব টেনেবুনে বজায় রাখবার চেষ্টা করছে, কেউ বা করছে মানিনীর ভাণ, কেউ কেউ দেখাচ্ছে অগম্যা নারীর অসন্তোষের ঠাট,…কিন্তু চলাফেরা করছে সবাই ক্লান্ত পায়ে—টেনে টেনে।

রেস্তরাঁর সবগুলো টেবিলই এখন জোড়া;—তার 'পরে ভেসে বেড়াচ্ছে শুধু কাঁটা-চামচে-প্লেটের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ আর পাঁচমিশালী ভাষায় গালগল্পের ঢেউ। নাকে আসছে পাকশালার মোগলাই খানার খোসবু। মাঝখানটাতে একটা একটু উঁচু-মতন জায়গাতে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে রেস্তরাঁর একদল রুমানিয়ান বাজনদার; পরনে তাদের লাল রঙের ফ্রক, গায়ের রঙ ময়লা, দাঁতের পাটী সব মড়ার মতো শাদা, মুখের গড়ন দেখলে মনে হয় মুখময় লম্বা লম্বা রোঁয়াভর্তি একপাল বনমানুষকে বেশ করে পমেড মাখিয়ে রোঁয়াগুলো পাট করে নাবিয়ে দিয়ে সেখানে এনে কে যেন ছেড়ে দিয়ে গেছে। বাজনদারদের পালের গোদা সুমুখপানে ঝুঁকে নানা ঢঙে অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বেহালা বাজাচ্ছে—আর অসভ্যের মতো এমন মিঠে মিঠে করে চোখ ঠারছে সকলের দিকে চেয়ে যে, লোকটাকে দেখে মনে হয় আস্ত একটি পুরুষ-বেশ্যা। আর এই অনাবশ্যক অপরিমিত আলোর খেলা, সুরের মেলা, মহিলাদের প্রসাধনের বৈচিত্র্য, সুগন্ধির তীব্র সৌরভ—সব কিছু মিলে একাকার হয়ে এক বিরক্তিকর, নির্বোধ, উন্মত্ত বিলাসের অযথা প্রলাপ সৃষ্টি করেছে।

ওপরে সমস্ত হলঘরখানার চারিদিক ঘিরে খোলা গ্যালারী; তারই সুমুখে মাঝে মাঝে এক-একটি নিরালা কুঠুরীর দরজা—যেন ছোট ছোট অলিন্দের সম্মুখে এক-একটি ঘরের দুয়ার। এই রকমেরই একটা কুঠুরীতে বসে আছেন চারজন—দু'জন মহিলা আর দু'জন ভদ্রলোক; একজন হলেন রুশিয়ার বিখ্যাত বাইজী রোবিনস্কায়া—বেশ দোহারা গড়ন, সুন্দরী, মিশরীদের মতো টানা টানা সবুজে চোখ, লম্বাটে লালচে লালসাদীপ্ত মুখখানি, বাঁকা ঠোঁটের কোণে পরুষভাব। আর একজন

হচ্ছেন ব্যারনেস তেফ্‌তিঙ, দেখতে ছোটখাটো, চমৎকার, ফ্যাকাশে মতন—বাইজীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ান তিনি। পুরুষ দু'জনের মধ্যে একজন হলেন বিখ্যাত উকিল রীয়াজানোব, আর একজন হচ্ছেন বোলোদিয়া শ্চাপ্‌লিন্‌স্কি—তরুণ, ধনবান, বিলাসী লোক, সৌখিন গীত-রচয়িতা, লিখেছেনও গোটাকয়েক মিঠে মিঠে ছড়া আর হাল-আমলের বিষয় নিয়ে বিস্তর নক্সা ; শহরময় সে-সব লেখার চলতিও হয়েছে বেশ।

ঘরের মধ্যে দেয়ালের গায়ে লাল রঙের পালিশ আর সোনালি-রঙের নক্সা। টেবিলের 'পরে শামাদানে জ্বলছে আলো আর তাঁর ক্ষীণ সোনালী আভা এসে মদের পাত্রের 'পরে পড়ে করছে ঝিকৃমিক্। বাইরে দরজার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরাইখানার একজন ওয়েটার। আর পরিচারক মশায় ডানহাতের কড়ে আঙুলে এক টুকরো হীরে-বসানো আঙটি পরে হাত ঘোরাতে ঘোরাতে এসে মাঝে মাঝে এ-দরজা সে-দরজায় থমকে দাঁড়াচ্ছেন আর এক কান বাড়িয়ে মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছেন কী কাণ্ড চলেছে ভেতরে।

ব্যাবনেস তাঁর অপেরা গ্লাসের ভেতর দিয়ে অলস দৃষ্টিতে নীচেকার ভীড় দেখছেন। রঙবেরঙের পোষাক-পরা মেয়েদের মধ্যে একই ছাঁদের পুরুষদের দেখে মনে হয় যেন একপাল বড়ো বড়ো কালো কালো গুবরে পোকা নেপটে রয়েছে সেখানে। রোবিনস্কায়া তাচ্ছিল্যভরে হলেও বেশ মনোযোগ দিয়েই স্ট্যাণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে দর্শকদের সবাইকে দেখছিলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠছিল শ্রান্তি, অবসাদ, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সেই রকমের এক পরম পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তি যা যে-কোনও দৃশ্যেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। বাঁ হাতের লম্বা লম্বা সুন্দর সুন্দর নরম নরম আঙুলগুলো তাঁর সিঁদুরের মতো লাল মখমল-মোড়া বক্স-সীটের 'পরে অলস ভাবে ঝিছিয়ে পড়ে আছে, আর সে আঙুলগুলোয় দুর্লভ মনোহর মরকতমণি এমনই হেলাভরে শোভা পাচ্ছে যে দেখে মনে হয় যে-কোনও মুহূর্তেই বুঝি বৃন্তচ্যুত ফলের মতো তা আঙুল থেকে খসে পড়ে যাবে। হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে দিলেন তিনি ; হাসতে হাসতে বললেন :

দেখো, দেখো! কী অদ্ভুত দেখতে, বরং যথার্থ বলতে গেলে, কী অদ্ভুত কারবার! ঐ যে, ওখানে, যে লোকটা বাজাচ্ছে ওই 'সপ্তছিদ্র বাঁশরী মোর'।"

সবাই ফিরে চাইল সেদিকে। বাস্তবিক সে একটা দেখবার মতো কাণ্ডই ছিল বটে। রুমানিয়ান বাজনদারদের পেছনে মোটাসোঁটা এক গোঁপওয়ালা বুড়ো—হয়তো কোন এক মস্ত বড়ো সংসারের বাপ কি ঠাকুর্দা হবে—বসে প্রাণপণে একসঙ্গে জড়ানো সাত-সাতটা বাঁশি ফুঁ দিয়ে বাজাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রটাকে ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে চোখের নিমেষে ঘোরানো ফেরানো তার পক্ষে শক্ত বলে লোকটা করেছে কী—অসম্ভব রকমের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের মাথাটাকেই বোঁ বোঁ করে ডাইনে-বাঁয়ে চলেছে ঘুরিয়ে।

"চমৎকার কাণ্ড তো!"—বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া: "আচ্ছা, শ্লাপ্‌লিন্‌স্কি, তোমার মাথাটা ওম্নি করে ঘোরাও তো দেখি।"

বোলোদিয়া শ্লাপ্‌লিন্‌স্কি গোপনে গোপনে রোবিনস্কায়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন; তাই তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে বেশ আগ্রহভরেই হুকুম তামিল করতে বসে গেলেন, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই থেমে পড়ে বললেন, "নাঃ, এ অসম্ভব, হয় বহুকালের অভ্যাস, নয় বংশগত ক্ষমতার দরকার এর জন্যে।"

ব্যারনেস এতক্ষণ অবধি বসে বসে একটা গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মদের পাত্রে জমা করছিলেন; এখন কষ্টে একটা হাই চেপে মুখখানা সামান্য একটু বেঁকিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "কিন্তু, হা ভগবান! কী কষ্ট করেই না ওরা আসে আমাদের ক—তে একটু ফুর্তি করতে! ঐ দেখো: হাসি নেই, গান নেই, নাচ নেই। ঠিক যেন একপাল গোরু-ছাগলকে জবরদস্তি করে তেড়ে এনে ঢোকানো হয়েছে এখানে।"

আলস্যভরে মদের গেলাস ঠোঁটে তুলে এক চুমুক দিয়ে স্নীয়াজানোব তাঁর মধুরকণ্ঠে উদাসীন ভাবে বল্লেন, "তবে তোমার পারী কি নীস-এ কি এর চেয়ে আমোদ বেশি? কেন, এ কথা মানতেই হবে যে তারুণ্য, হাসি, আনন্দ, সবই চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে গেছে মানুষের জীবন থেকে, ও সব যে আর কখনও ফিরে আসবে তার সম্ভবনাও বিশেষ কিছু

নেই। আমার তো মনে হয়, আরও অনেকখানি ধৈর্য নিয়ে মানুষকে বিচার করা উচিত। এই যারা আজ সন্ধ্যায় এখানে এসে ঐ বসে আছে তাদের সবার হয়তো এই একটু সময়ের জন্যেই বিশ্রামের অবকাশ মিলেছে—কে জানে ?"

—"এই সুরু হলো ওদের পক্ষ-সমর্থনের বক্তৃতা,"—বলে উঠলেন শ্যাপ্‌লিন্‌স্কি তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে।

চোখের পলকে রোবিনস্কায়া তাঁদের দু'জনের দিকে ফিরে চাইলেন, টানা টানা চোখদুটি তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। এ ছিল তাঁর ক্রোধের নিশানা, তার সুমুখে রাজকুমারদেরও সময় সময় মতিভ্রম ঘটত। যা'হোক চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন তিনি :

—"তোমরা কী যে সব বলছ আমার মাথায় ঢুকছে না কিছুই। কেন যে এখানে এসেছি আমরা তা-ও বুঝতে পাচ্ছিনে আমি। সারা দুনিয়ায় দেখবার মতো জিনিস তো আর খুঁজে পাইনে। নিজের কথা বলতে, সেবিল, মাদ্রিদ, আর সাঁ সেবাস্তিয়েন-এ আমি দেখে এসেছি ষাঁড়ের লড়াই—তা' দেখে এক ধিক্কার ছাড়া আব কোনও ভাবেরই উদয় হয় না অন্তরে। কুস্তি দেখেছি, মুষ্টিযুদ্ধ দেখেছি—কুশ্রী পাশবিকতা সে সব। তারপর বাঘ-শিকারে যাবারও সুযোগ হয়েছিল আমার ; ছিলাম আমি মস্ত বড়ো একটা শিক্ষিত শ্বেতহস্তার পিঠের 'পরে হাওদার মধ্যে···এককথায় তোমাদের সবারই তো এ-সব জানা কথা। আমার সেই উদার, বহুবিচিত্র, কলরবমুখর জীবন যা আমি আজ পশ্চাতে ফেলে রেখে এসেছি তা' থেকে···"

—"আহা, কী যে সব বলছ, এলেনা ভিক্তোর্‌ভ্‌না !"—সস্নেহ ভৎসনার সুরে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন শ্যাপ্‌লিন্‌স্কি।

—"স্তোকবাক্য ছাড়ো এখন, বোলোদিয়া ! আমি জানি যে আমার দেহে যৌবন-শ্রী এখনও অটুট রয়েছে ; তবুও মাঝে মাঝে মনে হয় যেন একেবারে নব্বই বছরের থুনথুনে বুড়ীটি বনে গেছি ; অন্তরাত্মা আমার এমনই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। বেঁচে নেই—টিকে আছি শুধু। সারা জীবনে মাত্র তিনটি ঘটনা আমার অন্তরতম অন্তরে মুদ্রিত হয়ে

রয়েছে। প্রথমটা ঘটেছিল আমার বালিকা-বয়সে। একদিন পরম আতঙ্ক আর চরম ঔৎসুক্য নিয়ে দেখছিলাম, চোরের মতো পা টিপে টিপে একটা বেড়াল শিকার ধরবার জন্যে একটা মস্ত চড়ুই পাখির দিকে এগিয়ে আসছে, আর চড়ুইটাও সাবধানে তার গতিবিধির নিশানা রাখছে। আজও ঠিক করে বলতে পারিনে কোনটায় আমার মন টেনেছিল বেশি— বেড়ালের শিকার ধরবার কৌশল, না পাখীটার ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাবার কায়দা। চোখের পলকে উড়ে গিয়ে পাখীটা সামনের গাছের ডালের 'পরে বসে তার কিচিরমিচির ভাষায় বেড়ালটাকে উদ্দেশ্য করে এমন অকথ্য গালাগাল করতে লাগল, যে তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম আমি। আর বেড়ালটা তখন, যেন তারই 'পরে কত অন্যায় করা হয়েছে এমন ভাবখানা করে, দিব্যি লেজ উঁচিয়ে এমন ভাণ করতে লাগল যে ও আর এমন ভুল কী হয়েছে! আর একবার এক পার্টিতে একজন নামকরা গায়কের সঙ্গে আমায় ডুয়েট গাইতে হয়েছিল।"

—"কার সঙ্গে?" —ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন ব্যারনেস।

—"নামে কী এসে যায়? কী করবে নাম দিয়ে? যাক গে, দু'জনে মিলে গাইতে গাইতে হঠাৎ আমার সারা অঙ্গ কাঁপিয়ে যেন প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল! দু'জনের কণ্ঠস্বর কোন্ এক অভাবনীয়ের স্পর্শে কেমন করে যেন এক অশ্রুতপূর্ব ঐকতানে মিশে এক হয়ে গেল। অবর্ণনীয় সে অনুভূতি। আহা! সারা জীবনে বোধহয় একবারই এমনটি ঘটে থাকে। ভূমিকায় আমার এক জায়গায় কান্নার কথা ছিল, সেদিন সেখানে সত্যি-সত্যিই অকপটে অশ্রু বিসর্জন করেছিলাম আমি। যবনিকা পতনের পর তিনি যখন আমার পাশে এসে তাঁর বিশাল করপল্লব আবেগভরে আমার মাথায় বুলোতে বুলোতে মোহন উজ্জ্বল হাসি হেসে বল্লেন, 'চমৎকার! এমন গান জীবনে এই প্রথম গাইলাম আজ...' তখন আমি—আমার মতো এমন মানিনীও তাঁর করপল্লবে চুম্বন এঁকে না দিয়ে থাকতে পারেনি সেদিন। তখনও আমার চোখের কোণে অশ্রুরাশি টলটল করছিল..."

—"আর তৃতীয় দফায় ?"—জিজ্ঞেস করলেন ব্যারনেস, চোখদু'টো তাঁর ঈর্ষ্যার জ্বালায় ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠল।

উদাস কণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা, "তৃতীয় দফা, আহা! সে হচ্ছে যার-পর-নাই এক সাধারণ ব্যাপার। গত মরশুমের সময় আমি ছিলাম নীস-এ, সেখানে থাকতে একদিন ফ্রেজুস-এর স্টেজে 'কারমেন্'-এর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম—সেসিলে কেওন তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি এখন"—বলেই আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন রোবিনস্কায়া, তারপর আবার বলতে সুরু করলেন, "জানিনে এ তাঁর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কিন্তু মহিলাটি আর বেঁচে নেই।"

অকস্মাৎ মুহূর্তের মধ্যে বাষ্পাকুল হয়ে উঠল রোবিনস্কায়ার মনোরম দু'টি চোখ, আর গ্রীষ্মের সুখোষ্ণ প্রদোষ-অন্ধকারে আকাশের বুকে সন্ধ্যাতারার মতো তা' থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল এক অপরূপ স্নিগ্ধ দীপ্তি। স্টেজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, অবশ পেলব আঙুলে অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে চেপে ধরে রইলেন বক্স-সীটের আড়াল-দেওয়া পর্দাখানি, তারপর আবার যখন তিনি তাঁর বন্ধুদের দিকে মুখ ফেরালেন ততক্ষণে চোখের জল তাঁর শুকিয়ে গেছে, রহস্যমধুর, মদালস, বাসনাসঘন ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠেছে সহজ হাসি হাসি ভাব।

সস্নেহ সৌজন্যভরে জিজ্ঞেস করলেন রীয়াজানোব, "কিন্তু, এলেনা ভিক্ত্রোব্না, তোমার এতখানি সুযশ, তোমার অসংখ্য স্তাবকের দল, জনতার জয়রব···আর শেষ অবধি দর্শকদলকে যে আনন্দ পরিবেষণ করে বেড়াও তুমি! এ-ও কি সম্ভব যে তোমারও মনে শান্তি নেই ?"

—"না, রীয়াজানোব, তা নেই"—ক্লান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন গায়িকা: "এর মূল্য যে কতটুকু তা তুমি আমার চাইতে কম জান না। কোথাকার এক কাঠখোট্টা লোক একটা, এসেছে হয়তো বন্ধুবান্ধবদের জন্যে পাশ ভিক্ষে করতে, আর ওরই সঙ্গে সঙ্গে, যদি জুটে যায় এনভেলাপে ভর্তি গোটা-পঁচিশেক রুবল। নয়তো ইস্কুলের ছেলেমেয়ের দল তোমার অটোগ্রাফ-করা ফোটোগ্রাফের জন্যে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে। কোথাকার এক বোকাপাঁঠা জেনারেল এসে আমার গানের মাঝে দম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন তাঁর হেঁড়ে গলায় কপোতকূজন করে, আর

সর্বদাই—'ঐ যে উনি, হ্যাঁ ঐ তো সেই বিখ্যাত গায়িকা'—লেগেই রয়েছে। তারপর রয়েছে বেনামী চিঠির তাড়া. স্টেজের পেছন দিককার লোকগুলোর ভাঁড়ামি···সব কথা কি বলে শেষ করা যায় না কি! কেন, তুমিও নিজে সময়ে-সময়ে প্রায়ই পড়ে থাক নিশ্চয় যত সব ক্ষ্যাপাটে মেয়েমানুষের পাল্লায় ?"

—"তা বটে"—নিঃসংশয়ে জবাব দিলেন স্নীয়াজানোব।

—"এ সবের না হয় এখানেই শেষ।"—বলে চল্লেন রোবিনস্কায়া: "তারপরে আবার ধরো যা হলো সব চেয়ে ভয়ানক কাণ্ড—অভিনয় করতে করতে যখনই সত্যিকারের প্রেরণা এসেছে অমনি রূঢ় ভাবে এ সত্য মনের মধ্যে জেগে উঠেছে যে লোকের সামনে আমি করে চলেছি ভাণ, খিঁচোচ্ছি মুখ।···তারপর রয়েছে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাফল্য সম্বন্ধে আতঙ্ক···আর সেই চিরন্তন ভয়, এই বুঝি কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেল, এই বুঝি চেঁচিয়ে ফেল্লাম বেশি, এই বুঝি সর্দি লাগল! বাস্তবিক, বিখ্যাত হওয়ার দায়িত্ব অনেক!"

"কিন্তু শিল্পীর খ্যাতি?"—উত্তর দিলেন উকীল মশায়; "প্রতিভার শক্তি? বাস্তবিক, এ হচ্ছে গিয়ে এক অপার্থিব শক্তি—যে কোনও পার্থিব রাজার রাজশক্তির উর্ধ্বে।"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তা ঠিক বটে, বন্ধু! কিন্তু মানযশ দূর থেকে দেখতেই মিঠে—ততক্ষণই মিঠে যতক্ষণ সে বিষয়ে বসে বসে স্বপ্ন রচনা করছ তুমি। কিন্তু এর নাগাল পেয়েছে কি তা' গলার কাঁটা হয়ে আটকেছে। আর তারপর এ-সব যখন তিলে তিলে ক্ষয় পেতে থাকে তখন কী যন্ত্রণাই না সইতে হয় তোমায়! হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমরা এই সব শিল্পীরা যেন সব সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী। ভোর-বেলা উঠে ব্যায়াম; দিনের বেলা তালিম; তারপর নাওয়া-খাওয়া সারা হতে-না-হতেই অভিনয়ের জন্যে হাজরে দিতে যাওয়া। এই যে এখন তুমি আমি মিলে বসে যা করছি এই রকম এক-আধঘণ্টার পড়াশোনা কি আমোদ-প্রমোদের জন্যে সময় পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের কথা। আর তাই বা কী ···এ সব আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে একেবারে গতানুগতিক ধাঁচের···"

ক্লান্ত অবহেলাভরে বক্সের রেলিঙের ওপর থেকে আঙুলগুলো সামান্য একটু নেড়ে মনের ভাব ব্যক্ত করলেন রোবিন্‌স্কায়া।

এতক্ষণ এ সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন বোলোদিয়া শ্চাপলিন্‌স্কি, এখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন তিনি, "আচ্ছা, বলতে পার, এলেনা ভিক্তোরভ্‌না, তোমার এই সব কল্পনা আর এই অবসাদ থেকে মন সরিয়ে নেবার জন্যে কী করতে চাও তুমি?"

প্রহেলিকাময় চোখদু'টি তুলে তাঁর দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে, বুঝি একটু সলজ্জ ভাবেই, জবাব দিলেন রোবিন্‌স্কায়া: 'আগেকার দিনে লোকের কোনও কুসংস্কার ছিল না, এখনকার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দে দিন কাটাত তারা। তখনকার দিনে হলে আমিও সমাজে আমার সত্যি-কারের স্থানটি বেছে নিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারতাম। হায়রে, প্রাচীন রোম!"

এক রীয়াজানোব বাদে কেউই এ-কথার তাৎপর্য ধরতে পারলেন না। তাঁর মধুর কণ্ঠে অভিনয়ের ভঙ্গীতে একটি পুরাতন অথচ বহু-প্রচলিত লাতিন উক্তি উদ্ধার করে বলে উঠলেন তিনি: 'বিফল যৌবন তব, হে মহাসম্রাট!'

—"ঠিক বলেছ!"—উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া: "সুচতুর ছেলে তুমি, রীয়াজানোব, তাই তো তোমায় এত পছন্দ আমার। মনের কথাটি চট করে ধরতে পার তুমি—যদিও, মানতেই হবে এ-কথা, যে খুব উঁচুদরের মানসিক গুণ নয় এ। আর সত্যিই, দু'টি প্রাণের মিলন হলো, সদ্য গতদিবসের পরিচয়, আহার-বিহার করেছে তারা একসঙ্গে বসে, কয়েছে মনের কথা, তারপর আজই হতে হবে তাদের একজনকে শেষ। বুঝতে পারছ—শেষ, চিরদিনের জন্যে জীবনের কাছ থেকে বিদায়, মৃত্যু। রইল না তাদের মধ্যে কোনও দ্বেষ, কোনও আশঙ্কা। এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে সমৃদ্ধ কোনও দৃশ্য কল্পনায় আসে না আমার।"

—"কী পাষাণ প্রাণ!" —চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠলেন ব্যারনেস।

—"তা, এখন কী-ই বা আর করা যাবে! আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন বীরব্রতী দস্যু। যাক গে, এখন ওঠা যাক তবে?"

সবাই বাগানের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বোলোদিয়া শ্চাপলিন্স্কি তাঁর মোটরগাড়ী আনতে বলে পাঠালেন। এলেনা ভিক্তোরভ্না তাঁরই বাহুসংলগ্ন হয়ে ছিলেন, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন: "আচ্ছা, বলো দেখি, বোলোদিয়া, ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে যখন তুমি না থাক তখন তুমি যাও কোথায়?"

আমতা আমতা করতে লাগলেন বোলোদিয়া। তবে জানতেনও তিনি যে রোবিনস্কায়ার সুমুখে মিছে কথা বলার ক্ষমতা নেই তাঁর।

—"মানে, সে তোমার পছন্দ হবে না শুনলে। এই ধরো জিগানীতে ......নৈশ প্রমোদাগারে......"

—"আর কোথাও? আরও খারাপ কোনও জায়গায়?"

—"বাস্তবিক, ভারী মুস্কিলেই ফেল্লে দেখতে পাচ্ছি। যেদিন থেকে তোমার প্রেমে পাগল হয়েছি......"

—"ভাবের কথা রাখো এখন।"

—"আহা, বলিই বা কী করে?"—লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, সারা দেহ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল; অতিকষ্টে শেষে বলেই ফেল্লেন: "তা, হ্যাঁ, মেয়েমানুষের কাছে তো বটেই। তবে, হ্যাঁ, এ সব আমার নিজের গরজেই......"

দুষ্টুমি করে শ্চাপ্লিনস্কির কনুইয়েব 'পবে একটা চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রোবিনস্কায়া: "বেশ্যাবাড়ী?"

কোনও জবাব দিলেন না বোলোদিয়া। রোবিনস্কায়া বলে উঠলেন: "তবে এক্ষুণি তোমার মোটরগাড়ীতে করে আমাদের নিয়ে চলো সেখানে, সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে চলো। ব্যাপারটা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু মনে থাকে যেন তোমারই ভরসায় যাচ্ছি সেখানে।"

আর দু'জন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন বলে মনে হলো; কেননা এলেনা ভিক্তোরভ্নাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। তাঁর প্রাণ যখনই যা

চাইত তাই তিনি না করে ছাড়তেন না। তা' ছাড়া তাঁদের সকলেই শুনেছিলেন আর বাস্তবিক জানতেনও বৈ কি যে, পিটার্সবার্গে মদের নেশার ঝোঁকে ভদ্রঘরের মেয়েরা, এমন কি বালিকারাও, সৌখিন বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে, এর চেয়েও ঢের ঢের জঘন্য রকমের খেয়াল চরিতার্থ করে থাকে।

—সাত—

—"দেখো,"—বোলোদিয়াকে বল্লেন রোবিনস্কায়া ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে: "প্রথমে নিয়ে যাবে সেরা জায়গায়, তারপর মাঝারি গোছের একটাতে, শেষে সব চেয়ে জঘন্য স্থানে।"

—"দেখো, এলেনা,"—জবাব দিলেন শ্যাপ্লিনস্কি: তোমার জন্যে সবই করতে পারি। হুকুমে প্রাণও দিতে পারি আমি।···কিন্তু এসব জায়গায় তোমায় নিয়ে যেতে সাহস পাইনে। ভয় হয় পাছে কেউ তোমায় অপমান করে বসে······"

—"হা ভগবান!"—অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া: "লণ্ডনে যখন জলসা চলছিল আমার, কত লোক যে তখন প্রেম নিবেদন করতে আসত আমায়; তখন কিন্তু বাছা বাছা সঙ্গীদের নিয়ে হোয়াইট শ্যাপেলের জঘন্যতম ডেরাডাণ্ডায় ঘুরে বেড়াতে দ্বিধা করিনি আমি। আমায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন দু'জন লর্ড; কিছুতেই তাঁরা তাদের সামনে একজন নারীর অপমান সইতেন না। কিন্তু তুমি, বোলোদিয়া, তুমি বুঝি কাপুরুষদের দলের!"

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন শ্যাপ্লিনস্কি: "আহা, না, না, তা নয়, এলেনা ভিক্তোর্ভ্না। তোমায় আমি আগে থেকেই সাবধান করতে চেয়েছি, সে শুধু তোতায় ভালোবাসি বলে। নইলে যেখানেই যেতে চাও তুমি সেখানেই নিয়ে যেতে প্রস্তুত আমি—একেবারে মরণের মুখে পর্যন্ত।"

ইতিমধ্যে তাঁরা ইয়ামকার সেরা গণিকালয়ের সম্মুখে—ত্রেপেলে

—এসে পৌছুলেন। আইনজীবী বীয়জানোব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের হাসি হেসে বল্লেন: "এই যে, চিড়িয়াখানা পরিদর্শন সুরু হলো দেখছি।"

তাঁদের নিয়ে গিয়ে একটা লাল রঙের কুঠরীতে বসানো হলো; দেয়ালের গায়ে 'এম্পায়ার' স্টাইলে লরেল-স্তবক আঁকা—সোনালি ডিজাইনে।

বল্টিক অঞ্চলের চ'জন জার্মান মেয়ে এগিয়ে এল। তাদের প্রত্যেকেরই বেশ নিটোল গড়ন পীনোন্নত পয়োধর, গৌরবর্ণ, পাউডার-ঘসা মুখ, ভারিক্কী চাল, আর সসম্ভ্রম ব্যবহার। আলাপ-পরিচয়ে সুর ধরতে চায় না প্রথমটায়। মেয়েরা ক'জন তো পাথরের মূর্তির মতো অচল হয়ে বসে রইল, যেন প্রাণপণে প্রমাণ করতে চায় যে তারা সব হচ্ছে অভিজাত ভদ্রমহিলা। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলেন রীয়াজানোব, তাতেও ভাবান্তর ঘটল না তাদের। রোবিনস্কায়াই তখন এগিয়ে এলেন তাদের উদ্ধার করতে। তাদের মধ্যে যে ছিল সব চেয়ে মোটাসোটা, দেখতে একেবারে যেন আস্ত একখানা পাউরুটি, তার দিকে চেয়ে সৌজন্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন তিনি: "বলো তো দেখি, তোমার দেশ কোথায়? খুব সম্ভব জার্মানীতে—নয়?"

—"আজ্ঞে না, মাদাম, রিগাতে।"

—"তবে এখানে কাজে এসে ঢুকলে কী করে? দারিদ্র্যের জন্যে নয় বোধহয়?"

—"না, মাদাম, সেজন্যে নয় মোটেই। হান্‌স্, আমার হবু বর, একটা রেস্তরাঁয় বয়-ইয়ের কাজ করে এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ঠিক বিয়ে করার মতো সচ্ছল নয়। তাই খরচখরচা থেকে আমি যা বাঁচাতে পারি তা এক ব্যাঙ্কে জমা রাখছি, সে-ও তাই করছে। এভাবে দশহাজার রুবল জমা হলে আমরা একটা বীয়ার-হল খুলব, আর ভগবানের আশীর্বাদে তখন আমাদের ছেলেপিলের মুখ দেখবার সৌভাগ্য হবে; দু'টিমাত্র সন্তান—একটি ছেলে, একটি মেয়ে।"

—"শোনো, বাছা!"—অবাক হয়ে বল্লেন রোবিনস্কায়া: "তুমি তরুণী, সুন্দরী, দু'দুটো ভাষা শিখেছ……"

—"আজ্ঞে, তিনটে ভাষা মাদাম,"—বেশ একটু গর্বভরেই বলে উঠল জার্মান মেয়েটি : "লাতিনও জানি আমি। আমি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পড়া শেষ করে হাইস্কুলের তিন ক্লাস অবধি পড়েছি।"

শুনে বেশ একটু গরম হয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া, বল্লেন : "হ্যাঁ, তা হলেই দেখছ যে, এ রকম শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তুমি খাওয়াপরা বাদে ত্রিশ রুবল মাইনেতে ইচ্ছে করলেই কাজ পেতে পার, যেমন ধরো ঘর-সংসার দেখবার কাজ, কারো সঙ্গিনীর কাজ, কিংবা কোনও একটা ভালো স্টলে সিনিয়র কেরানী কি ক্যাশিয়ারের চাকরী···আর তোমার হবু-বর ···ফ্রিৎজ্···"

—"হান্‌স্, মাদাম···।"

—"হ্যাঁ, হান্‌স্, সে যদি পরিশ্রমী আর হিসেবী হতো তবে এই বছর তিন কি চারের মধ্যে তোমাদের পক্ষে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো একটুও কঠিন হতো না। কী বল ?"

—"কিন্তু, মাদাম, একটু ভুল করছেন আপনি। আপনার খেয়াল নেই যে, এ সবগুলোর মধ্যে সব চেয়ে সেরা একটা কাজ পেলেও, আমি কষ্টেসৃষ্টে না-খেয়ে না-দেয়ে বড়োজোর পনেরো কি কুড়ি রুবল জমাতে পারি মাসে মাসে ; কিন্তু এখানে একটু সমঝে চললেই শ'খানেক রুবল হাতে থেকে যায় আমার, আর তক্ষুনি আমি খাতাপত্র শুদ্ধ ব্যাঙ্কে গিয়ে তা' জমা দিয়ে আসি। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবে দেখুন, মাদাম, কারো বাড়ীতে ঝিগিরি করা কী লজ্জার কাজ! অষ্টপ্রহর মনিবদের সবার মন জুগিয়ে চলতে হবে! আর মনিব তো দিনরাত যত রকমের ন্যাকাপনা করে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবেন, ছিঃ! ইদিকে তো আবার গিন্নীঠাকরুণের মুখভার, মুখনাড়া, গালাগাল। উঃ!"

—"নাঃ,···ঠিক বুঝতে পারলাম না,"—মেঝেতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চিন্তিত স্বরে টেনে টেনে বলতে লাগলেন রোবিনস্কায়া : "তোমাদের এখানকার···এই কী বলব, এ সব জায়গার মেয়েদের জীবনযাত্রার কথা শুনেছি আমি ঢের। লোকে বলে সে বড় ভয়ানক। শুনতে পাই অতি কদর্য,—বুড়োহাবড়া, কুৎসিৎ লোকদেরও মনোরঞ্জন করতে বাধ্য

করা হয় তোমাদের, আর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তোমাদের পয়সাকড়ি সব টুইয়ে নেওয়া হয়ে থাকে……।"

—"না, মাদাম, কখখনো সে সব করা হয় না,…আমাদের প্রত্যেকেরই একখানা করে হিসেবের খাতা রয়েছে, তাতে খুঁটিনাটি সব জমাখরচের হিসেব লেখা থাকে। গত মাসে আমি পাঁচশ'র কিছু বেশি আয় করেছি। নিয়ম মতো দুই-তৃতীয়াংশ খাওয়া-থাকা-পরা বাবদ বাড়িউলী ঠাকরুণকে দিতে হয়, তারপর তো দেড়শ' থাকে, কী বলেন? তাই থেকে পঞ্চাশ রুবল পোযাক আব হাতখরচা, বাকি রইল একশো —ঐটেই আমি বাঁচাই। একে কি টুইয়ে নেওয়া বলে, মাদাম? যদিই বা আমি কাউকে অপছন্দ করি—সত্যিই এ রকম কুৎসিৎ কেউ কেউ আসে —বললেই পারি যে আমি অসুস্থ, তাহলেই আমার বদলে যাবে আনকোরা মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ।"

—"কিন্তু তারপর…কিছু মনে করো না…তোমার নামটি তো জানিনে।"

—"এলজা।"

—"লোকে যে বলে তোমাদের ওপর খুব জোরজবরদস্তি হয়ে থাকে …প্রহারও চলে নাকি সময়ে সময়ে · তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও নাকি অনেক ঘেন্নার কাজ করিয়ে নেওয়া হয়—সত্যি?"

—"কখ্খনও নয় মাদাম।"—একটু যেন রাগতভাবেই উত্তর দিলে এলজা: "এখানে সবাই এক পরিবারের লোকের মতোই আছি; সবাই আমরা এক দেশের লোক, নয়তো আত্মীয়কুটুম, ভগবান করুন আমাদের মতো আরও দশটা পরিবার এইরকম মিলেমিশেই থাকুক। সত্যি বটে যে এই ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটে অনেক ঢলাঢলি, মারামারি, কেলেঙ্কারি হয়—কিন্তু সে সব হলো ঐ ওখানে, ঐ সব এক-রুবলের বাসাতে। রুশ মেয়েরা পিপে পিপে মদ গেলে, আর তাদের প্রত্যেকেরই একটি-না-একটি নাগর থাকে, নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও জানে না তারা।"

—"বিচক্ষণ মেয়ে তুমি, এলজা!"—ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন রোবিনস্কায়া: "তা সবই তো যেন ভালো। কিন্তু দৈবাৎ যদি ব্যামো

হয়? ছোঁয়াচে রোগ? তবেই তো মরণ—নয়? বুঝবে কী করে?"

—"আবার সেই একই উত্তর আমার—'না মাদাম'! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার অসুখবিসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ না করে কাউকে আমি আমার বিছানা মাড়াতে দিইনে……এভাবে অন্ততঃ একশোর মধ্যে পঁচাত্তরটির বেলায় আমি ব্যামো-ফ্যামোর বালাই থেকে নিশ্চিন্দি।"

—"চুলোয় যাক!"—হঠাৎ ক্ষেপে উঠে টেবিলে এক ঠোক্কর মেরে বসলেন রোবিনস্কায়া: "কিন্তু, তারপর, তোমার আলবার্টের দশা কী হবে…"

—"হান্‌স,"—এল্‌জা ভয়ে ভয়ে শুধরে দিলে তাঁকে।

—"ও হ্যাঁ, ভুল হয়েছে…তোমার হান্‌স্ নিশ্চয়ই একথা ভেবে পুলকিত হয়ে ওঠে না যে, তুমি রয়েছ এখানে আর প্রতিরাত্রেই চলেছ তার বিশ্বাসভঙ্গ করে?"

এল্‌জা বাস্তবিকই চকিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর শান্ত করুণকণ্ঠে বললে: "কিন্তু মাদাম,…আজও তো তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হইনি আমি! সে হলো ঐ-সব নষ্ট মাগীরা, বিশেষ করে ঐ-সব রুশ মাগীরা যাদের একটি করে ভাবের মানুষ থাকবেই থাকবে আর তাদের জন্যে এই রক্ত-জল-করা পয়সা তারা জলের মতো খরচ করবেই করবে। কিন্তু আমি অত নীচে নাবব, ছোঃ!"

—"উঃ, এর চেয়ে নিদারুণ অধঃপতনের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনে!"—ঘৃণাভরে চেঁচিয়ে উঠলেন রোবিনস্কায়া, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি: "উঠুন, মশাইরা, এদের পাওয়া চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়া যাক এখান থেকে।"

রাস্তায় এসে বোলোদিয়া বল্লেন: "দোহাই ভগবান! একটিতেই কি সাধ মেটেনি তোমার?"

—"কী ইতরমো! উঃ, কী ইতরমো!"

—"তাই তো বলি কাজ নেই আর আমাদের এ রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে।"

—"না, দেখতে হবে কোথায় এর শেষ।"

দশ পা দূরেই ছিল আনা মারকোব্‌নার আস্তানা।

কিন্তু এখানেই ছিল তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করে চরম বিস্ময়। স্যাইমন তো তাঁদের ঢুকতেই দিতে চায় না, শেষে রীয়াজানোবের হাত থেকে গোটা কয়েক মোহর খসে এসে তার হাতে পড়তে তবু একটু নরম হলো সে। সবাই গিয়ে বসলেন একটা কুঠুরীতে—ত্রেপেলের ঘরখানার মতোই প্রায় দেখতে। এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌নার হুকুমে মেয়েদের সব গাদাগাদি করে এনে ঢোকানো হলো সেখানে; কিন্তু ফল হলো ঠিক শাকসজীর বাগানে এক পাল ছাগল এনে ছেড়ে দিলে যেমনটি হয়ে থাকে প্রায় তেমনটি। সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হলো জেন্‌কাকে এনে ঢোকানো—বদরাগী, খিটখিটে জেনকা, উদ্ধত চোখদুটো থেকে তার ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুনের হল্‌কা। সবার শেষে এল তামারা—শান্ত, নম্র, ঠোঁটের কোণে মোনা লিসার মতো সেই সলজ্জ, চটুল বক্রহাসি। শেষ অবধি ডেরার প্রায় সকলেই এসে জুটল ঘরের মধ্যে। রোবিনস্কায়া আর হিতে বিপরীতের ভয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন না—'এপথে পা বাড়ালে কেন?' অন্তঃপুরিকারাও তাঁকে মৌখিক ভদ্রতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা করতে ত্রুটি করলে না। এলেনা ভিক্তোর্‌ব্‌না তাদের বল্লেন গান গাইতে, বিনা আপত্তিতে গান ধরলে তারা: "সেই তো আবার এল রে সোমবার..."

তারপর আরও একখানা:

হায় পোড়া কপাল, কপাল আমার রে!
ভাঁটিখানা বন্ধডানা,
আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল যে!

ফের আবার:

ভুঁইফোঁড় সে ভবঘুরের
প্রাণের ভালোবাসা,
যেম্নি মিঠে তেম্নি কড়া,
—খাসা, আহা, খাসা!
বেশ্যেমাগীর মড়াকান্না,
নেইকো চোখে জল,

সেরা চীজ সে এ-সংসারে,
নয় তবুও ছল।
হাঃ, হাঃ, হাঃ!

ঘরকন্না বাঁধল দু'জন,
—কোথায় মেলে জুড়ি?
বরটি হলেন সিঁধেল চোর,
কনে বেশ্যে ছুঁড়ী!
হাঃ, হাঃ, হাঃ!

রাত পেরুলো তে-পওর, ভাই,
—সিঁধ দিতে যায় বর,
ঠমকে হেসে গড়িয়ে পলো
কনে বিছনার 'পর!
হাঃ, হাঃ, হাঃ!

ভোরটি হলে কয়েদখানায়
আটক হলেন ভায়া,
মাগী তখন নাগর-দোলায়,
—নেই কো হায়াকায়া!
হাঃ, হাঃ, হাঃ!

তারপর কয়েদীদের একটা গান:

টানাপোড়েন সারাজীবন—
লাগল গলায় ফাঁস,
বছর ঘুরে বছর এল,
—উঠল নাভিশ্বাস!

তারপর ফের:

মাইরি! আমার মেরী,
এমন কি আর দেরি?
কাঁদিস কেন, ভাই?

লড়াই যখন হবে ফতে,
করব বিয়ে বিধানমতে,
চুমকুড়ি দে, এখন আমি
বিদেয় হয়ে যাই !

কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ গোমড়ামুখী মুটকী কিটী হো হো করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। বাড়ী ছিল তার ওডেসায়।

—"আমিও একটা গান গাই—কেমন ? আমাদের মোল্‌দাবাঙ্কা আর পেরেজীপ্-এ চোরছঁ্যাচড় আর তাড়িখানার মাগীদের মধ্যে গানখানার খুব চলতি।"—বলেই কিটী তার ভীষণ মোটা মরচে-ধরা বেসুরো গলায় গান জুড়ে দিলে হাত-পা নেড়ে ; স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছিল, আগে কোথাও দেখা কোন-এক কাবারেৎ-গায়িকাকে নকল করে চলেছে সে :

আয়, চল যাই দুকোব্‌কা—
বলব পিঁড়ে পেতে,
ঘেরাটোপটা ছুঁড়ে ফেলে,
বসে যাব খেতে।

"কী খাবে গো, মাইরি যাদু ?"
শুধাই সাঙাৎনীরে—
"গা-বমি আর মাথাধরা,"
বলে মাগী ফিরে।

"ব্যামোর কথা রাখ না, মাগী,
কী খাবি তা বল—
ধেনো মদ, কি পচা তাড়ি,
নে চটপট, সাতভাতারী,
নয় কি শুধু খাবী খাবি—
খোল্‌সা করে বল।"

চলছে বেশ—চলতও বেশ শেষ অবধি। এমন সময় কোত্থেকে ফর্সা মান্‌কা ঝড়ের মতো ছুটে এসে ঘরে ঢুকল,—পরণে তার খালি একটা

সেমিজ, শাদা লেশ দিয়ে বোনা কোমরবন্ধ দু'ধারে লটপট করছে। গতরাত থেকে কে একজন ব্যবসাদার এসে এখনও অবধি ওকে নিয়ে মদের স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিল, আর ও-জিনিসটি পেটে পড়লে মানকার যা হয়ে থাকে এখনও হয়েছিল ঠিক তাই—সে মানকাই আর নেই, একেবারে মারমুখী হয়ে উঠেছে সে। এক ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে সটাং একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে হি হি করে প্রাণখোলা হাসি হাসতে লেগে গেল মানকা। তার রকম-সকম দেখে আর সবাইও হাসতে লেগেছে, এমন সময় হঠাৎ হেই করে মেঝের ওপর সিধে উঠে বসে একেবারে চিল-চেঁচাতে সুরু করে দিলে সে: "বাহবা রে বাহবা! ছাখ সে এসে, নতুন নতুন বেউশ্যে মাগীরা এসে ভিড়েছে আমাদের দলে……।"

অবাক কাণ্ড! তায় আবার ব্যারনেস একটুখানি বোকামিও করে বসলেন, বল্লেন: "আমি হচ্ছি এক পতিতা-উদ্ধার-আশ্রমের উদ্যোগিনী; তোমাদের মতো মেয়েদের খবরাখবর করা হলো আমার একটা কাজ।"

যেই না বলা, আর যাবে কোথায়! দপ করে জ্বলে উঠল জেন্‌কা: "সিধে বেরিয়ে যাও, বুড়ী গাধী! ছেঁড়া স্থাতা! খ্যাংরামুখী কোথাকার… তোমাদের মাগ্‌দালেন আশ্রম—সে তো কয়েদখানারও অধম। তোমাদের কর্মীরা সব ফ্রেচ্ছা করেন আমাদের নিয়ে। তোমাদের বাপ-ভায়েরা, তোমাদের সোয়ামীরা সব, আমাদের নিয়ে থাকে, আর দিই আমরা চালান করে যত রকমের ব্যামো তাদের শরীরে—ইচ্ছে করেই দিই… …সে সব বিষ তারা আবার ছড়ায় তোমাদের মধ্যে।…তোমাদের মেয়ে-কর্মীরা থাকেন সব গাড়োয়ান, পুলিস, দরোয়ানদের সঙ্গে। আর নিজেদের মধ্যে যদি আমরা একটু হাসিঠাট্টা করেছি তো আর রক্ষে নেই—অমনি চোরকুঠুরীতে আটকে ফেলে রাখবে আমাদের। হ্যাঁ, আর মনে থাকে যেন এখানে তামাসা দেখতে এলে শুনে যেতে হবে মুখের ওপর এই রকম সব সাঁচ্চা সাঁচ্চা বুলি।"

—"জেনী, থাম তুই! আমিই বলছি ওঁদের।"—তামারা শান্তভাবে থামিয়ে দিলে তাকে, তারপর বলতে লাগল: "ব্যারনেস, সত্যিই কি আপনারা তথাকথিত ভদ্রমহিলাদের চেয়ে হীন মনে করেন আমাদের?

আমার কাছে হয়তো এল একটি লোক, একবারের জন্যে দিলে সে আমায় দু'রুবল, কি, সারারাতের জন্যে ধরুন পাঁচ। এ-সংসারে কারো কাছেই ব্যাপারটা গোপন করে চলিনে আমি।······কিন্তু আপনিই বলুন, ব্যারনেস, এমন কোনও পতি-পুত্রবতী বিবাহিতা মহিলার কথা আপনার জানা আছে কি যিনি ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে কখনও কোনও তরুণ পরপুরুষকে, কিংবা নিছক অর্থের লোভে কোনও বয়স্ক ভদ্রলোকের কাছে, দেহদান করেন নি? বেশ ভালো করেই জানা আছে আমার যে, আপনাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনকে পোষে তাদের গোপন নাগররা, আর বাকি পঞ্চাশজন, যাদের এখন বয়স হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই পোষে ছেলে-ছোকরাদের। তা ছাড়া এ-ও জানি আমি—আহা, আপনাদের মধ্যে কত মেয়েই না থাকে তাদের বাপ, ভাই, এমন কি পেটের সন্তানটির সঙ্গে পর্যন্ত! কিন্তু এ-সব গোপন তথ্য সংগোপনে লুকিয়ে রাখেন আপনারা। এই হলো আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ—বুঝলেন? আমরা পতিতা কিন্তু মিছে কথা বলতে জানিনে, ভাণ করতে পারিনে; আপনারাও পতিতা, কিন্তু তার ওপর হলেন গিয়ে মিথ্যাবাদিনী। ভেবে দেখুন এখন, তফাৎটা কোথায়?"

—"বাহবা। বাহবা, তামারোচকা! উচিত শিক্ষা দিয়েছিস্, ভাই, ওদের!"—চেঁচিয়ে উঠল মান্‌কা। তখনও বসেই ছিল সে মেজের 'পরে; মাথার লম্বা লম্বা কোঁকড়ানো চুলের রাশ আলুথালু হয়ে পড়েছে,—দেখে মনে হয় বুঝি কোন্ তেরো বছরের এক কিশোরী!

—"তারপর, তারপর?"—জেন্‌কা উস্কে চলল তামারাকে,—চোখ দু'টো তার ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে তখনও।

—"ভয় কী, জেনেচ্‌কা? আরও আছে, বলছি!"—উত্তর দিলে তামারা; তারপর সুরু করলে ফের: "আমাদেব মধ্যে ক্বচিৎ কখনও—তা' হাজারে একটির বেশি হবে না—কেউ হয়তো ভ্রূণহত্যা করে থাকে। আর আপনাদের সবাই সে-কাজ করেছেন—একবার নয়, বহুবার। কী? সত্যি নয়?···আর আপনাদের মধ্যে যাঁরাই এ কাজ করেছেন তাঁদের কেউই হতাশা কি নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বাধ্য হয়ে এমন কাজ করেননি, করেছেন শুধু দেহসৌষ্ঠব বজায় রাখবার অভিপ্রায়ে,

পাছে সৌন্দর্যের হানি হয় সেই ভয়ে। আপনারা চান শুধু পাশবিক ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে থাকতে, অন্তঃসত্ত্বা হলে তাতে ব্যাঘাত ঘটে।"

অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলেন রোবিন্‌স্কায়া ; দ্রুত ফিস ফিস করে ফরাসী ভাষায় বল্লেন : "দেখুন ব্যারনেস, মেয়েটিকে বেশ শিক্ষিতাই বলা চলতে পারে এদের মধ্যে—নয় ?"

ব্যারনেসও ফরাসীতেই জবাব দিলেন : "দেখুন, মেয়েটির মুখখানা আমার যেন চেনা চেনা বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু দেখবই বা কোথায় একে···স্বপ্নে ?···ভাবের ঘোরে ?···না, এর শৈশবে ?"

—"আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি।"—তাঁদের কথাবার্তায় বাধা দিয়ে একটু যেন অসহিষ্ণু হয়েই বলে উঠল তামারা ফরাসীতে : "খারকোভের কথা মনে পড়ে কি—সেই যে কোনিয়াকিন্‌-এর হোটেলের একটা ঘর, থিয়েটারের ম্যানেজার সোলোভিৎস্‌শীক, আর সেই একজন টেনর-গাইয়ে ভদ্রলোক ?··· তখনও আপনি 'ব্যারনেস স্থ অমুকতুস্থক' হন নি···। যাক গে, ফরাসী এখন থাক, ঘরোয়া বুলিই চলুক ···। আপনি তখন ছিলেন সখীদলের একজন, গাইতেন আমার সঙ্গে।"

ব্যারনেস কিন্তু ফরাসী ছাড়লেন না, জিজ্ঞেস করলেন : "দোহাই ভগবানের ! বলো আমায় এখানে তুমি এলে কী করে, মাদামোয়াজেল মার্গারেৎ ?"

—"আহা, সবাই এ কথা প্রত্যেক দিনই তো আমাদের জিজ্ঞেস করছে।"—রুশিয়ানেই জবাব দিলে তামারা : "কেন, এম্নি ইচ্ছে হলো তাই এখানে এলাম···।" তারপর এক অননুকরণীয় শ্লেষের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে বসল সে : "আশা করি আপনাদের সঙ্গে এই যে এতক্ষণ কাটালাম তার ন্যায্য মূল্য দেবেন আপনারা ?"

—"না, গোল্লায় যাও সব !"—হঠাৎ কম্বলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট ফর্সা মানকা ; তারপর পায়ের মোজার ভেতর থেকে দু'টো মোহর বার করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে : "ঐ যে নাও ! ··আমিই দিলাম তোমাদের গাড়ীভাড়া। সিধে পথ দেখো

এখন এখান থেকে, নইলে এখানকার সমস্ত আয়না বোতল সব ভেঙে তছনছ করে ফেলব আমি···।”

—“হ্যাঁ, যাব বৈ কি!”—সজল চোখে উঠে দাঁড়ালেন রোবিনুস্কায়া; দরদভরে বলতে লাগলেন তিনি: “তবে মাদামোয়াজেল মার্গারেৎ-এর শিক্ষা মনে থাকবে আমাদের। আর হ্যাঁ, তোমাদের সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষতিপূরণও করা হবে—সেদিকে খেয়াল রেখো, বোলোদিয়া। কিন্তু সে কথা এখন থাক, আমাদের জন্যে এতক্ষণ ধরে গান গাইলে তোমরা, আমায়ও দাও তবে তোমাদের একটা গান শোনাতে।”

রোবিনুস্কায়া উঠে পিয়ানোয় গিয়ে বসলেন, টুং টাং করে দু'চারটে ঘা দিলেন, তারপর হঠাৎ দারগোমাইঝ্স্কির সেই অপরূপ গাথা তানলয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ঘর ছেয়ে ফেলল:

হায় নীরব অভিমানের বোঝা বহি
যবে বিদায় হনু দোঁহে,
কণ্ঠে নাহি সরিল হায় বাণী,
রুধিল শ্বাস মোহে।
শুধু রাখিয়া গেনু ঈর্ষ্যাকাতর দাহ
তোমার তরে প্রিয়,
ভুলিব বলি বাহির হনু ছুটি'—
আজিকে তবু করুণ ক্ষমা দিয়ো।

আজিকে হায় আকস্মিকের টানে
মিলন যদি ঘটে,
পুন অরুণ-লিখা উঠিবে না কি ঝলি'
বিস্মরণীর পটে?
আজি অশ্রু নাহি, নাহিক অভিযোগ,
নাহিক লাজ ভয়,
ভাগ্যবেদীর তলে নোয়াই মাথা—
মানিনু প্রিয় পরম পরাজয়।

শতেক দোষে দোষী চরণতলে

অভাগীরে বেসেছ কি ভালো ?
জাননি কভু, মানিনি কভু,
জানিতে তবু চাহিনি প্রভু,
মিনতি শুধু চোখের জলে,
এ মরু ধূ ধূ হৃদয়-তলে,
আঁধার অমানিশার কোলে
প্রদীপখানি জ্বালো।

হায় ক্ষণিকের দেখা সে যে
দৈববেদীর ফুল,
আকস্মিকের পটে উজল লিখা—
মরণ সমতুল।

এই সকরুণ আবেগবিধুর গাথাসঙ্গীত সুবিখ্যাত একজন গায়িকার কণ্ঠে মুখর হয়ে উঠে তাদের প্রত্যেকেরই অন্তরে আলোড়িত করে তুললে প্রথম প্রণয়ের স্মৃতি—সেই প্রথম পদস্খলনের কাহিনী, বাসন্তী উষায় সেই যে সেদিনকার সেই বিলম্বিত বিদায় গ্রহণ—প্রভাতী শিশিরে দূর্বাদল তখনও হয়ে রয়েছে শুভ্র, বার্চগাছের শাখায় শাখায় গোলাপি আভা মাখিয়ে দিয়েছে আকাশের অরুণিমা, তখনও এসে সূঁচের মতো গায়ে বিঁধছে প্রভাতের শীত; সেই শেষ আলিঙ্গন-পাশ তখনও রয়েছে অঙ্গে অঙ্গে লতার মতো জড়িয়ে, আর তারই মধ্যে মৃদু সকরুণ গুঞ্জনে কেবলই বলে চলেছে সত্যসন্ধ হৃদয়,—'না গো না, এ আর ফিরে আসবে না গো!'

স্তব্ধ হয়ে রইল তামারা; স্তব্ধ হয়ে রইল দুর্মুখী মানকা; আর সব চেয়ে যে ছিল দুর্দান্ত সেই জেনকা হঠাৎ ছুটে এসে গায়িকার সুমুখে নতজানু হয়ে বসে তাঁর পায়ে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল কেঁদে।

সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন রোবিন্‌স্কায়া, "এসো বোন, তোমায় চুমু দিই!"

জেনকা ফিস্ ফিস্ করে কী বল্লে তাঁর কানে কানে।

—"তাতে কী?"—উত্তর দিলেন রোবিন্‌স্কায়া: "ও কিছু নয়। কয়েকমাস চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে।"

—"না, না, না···ওদের সবাইকে দেব এ ব্যামো। পচে গলে৺ কাৎরাতে থাকুক ওরা সবাই।"

"—ছিঃ, বোন! তোমার মতো হলে আমি কিন্তু তা' করতাম না"—বল্লেন রোবিনস্কায়া।

—"তবে কেন ওরা করলে এমন অত্যাচার আমার 'পরে? কেন করলে এ অন্যায়? কেন? কেন?"—বলতে বলতে জেন্‌কা, আমাদের সেই গরবিনী জেনী, পাগলের মতো বারবার গায়িকার হাতে পায়ে চুমো খেতে লাগল।

প্রতিভার এমনই ক্ষমতা বটে!

এই হলো একমাত্র শক্তি যা হীন বিচারবুদ্ধিকে নয়, মানুষের বাগদীপ্ত অন্তরাত্মাকে বশ করে টেনে নিতে জানে নিজের বিভূতি দিয়ে। রোবিনস্কায়ার বসনপ্রান্তে মুখ লুকোলে গরবিনী জেনী; রুমালে মুখ ঢেকে নিরীহের মতো চেয়ারে বসে রইল ফর্সা ছোট মান্‌কা; হাঁটুর 'পরে কনুই রেখে কপালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে নীচের দিকে চেয়ে রইল তামারা; আর এদিকে যদি কোনও অঘটন ঘটে তার খবরদারি করতে এসে এ-সব দেখেশুনে হতবুদ্ধি হয়ে দোড়গোড়ায় থমকে থ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সাইমন।

স্থির শান্তকণ্ঠে জেন্‌কার কানে কানে বলছিলেন রোবিন্‌স্কায়া: "হাল ছেড়ে দিয়ো না। এক এক সময় চারদিকে এমন অন্ধকার হয়ে আসে যে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে; কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে থাকো, দেখতে পাবে হঠাৎ কী করে মেঘ কেটে গেছে! এই যে দেখছ, বাছা, আজ পৃথিবীময় আমার খ্যাতি, কিন্তু যদি জানতে, বোন, কী দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে, কত লাঞ্ছনা সয়ে, শেষে আজ তীরে এসে উঠতে হয়েছে আমায়! সামলে ওঠো, বাছা, অদৃষ্টের 'পরে নির্ভর করতে শেখো।"

বলতে বলতে নীচু হয়ে এসে জেন্‌কার কপালে চুমো দিলেন রোবিন্‌স্কায়া। বোলোদিয়া শ্যাপ্‌লিন্‌স্কি এতক্ষণ ধরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ-দৃশ্য দেখছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে গায়িকার টানা টানা ফিকে সবুজ চোখদু'টিতে যে অপরূপ সহৃদয় ভাব ফুটে উঠল তা' তিনি জীবনে কখনও ভুলতে পারেন নি।

তারপর সকলে বিষণ্ণ হৃদয়ে নিলেন বিদায়, শুধু রীয়াজানোব বেরোলেন এক মিনিট দেরি করে। জেন্‌কার কাছে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা ও সৌজন্যভরে তার হাতে একটি চুমো দিয়ে বল্লেন তিনি: "যদি পার তো আমাদের এ প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কোরো· তবে এই আমাদের শেষ। কিন্তু যদি কখনও আমাকে দিয়ে কোনও উপকার হয়, জানাতে দ্বিধা কোরো না। এই যে আমার কার্ড; অনর্থক টেবিলের ওপর ফেলে রেখে দিয়ো না। মনে রেখো, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু।"

তারপর জেন্‌কার হাতে আর একটি চুম্বন দিয়ে, সবার শেষে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন তিনি।

—আট—

বৃহস্পতিবার ভোর থেকে অনবরত টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে; গাছের পাতায় আবার দেখা দিয়েছে সবুজ রঙ। তারপর হঠাৎ আজ আবার সব যেন হয়ে পড়ছে স্বপ্নের মতো নিথর নিঝুম একঘেয়ে—সবই যেন বিষণ্ণ, বিরস।

মেয়েরা সব নিত্যিকারের মতোই জেন্‌কার ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন থেকে জেন্‌কার মধ্যে কী-একটা অদ্ভুত ভাবান্তর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর সে আগের মতো রসিকতা করে না, হাসে না, সারাক্ষণ তার সেই হলদে মলাটওয়ালা উপন্যাসখানা নিয়েও পড়ে থাকে না। জেনী এখন হয়ে পড়েছে খিটখিটে, সদাই বিষণ্ণ, চোখে তার মর্মান্তিক ঘৃণা আর বিদ্বেষের ছায়া। ছোট মান্‌কা, আমাদের সেই দুরন্ত ছোট মান্‌কা, যে জেনীকে ভালোবাসে প্রাণেরও অধিক,—বৃথাই সে জেনীর মন তার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে—জেনী তাকে দেখেও দেখে না, ভালো করে কথাই কয় না তার সঙ্গে। বড়োই প্রাণে লাগে তার। তা' বোধহয় এই একটানা টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি—এতে করে সকলেরই মনমেজাজ উঠেছে ভারাক্রান্ত হয়ে। তামারা এসে বসে জেন্‌কার বিছানায়, তারপর সস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখটি

এনে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে : "কী হয়েছে তোর, জেনেচ্‌কা ? অনেক-দিন থেকে লক্ষ্য করছি তোর কেমন যেন এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটেছে। মান্‌কাও লক্ষ্য করেছে। দেখ না, তোর আদর না পেয়ে পেয়ে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে বেচারী। বল না আমায়, যদি কোনও একটা উপায় করতে পারি ?"

চোখ বোঁজে জেনকা, তারপর মাথা নেড়ে জানায় 'না।' একটু সরে বসে তামারা, কিন্তু আস্তে আস্তে তার ঘাড়ে হাত বুলিয়েই চলে।

—"তোর নিজের বিষয় জেনকা ; তাতে মাথা গলাই আমি কোন্ সাহসে ? আমি জিজ্ঞেস করছিলাম শুধু তুই হচ্ছিস—"

আচমকা বিছানার 'পরে উঠে বসে জেন্‌কা ; তারপর তামারার হাত ধরে হঠাৎ যেন এমটু আদেশের সুরেই বলে ওঠে : "বেশ! বাইরে চল তবে এক লহমার জন্যে। বলছি সব। মেয়েরা সব ঘরে বসে থাকো।"

দরদালানে এসে জেনকা তার সঙ্গিনীর কাঁধের 'পরে হাত দু'খানা রেখে, হঠাৎ বিকৃত ফ্যাকাশে মুখে বলে ওঠে : "আচ্ছা, তবে শোন এখানে দাঁড়িয়ে : কে-যেন আমায় দিয়ে গেছে গর্মিরোগ ।"

—"আহা, ভাই ! বেশিদিন হবে ?"

—"হ্যাঁ ; অনেকদিন। মনে আছে তোর সেই যে একদল্ল পড়ুয়া এসেছিল ? সেই যে যারা প্লাতোনোবের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিল ? তখনই আমি প্রথম টের পাই। দিনের বেলা টের পেলাম।"

—"আমি এক রকম আন্দাজও করেছিলাম তাই হবে."—শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় তামারা, "বিশেষ করে সেই যে যেদিন তুই সেই গায়িকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর কানে চুপি চুপি কী বলছিলি। তা' সে যাই হোক, জেনেচ্‌কা লক্ষ্মীটি আমার, তোর কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত।"

ক্রোধে হতাশ্বাসে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে হাতের যে রুমালখানা এতক্ষণ বিমূঢ় ভাবে পাকাচ্ছিল তা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলে জেন্‌কা।

—"না! কিছুতেই নয়!"—বলে ওঠে সে : "এ-বিষ তোদের

কাউকে দেব না। হয় তো নিজেই লক্ষ্য করে থাকবি, গত কয়েক হপ্তা থেকে আমি মোটেই সবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করিনে, আর নিজেই আমি থালাবাসন ধোয়ামাজা করি। তাই তো আমি যে-মান্‌কাকে সত্যি সত্যিই এত ভালোবাসি তাকে ঠেলে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখি। কিন্তু এই সব হু'ঠেঙে জানোয়ারগুলোকে আমি ইচ্ছে করেই এ-বিষ দিয়ে থাকি—রোজ সন্ধ্যেয় দিই, দিনে দশ জন, পনেরো জন করে। পচে গলে মরুক ওরা, দিক এ গর্মির বিষ চারিয়ে ওদের বৌদের শরীরে, ওদের বাঁধা রাঁডদের মধ্যে, ওদের মায়েদের শরীরে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মা বাপ, ওদের দাইমা, চাইকি ওদের ঠাকুমা-দিদিমাদের মধ্যেও দিক চারিয়ে এ-বিষ। মরুক সব, মানুষ না জানোয়ার কোথাকার!"

সযত্নে সস্নেহে জেন্‌কার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করে তামারা; "সত্যি, জেনেচ্‌কা, এমন নিষ্ঠুর হতে পারিস তুই?"

—"পারি বৈ কি! কোনও দয়ামায়া নেই আমার। তবে তোদের কারও কোনও ভয় নেই। আমি নিজেই বেছে নিই কাকে দেব এ বিষ। আহাম্মুকের শেষ, দেখতে মাকাল ফলটি, টাকাকড়িতে ঘুণ ধরেছে যার, সব চেয়ে মান্যগণ্য যে সব ভদ্রলোক তাদের। তবে তাদের একজনকেও আমি এরপর তোদের কারও পাশে ঘেঁসতে দেব না। আহা! তাদের সামনে আমি এমন ভাবখানা দেখাই যেন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি একেবারে—তোরা তা দেখলে হেসে কুটোপাটি হতিস! তাদের কামড়ে খামচে, কেঁদে ককিয়ে, থেকে থেকে শিউরে উঠে, কী খিঙ্গিপনাই যে করি! আর ভোলেও তারা এতশত দেখেশুনে, যত সব আহাম্মুকের দল!"

নীচের দিকে চেয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বলে তামারা: "এ সব তোর কাজ, তুই-ই বুঝিস। হয় তো এ তুই ঠিকই করছিস। কে জানে? কিন্তু বলবি আমায় ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দিলি তুই কী করে?"

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয় জেন্‌কা সেদিক থেকে; তারপর জানলার কোণের দিকে চৌকাঠের 'পরে মুখ রেখে মর্মান্তিক আত্মগ্লানিতে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলে—বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার জ্বালা সে চোখের জলে। কান্নার মধ্যেই ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে বলে চলে

সে : "কী করে···কী করে···শুনবি···ভগবানের এম্নি দয়া আমার 'পরে ···যে···যেখান দিয়ে ব্যামো আমার ফুঁড়ে বেরিয়েছে সে বুঝি ডাক্তার-দেরও নাগালের বাইরে, ভাই! আর তা'ছাড়া আমাদের ডাক্তারবাবু তো বুড়োহাবড়া, মোটাবুদ্ধি।"

তারপর যেমন হঠাৎ সে কেঁদে ফেলেছিল তেম্নি আবার আচমকা প্রাণপণ চেষ্টায় এক নিমেষে কান্না চেপে ফেলে বলে: "আয় ভাই আমার কাছে, তামারোচ্‌কা! বল গা ছুঁয়ে এ নিয়ে বেশি বকবক করবি নে।"

—"না, ভাই, ভয় নেই তোর।"

তারপর দু'জনই শান্ত সংযত হয়ে ঘরে এসে ঢোকে।

একটু পরে সাইমন আসে সেখানে। লোকটা সদাসর্বদা বর্বর গোছের হলেও, কী জানি কেন জেনকাকে ওবই মধ্যে একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকে। এসে বলে সে: "হ্যাঁ, দেখো, জেনেচ্‌কা, মহামহিম বাহাদুররা এসেছেন ভান্দার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। মিনিট দশেকের জন্যে ছেড়ে দাও ওকে।"

ভান্দা হচ্ছে এখানকার এক নীলনয়না উজ্জ্বলা গৌরাঙ্গী; থাইমুখ-খানা তার বেশ বড়ো, ঠোঁটদু'খানা লাল টকটকে, আর মুখের গড়ন দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায় খাঁটি লিথুয়ানিয়ান মেয়েটি। জেন্‌কা যদি একবার 'না' বলে দেয় তবে তাকে আর যেতে হয় না ঘর ছেড়ে, তাই সে কাতরনয়নে চায় তার দিকে। কিন্তু জেন্‌কা ইচ্ছে করেই রয় চোখ বুঁজে, হ্যাঁ না কিছুই বলে না। একান্ত অনুগত মেয়েটির মতো তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়।

এই মহামহিম জেনারেল বাহাদুরটি একেবারে যেন কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে দু'হপ্তা অন্তর অন্তর মাসে দু'বার করে এসে পায়ের ধূলো দিয়ে যান এখানে (ঠিক যেমন এখানকার আর একটি মেয়ে জো'র কাছে আসেন এখানে ডিরেক্টর বাহাদুর বলে পরিচিত আর একজন ভদ্রলোক)।

হঠাৎ জেন্‌কা তার ছেঁড়া বইখানা পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তার কটা চোখদুটিতে তখন সত্যিকারের আগুনের হল্কা ফুটে বেরুচ্ছে।

—"এই সেনাপতি মশায়কে হেলাফেলা করা ভুল তোদের,"—বলে

ওঠে সে : "এর চাইতেও ঢের ঢের খারাপ অনেক ইথীয়োপীয়ান জানা আছে আমার। একবার আমার কাছে এসেছিল এক খদ্দের—একেবারে আস্ত একটি বোকাপাঁঠা। আমার সঙ্গে পীরিতের আর পথ পেলে না মিনষে এই···ইয়ে ছাড়া···খুলেই বলি তবে : মাইয়েতে পিন ফুটিয়ে দিত হতভাগা···। আবার ভিল্‌নোতে এক পোলিশ ক্যাথলিক পাত্রী করত কী, আমার সারা অঙ্গ শাদা কাপড়ে সাজাত, বাধ্য করত সে আমায় সারাদেহে পাউডার মাখতে, তারপর আমায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমার আশেপাশে জ্বালাত তিন-তিনটে মোমবাতি। তারপর শেষে যখন আমি একেবারে মড়ার মতো পড়ে রইতাম তখন আচমকা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত সে।"

—"খাঁটি কথা বলেছিস, ভাই জেন্‌কা!"—হঠাৎ বলে ওঠে ছোট মান্‌কা : "আমারও ছিল এক বুড়ো জানোয়ার। তার কাছে সদাসর্বদা অক্ষত কুমারীর মতো সতীপনার ভাণ না করলে তার আবার মন উঠত না! তাই আমাকে সারাক্ষণ কান্নাকাটি চেঁচামেচি করতে হতো।"

হঠাৎ কিটী তার সাঁই সাঁই-করা গলায় হেসে ওঠে : "শোন বলি তবে, আমার ছিল এক মাষ্টার মশাই ; সে সদাই ভাবখানা দেখাত যেন আমিই হলাম গিয়ে পুরুষ আর তিনি হলেন প্রকৃতি, আর তাই আমাকেই গিয়ে···জোর করে,···আর কী গাধা! সারাটিক্ষণ ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে থাকবে সে : 'ওগো, আমি যে তোমারই প্রেয়সী! আমি যে মনেপ্রাণে তোমারই গো! ধরো আমায়, ধরো প্রাণনাথ!' "

—"মাথা খারাপ আর কী!"—বলে ওঠে নীলচোখী চঞ্চলা ভের্‌কা পরিষ্কার মেয়েলী গলায়, "মাথা খারাপ একদম।"

—"না, তা' কেন!"—হঠাৎ প্রতিবাদ করে ওঠে নম্র মমতাময়ী তামারা : "মাথা খারাপ নয় একটুও, শুধু কেবল একটি-লম্পট, সব পুরুষ মানুষই যেমন তেমনি। বাড়ীতে অরুচি লাগে, তাই বাইরে এসে টাকা খরচ করে মরজি-মাফিক সুখটি আদায় করে নিয়ে যায়। এই তো সোজা কথা, তাই নয় কি?"

জেন্‌কা এতক্ষণ চুপ করে পড়ে ছিল, এখন হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসে বিছানার 'পরে।

—"তোরা সব গাধা!"—চেঁচিয়ে ওঠে সে: "এ সব ক্ষমা করিস কেন? আগে আমিও ছিলাম গাধা, কিন্তু আজকাল আমি ওদের সবাইকে আমার সামনে চারপায়ে হাঁটাই, আমার পা চাটাই, আর মহানন্দে করেও ওরা এসব।...তোরা জানিস সবাই, টাকাকড়ির ওপর মমতা নেই আমার, কিন্তু ওদের সব চুষে নিই যেমন করে পারি। ওরা, এই সব নোঙরা জানোয়ারের দল, আবার আমায় এনে উপহার দেয় তাদের বৌ, কনে, মা, মেয়ে এদের সব ছবি ...দেখে থাকবি তোরা সে-সব ছবি পায়খানার ভেতর বোধকরি? কিন্তু শুধু একবার ভেবে দেখ, বাছারা, মেয়েমানুষ জীবনে শুধু একবারই ভালোবাসে, আর ভালোও-বাসে আজীবন, আর পুরুষ মানুষের ভালোবাসা মদ্দা-কুকুরের রক্ত-চোষা।...ওরা যে অবিশ্বাসী হয়, সে কিছু নয়; কিন্তু বাঁধা মেয়েমানুষের ওপর, তা সে নতুনই হোক আর পুরোনোই হোক ওদের একটুও দরদ থাকে না, এই যা দুঃখ। শুনেছি আজকালকার ছেলেছোকরাদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের মন বেশ সাদা। বিশ্বাসও করি সে কথা, তবে নিজে আমি দেখিনি এ রকম কাউকে; আমি যাদের দেখেছি, তাদের না আছে চালচুলো, না আছে আর কিছু—যত সব আঁস্তাকুঁড়ের জানোয়ার।"

ভান্দা ফিরে আসে। জেন্‌কার বিছানার যে পার্শটিতে প্রদীপের ছায়া এসে পড়েছিল, সাবধানে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে সেখানটিতে সে ধপ করে বসে পড়ে। ফাঁসির আসামী, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী, আর বেশ্যাদের মধ্যে যে একরকমের বিকৃত কিন্তু গভীর আন্তরিক চক্ষু-লজ্জা দেখতে পাওয়া যায় তারই দরুণ কেউ তাকে সাহস করে এ কথাটা আর জিজ্ঞেস করে না, এই দেড়ঘণ্টা সময় কাটল তার কেমন করে। হঠাৎ সে টেবিলের 'পরে পঁচিশটা রুবল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে ওঠে: "খানিকটে শাদা মদ আর একটা তরমুজ আনিয়ে দে তো আমায়।"

তারপর টেবিলের 'পরে দু'হাত অবশ ভাবে এলিয়ে দিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে সে। তবুও সাহস করে কেউ তাকে কোনও প্রশ্ন করে না। শুধু জেন্‌কা ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে, ঠোঁট কামড়াতে থাকে বসে বসে।

—"হ্যাঁ, এই যে, এখন তামারার ব্যাপার বুঝতে পারছি আমি।" —বলতে সুরু করে সে : "শুনছিস, তামারা, তোর কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। তোর ওই চোর সেন্‌কার সঙ্গে মাখামাখির জন্যে কত না হাসা-হাসি করেছি আমি ; কিন্তু এই এখন, একথা মানছি যে এ-সংসারে যদি সত্যিকারের ভালোমানুষ কেউ থেকে থাকে তো সে হচ্ছে ওই চোর-ছ্যাচড় খুনেডাকাতরা। কোনও ছুঁড়ীর সঙ্গে তার পীরিতের কথা সে লুকিয়ে বেড়ায় না, আর দরকার হলে মাগীর জন্যে সে চুরিচামারি কি খুনখারাপি করতেও পেছ-পা নয়। কিন্তু এই সব—বাকি আর সবাই! যত সব মিথ্যে, ছলনা, ছিঁচকেপনা ধূর্তোমি, বদমাইসি! এক নোঙরা জানোয়ার, রয়েছে তার তিন-তিনটে সংসার, এক বৌ আর গোটা পাঁচেক কাচ্চাবাচ্চা। তা' ছাড়া বাঁড়ও আছে একজন অন্য কোথাও, আর তার পেটের গোটা দুই কাচ্চাবাচ্চা। প্রথম পক্ষের মেয়ের পেটেও হয়েছে বাপের একটি ছেলে। শহরের সব্বাই জানে এসব কথা। তবুও, ভেবে দেখ একবার, তিনি হলেন একজন মান্যগণ্য লোক, সারা পৃথিবীময় সুখ্যাতি তাঁর।...হ্যাঁ, দেখ, বাছারা, মনে হয় কোনো-দিন আমরা নিজেদের মধ্যে গোপনকথার বেসাতি করিনি। তবু বলছি, আমার বয়েস যখন সবে সাড়ে দশ আমার নিজের মা আমায় বেচে দেয় ঝিতুমিরু শহরে ডাক্তার তারাবুকিনের কাছে। কত চুমো খেতাম তার হাতে, কত কাকুতি মিনতি করতাম তাকে আমায় রেহাই দেবার জন্যে, কেঁদে বল্লাম : 'আমি যে ছেলেমানুষ গো।' উত্তরে বলত সে : 'ও কিছু নয়, ও কিছু নয় ; বড়ো হয়ে উঠবে বৈ কি তুমি!' ব্যথা তো লাগতই, ঘেন্না, নোঙরামি।...সেই লোকটাই আবার পরে আমার সে হাপুস নয়নের কান্নার কথা চারদিকে রটিয়ে বেড়ায়—যেন কী একটা মজাদার চলতি গল্প।"

—"কথা যখন উঠেইছে তখন শেষই হোক এর"—হঠাৎ শান্ত কণ্ঠে বলে ওঠে জো, মুখে তার অবহেলা আর বিষাদের হাসি : "আমায় প্রথম নষ্ট করে পাদ্রী সাহেবদের ইস্কুলের এক মাষ্টার মশাই...অইবান পেত্রোবিচ যুয। আমায় তিনি ডেকে নিয়ে এলেন তাঁর ঘরে, তাঁর বৌ তখন গিয়েছিল বড়োদিনের বাজার করতে।' আমায় মেঠাই খাওয়ালেন

তিনি, তারপর বল্লেন হয় তিনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে আমায়, নয়, বদ-স্বভাবের দায়ে আমায় ইস্কুল থেকে দেবেন দূর করে। কিন্তু তখনকার দিনে! মাষ্টার মশাইদের তো আমরা ডরাতাম স্বয়ং যমরাজ কি রাজার চেয়েও বেশি।"

—"আর আমায় নষ্ট করে একটি পড়ুয়া। মুনিবের ছেলেদের পড়াত সে ওখানে,—ঐ যে যেখানে ঝি-এর কাজ করতাম···"

—"তা' নয়, আমায় কিন্তু···,"—বলেই নিউরা, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একেবারে হাঁ হয়ে যায়। দেখাদেখি সেদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে হাত কচলাতে সুরু করে দেয় জেন্‌কা। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে লিউব্‌কা—রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোণে পড়েছে কালি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশি-ডাকা লোকের মতো দরজার হাতলখানা হাতড়ে বার করবার চেষ্টা করছে সে—ভর দিয়ে দাঁড়াবে বলে।

—"কী হয়েছে তোর, লিউব্‌কা?"—চেঁচিয়ে ওঠে জেন্‌কা: "এ কী কাণ্ড!"

—"অ্যাঁ? কী আর হবে? আমায় নিলে আবার দূর দূর করে খেদিয়ে দিলে।"

একটি কথাও বেরয় না কারও মুখ থেকে। দু'হাতে চোখ ঢেকে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে থাকে জেন্‌কা, চোয়ালের কঠিন পেশীগুলো কী ভাবে যে কুঁচকে কুঁচকে উঠতে থাকে তার!

—"জেন্নেচ্‌কা, তুই-ই আমার ভরসা,"—শ্রান্ত অসহায় কণ্ঠে বলে লিউব্‌কা; "তোকে সবাই এত খাতির করে চলে। এ বিষয়ে তুই-ই, লক্ষ্মীটি, কথা কয়ে দেখিস আনা মারকোবনা কি সাইমনের সঙ্গে। ···ফিরে যেন নেয় আমায় আবার।"

সোজা হয়ে উঠে বসে জেন্‌কা বিছানার 'পরে; তারপর তার শুকনো, জ্বলন্ত, বাষ্পাকুল চোখে স্থিরদৃষ্টিতে লিউব্‌কার দিকে চেয়ে ধরা-গলায় জিজ্ঞেস করে: "আজ তোর খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়েছে?"

—"না। কালও হয় নি, আজও হয় নি। কিছুই খেতে পাইনি, ভাই।"

—"শোন, জেনেচ্‌কা"—শান্তকণ্ঠে বলে ভান্দা: "আমি খানিকটে

মদ দিই ওকে—কেমন? আর ভেরকা ইতিমধ্যে একবার চট করে গিয়ে দেখে আসুক গে রান্নাঘর থেকে কিছু মেলে কি না—অ্যাঁ?"

—"যা ভালো বুঝিস কর। আর হ্যাঁ, তাই তো ঠিক। কিন্তু একি! চেয়ে দেখ, ছুঁড়ীরা সব, সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে যে ওর। উঃ, কী বোকা মেয়ে! এই, নে চটপট! কাপড়-চোপড় ছাড় এখন! ছোট্ট ফর্সা মান্‌কা, নয় তো তুই ভাই তামারোচ্‌কা, দে তো রে ওকে শুকনো পাজামা এনে একটা, আর একজোড়া গরম মোজা আর চটিজুতো।"—তারপর লিউব্‌কার দিকে ফিরে বলে।" "বল দেখি, বোকা কোথাকার, কী হয়েছিল, সব খুলে বল আমাদের।'

—নয়—

যেদিন প্রত্যূষে অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ আনা মারকোব্‌নার প্রমোদভবন থেকে লিউব্‌কাকে সরিয়ে নিয়ে যায় লিখোনিন, সেদিন ছিল গ্রীষ্মের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি—গাছপালায় সবুজের সমারোহ; বাতাসের মধু সৌরভে, পত্রে পুষ্পে, তৃণলতায় আসন্ন শরতের সকরুণ মোহন ইঙ্গিত—সুদূরের হাতছানি। মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে লিখোনিন—নির্মল, নিষ্পাপ, শান্ত বনশ্রী। লোকলোচনের অগোচরে রাতের অন্ধকারে পৃথিবীর বুকে নেমে এসে স্বহস্তে সারি সারি বৃক্ষরোপণ করে রেখে গেছেন বুঝি স্বয়ং ভগবান। নদীনালা-খালবিলের বুকে ঘুমন্ত নীল জলরাশির শান্ত শোভার দিকে মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন স্বয়ং বনলক্ষ্মী। বর্ষাস্নাত প্রদোষের আকাশ সবে জেগে উঠছে তখন, তন্দ্রা-জাগরণের সন্ধিক্ষণে অলস-মধুর মৃদু রক্তিম হাসিতে প্রভাত রবিকে জানাচ্ছে অভিনন্দন।

প্রভাতের এই অপরূপ শোভায়, প্রাণের প্রাচুর্যে, জনাকীর্ণ ধূমমলিন কক্ষে রাত্রি জাগরণের পর বাইরের নির্মল বায়ুসেবনে, বিকশিত, স্পন্দিত হয়ে উঠল লিখোনিনের অন্তর। মহৎ কর্মের উদার আত্মপ্রসাদ বর্ধিত করে তুলল সে অন্তরতম অনুভূতিকে।

হাঁ, মানুষের মতো কাজ করেছে বটে সে! ওরা সব আসবে যাবে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কইবে কত কথা, আদরে-সোহাগে ছেয়ে দেবে সোন্নেচ্কা মারমেলাদোবাকে বেচারী যখন ভয়ের গল্প শুনে ব্যাকুল হয়ে এসে দেবে ধরা বুকের কাছটিতে—তারপর? তারপর যা হবার তাই। সব্বাই তা জানে। ফুঃ! কিন্তু তার কাছে, এই লিখোনিনের কাছে, যেই কথা সেই কাজ।

আরও ঘেঁসে এসে লিউব্কার কোমর জড়িয়ে ধরেলিখোনিন, চোখে তার মমতা-ভরা, প্রায় যেন প্রেমেরই, দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় সে তো এতক্ষণ লিউব্কাকে দেখছিল বাপ কি ভাইয়ের চোখে।

লিউব্কার কিন্তু চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে; পাছে সত্যি-সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে, তাই থেকে থেকে বেচারা ডাগর ডাগর করে চোখ চাইছে; ঠোঁট দু'খানায় কিন্তু এখনও সেই সরল শিশুর মতো অবোধ, ক্লান্ত মৃদু হাসিটুকু।

—"লিউব্কা, লক্ষ্মীটি আমার! মাণিক আমার! চিরদুঃখিনী মেয়ে! চেয়ে দেখো কী সুন্দর চারদিক! চেয়ে দেখো, লক্ষ্মীটি, ঐ যে সুমুখে উষার উদয়। প্রভাতের আর দেরি নেই! এ তোমারই জীবন-প্রভাত, লিইবোচ্কা! তোমার নবজীবনের সূর্যোদয়। নির্ভয়ে তুমি আমার এই সবল বাহুতে ভর দিয়ে এসে দাঁড়াও। আমি তোমায় সৎপথে নিয়ে যাব, উত্তীর্ণ করে দেব জীবনের জয়যাত্রা-পথে, জীবনের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াবে তুমি।"

আড়চোখে লিখোনিনকে চেয়ে দেখে লিউব্কা! "মদের নেশা কাটে নি এখনও," মমতা ভরে মনে মনে ভাবে সে: "তা হক গে যাক, ছেলেটি কিন্তু বেশ দরদী আর ভালোমানুষ গোছের। তবে একটু যেন সাদামাটা ধরণের।" তারপর আধো-ঘুমন্ত মৃদু হাসি হেসে অভিমানের সুরে বলে সে: "হুঁ! আমায়ও ঠকাবে, তায় ভুল নেই। তোমরা পুরুষ মানুষরা সব্বাই সমান। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুখটি আদায় করে নিয়ে, শেষে আর চিনতে পার না!"

—"আমি? অ্যাঁ? আমি কি তাই করতে পারি!",—খালি হাতখানা দিয়ে নিজের বুকে এক কিল মেরে দরদভরে বলে ওঠে

লিখোনিন : "আমায় তুমি ভুল বুঝেছ তবে? কোনও অসহায় মেয়েকে ঠকাবার মতো স্বভাবই নয় আমার। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার মনকে শিক্ষিত করে তুলব, দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত করে দেব তোমার, আর জীবনে তুমি যে সব দুঃখকষ্ট পেয়েছ তা' যাতে ভুলতে পার সেই চেষ্টাই করব চিরদিন। আমি হব তোমার পিতা, তোমার ভ্রাতা। তোমাব প্রতিটি পদক্ষেপ নিরাপদ করে রাখব আমি। আর যদি কখনও তুমি কাউকে সত্যিই বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভালবাসতে পার তবে আমি আজকের দিনের এই ক্ষণটিকে এই বলে মনে মনে স্মরণ করব যে এই দিনে এমনই এক সময়ে আমি এই ঘোরতর নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে এনেছিলাম তোমায়।"

এই ওজস্বিনী বক্তৃতা শেষ হতে গাড়োয়ান বেচারা বিজ্ঞের মতো চুপি চুপি এমনই হাসতে সুরু করে দেয় যে তার সে মুখ টিপে হাসার চোটে পিঠখানা কেবলই ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। এ রকম বক্তৃতা চুপচাপ করে প্রায়ই শুনতে হয় ঠিকে গাড়ীর গাড়োয়ানদের।

লিউব্‌কা ভাবলে লিখোনিন কী জানি কেন চটে গেছে তার 'পরে, নয়তো, আগে থাকতেই তার কোনও ভাবী নাগরের কথা ভেবে হিংসেয় জ্বলতে সুরু করেছে। সজাগ হয়ে ওঠে সে ; অবোধ মিনতি-ভরা ডাগর ডাগর চোখদুটি মেলে ফিরে চায় তার দিকে, তারপর তার কোমরে জড়ানো হাতখানা আস্তে করে ছুঁয়ে বলতে থাকে, "রাগ কোরো না, প্রাণ! তোমায় ছেড়ে আর কথ্‌খনো ভালবাসতে যাব না আমি। এই কথা দিলাম তোমায়, ভগবান সাক্ষী! কথা দিচ্ছি, কথ্‌খনো তা করব না! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে আমি জানি তুমি আমায় যত্ন-আত্তি করতে চাইছ? তুমি বুঝি ভাবছ আমি তা বুঝিনে? কেন, তুমি এমন পছন্দসই, চমৎকার ছোকরা! আর হ্যাঁ, যদি হতে বুড়ো, গেঁয়ো..."

—"আহা! আমার কথ ঠিক ধরতে পারনি তুমি,"—চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন, তারপর ফের সেই গুরুগম্ভীর কায়দায় সুরু করে দেয় নরনারীর সমানাধিকার, শ্রমের মর্যাদা, ন্যায়নীতি, স্বাধীনতা, প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান, এই সব নিয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা।

এত কথার একটি বর্ণও বোধগম্য হয় না লিউব্‌কার। কেবলই তার নিজেকে দোষী মনে হয়, তাই একেবারে আগাগোড়া সঙ্কুচিত হয়ে বিষণ্ণ হৃদয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রয় বেচারা। আর একটু হলে বোধহয় সেই পথের মাধ্যেই কেঁদে ভাসিয়ে দিত সে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার আগেই গাড়ী এসে দাঁড়ায় লিখোনিনের ডেরায়।

—"এই যে বাড়ী এসে গেছি,"—বলে ওঠে লিখোনিন, "এই গাড়োয়ান, রোকো, রোকো!"

তারপর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে একহাত লিউব্‌কার দিকে বাড়িয়ে খুব খানিকটা দরদ-ভরা সুরে আবৃত্তি না করে থাকতে পারে না সে:

শূন্য এ ভবনে মম শান্ত দ্বিধাহীন,
এসো আজি গৃহলক্ষ্মী, হও সমাসীন।

বুড়ো গাড়োয়ানের মুখে আবার সেই অতলস্পর্শী মৃদু হাসির ছটা—ভবিতব্যের নিগূঢ় ইঙ্গিত!

—দশ—

লিখোনিন যে ঘরটায় থাকত তা ছিল সাড়ে পাঁচতলায়। সস্তা একখানা পায়রার খোপ যেন। শীতকালে যেমন শীত, গ্রীষ্মকালে তেম্নি গরম। ধীরে ধীরে অতি কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে লিউব্‌কা, ভয় করে এই বুঝি ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যায়। আর সারাক্ষণ লিখোনিন সাহস দিয়ে চলে তাকে: "লক্ষ্মীটি, ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, না? এসো আমার গায় ভর দিয়ে উঠবে এসো। আমরা একটানা ওপরের দিকেই চলেছি, অ্যাঁ! কেবল উর্ধ্বে, আর উর্ধ্বে! এই তো মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক—নয়? এসো আমার সাথী, আমার বোনটি, আমার গায়ে ভর দিয়ে চলবে এসো!"

লিউব্‌কার হয় ঠিক বিপরীত। একা নিজেকেই টেনে তুলতে

পারছে না সে, তার 'পরে আবার লিখোনিন। তবুও যদি বকবকানি ওর থামত একটুখানি, ভারী বেসুরো লাগছে এখন।

যাক, তবুও শেষটায় ঘরে এসে পৌঁছানো গেল, তাই রক্ষে! দোরে চাবি নেই, থাকতও না কখনও। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, জানলার পর্দাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভেতর ইঁদুরের গন্ধে আর কেরোসিনের গন্ধে মাখামাখি, কালকের তরিতরকারির ঝোল মেজেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে; ময়লা বিছানার চাদর, তামাকের কূটকূটে ধোঁয়া—সব যেন মেশামেশি হয়ে রয়েছে। সেই আধো আলোআঁধারে ঠিক ঠাহর হয় না, কিন্তু এক কোণে কে-একটা লোক পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে যেন।

পর্দাটা একটু তুলে দিলে লিখোনিন। গরীব ছাত্রদের থাকবার ঘরের সর্বত্রই যা দুর্দশা এখানেও ঠিক তাই: এবড়ো-থেবড়ো বিছানা, তার কম্বলখানা কুঁচকে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে; টেবিলের একখানা পায়া কোথায় যেন গেছে তার পাত্তা নেই; একটা বাতিদান, কিন্তু মোমবাতির চিহ্নও নেই সেখানে; মেজেয় সিগ্রেটের টুকরোর ছড়াছড়ি; আর বিছানার উল্টোদিকে দেয়ালের কোল ঘেঁসে পুরোনো ভাঙা পাটাতনের 'পরে কে-এক ছোকরা হাঁ করে পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে।

—"ওঠ, ওঠ, হেই নীরেরাৎ, ওঠে পড চটপট!"—ছোকরার পাঁজরে ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচাতে লাগল লিখোনিন: "এই প্রিন্স!"

—"উঁম্—ম্—ম্......"

—"গুষ্টিশুদ্ধ জাহান্নমে যা! স্বর্গে যেন ঠাঁই না হয় কোনদিন! নন্দনবন চোখে না পড়ে কোন জন্মে! ওঠ, উঠে পড়, জানোয়ার কোথাকার! এই কিন্‌টোস্কা!..."

—"কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছ বেচারাকে, লক্ষীটি?"—লিখোনিনের হাত ধরে মিনতি করে বললে লিউবকা: "হয়তো বড্ড ঘুম পেয়েছে ওর, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়। ও ঘুমোক একটু। তার চেয়ে আমি বরঞ্চ বাড়ী চলে যাই এখন। গাড়ীভাড়ার জন্যে একটা আধুলি দিতে পারবে তো? কাল আমার কাছে এসো—কেমন, লক্ষীটি আমার?"

লিখোনিন একটু অবাক হলো লজ্জাও পেল। আর একজন ঘুমন্ত

লোকের 'পরে এই ঘুমন্ত মেয়েটির এতখানি দরদ, ভারী অদ্ভুত বোধ হলো তার। কিন্তু সে শুধু ক্ষণেকের তরে। পর মুহূর্তেই কী জানি কেন মনে মনে একটু বিরক্তও হয়ে উঠলো সে। কিছু না বলে, নীয়েরাতের যে-হাতখানা ঝুলে পড়ে মেজেতে লুটোপুটি খাচ্ছিল—একটা আধপোড়া সিগ্রেট তখনও আটকে রয়েছে দু'আঙুলের ফাঁকে—সেখানা শক্ত করে ধরে কড়া গলায়ই বলে উঠল সে : "শোন, এই নীয়েরাৎ, স্পষ্টাপষ্টি বলছি তোকে। বুঝলি, এই গোল্লায় যা তুই, শোন, আমি একা আসি নি, সঙ্গে একটি মেয়েছেলে আছে। এই শূয়ার!"

মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজি খেলে গেল যেন ; যে ছিল শুয়ে, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল সে, হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে মেয়েটিকে দেখে থ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম আঁটতে লেগে গেল, তারপর বিড়বিড় করে বল্লে : "আরে, লিখোনিন যে! তোর জন্যেই তো অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অচেনা সখীকে একটু পাশ ফিরে দাঁড়াতে বল না, ভাই!"

তারপর তাড়াতাড়ি কোটখানা গায়ে চাপিয়ে দু'হাতের আঙুল দিয়ে লম্বা লম্বা চুলগুলো পাট করে নিয়ে যথাসম্ভব সভ্য ভব্য হয়ে বসল। মেয়েছেলে মাত্রেরই-যা চিরকালের স্বভাব, লিউব্কাও দেয়ালে টাঙানো আরশীখানার দিকে এগিয়ে গিয়ে খোঁপাটা একটু ঠিক করে নিলে। চোখের ইসারায় জিজ্ঞেস করলে নীয়েরাৎ—মেয়েটি কে?

—"যে-ই হোক, তোর তাতে কী?"—চেঁচিয়েই জবাব দিলে লিখোনিন : "চল, তবে বাইরে যাই। খুলে বলছি সব। হ্যাঁ, কিছু মনে কোরো না, লিউবোচ্‌কা, এই এক মিনিটের জন্যে। এক্ষুণি ফিরে এসে তোমার সব বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে ফের একদম হাওয়া হয়ে যাব।"

—"কেন, আর ঝঞ্ঝাট করে দরকার কী?"—উত্তর দিলে লিউব্‌কা : বেশ চলবে আমার ওই পাটাতনটার 'পরে। তুমি এই বিছানায়ই শুয়ে পোড়ো এসে।"

—"না গো না, দেবী আমার, সেটা ঠিক মানানসই হয় না আর। এখানে আমার এক সতীর্থ রয়েছে। আমি তারই ওখানে গিয়ে শোব। এক্ষুণি ফিরে এলাম বলে।"

দুই ছাত্রই বেরিয়ে চলে গেল।

—"কিবা অর্থ এ স্বপ্নের? কোথা হতে এল নেমে মোহন মূরতি?"—স্বপ্নালস চোখদু'টি মেলে জিজ্ঞেস করলে নীয়েরাৎ: "কোত্থেকে এই ঘাগরাপরা সাথীটিকে কুড়িয়ে পেলি রে?"

পরম বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে মুখ বানালে লিখোনিন। দিনের আলো ফুটে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতানুগতিকতার কথা ভেবে আত্মসম্বিৎ ফিরে এসেছিল তার। ইতিমধ্যেই সে অনুভব করছিল কাজটার অন্তর্নিহিত বৈসাদৃশ্য, এর অনাবশ্যকতা। তাই নিজের প্রতি আর এই যে মেয়েটিকে সে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে তার 'পরেও কেমন যেন একটু বিরূপ হয়ে উঠছিল সে মনে মনে। কাজটার দুরূহ দায়িত্ব, বন্ধুবান্ধবদের অর্থপূর্ণ হাসি, অবান্তর প্রশ্ন, পরীক্ষার সময়কার নানা রকমের ব্যাঘাত, সব কথাই এখন ভবিতব্যের মতো তার অন্তরে উদয় হচ্ছে একে একে। তবুও নীয়েরাতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই মনে মনে সে নিজেরই ভীরুতার জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ল। তাই প্রথমে নিরুৎসাহ ভাব নিয়ে সুরু করলেও শেষটায় একদম রাশ ছেড়ে দিয়ে যেতে উঠল সে: "দেখ, প্রিন্স, ভুল করছিস তুই। এ ওই ঘাগরা-পরা সাথী নয় রে, এ হলো গিয়ে ...এই...আমরা ক'জন সতীর্থ মিলে গিয়েছিলাম ইয়ামকাতে, মানে, যাইনি ঠিক, বলতে গেলে একবার ঘুরপাক খেয়ে এলাম আনা মারকোব্‌নার ওখান থেকে..."

—"কারা কারা রে?"—উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করলে নীয়েরাৎ।

—"তা দিয়ে কী করবি তুই? তোলপাইগীন ছিল, রামেশিস ছিল, একজন সাব-প্রোফেসরও ছিলেন—ইয়ারশেঙ্কো, বোরিয়া সোবাসনিকোব, এই রকম আরও জনকয়েক...সবার নাম মনে পড়ছে না এখন। সারাটা দিন তো কেটেছে নৌকো বেয়ে, তারপর ভাঁটিখানায় ঢুঁ মারা গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম একপাল শূয়োর যেন ঐ ইয়ামকার দিকে। তুই তো জানিস আমি হচ্ছি খুব পিটপিটে লোক। আমি শুদ্ধু বসে বসে মদে চুরচুরে হয়ে উঠতে লাগলাম আমার একজন চেনা সাংবাদিকের সঙ্গে। ইদিকে, আর আর সব্বাই তো এক এক করে পাপের পথে পা বাড়ালে। আর তাই ভোরবেলার দিকে কী জানি

কেন মনটা আমার ভারী মুশড়ে পড়ল। এই সব দুখিনী মেয়েদের দেখে প্রাণ উঠল কেঁদে। মনে পড়ল, আমাদের বোনেরা আমাদের কতখানি স্নেহ, ভালোবাসা, আর রক্ষণাবেক্ষণের পাত্রী; আমাদের মায়েদের কী অসীম শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে ঘিরে রাখি আমরা। বলুক তো কেউ একটা কর্কশ কথা তাদের, দিক না একবার গায়ে হাত, অসম্মান করুক দিকিনি, তক্ষুনি দাঁত দিয়ে তার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব না! তাই নয় কি?"

—"উঁ···ম?"—কতকটা প্রশ্নচ্ছলে, কতকটা আরও কিছু শোনবার আশায়, তার চোখের দিকে চেয়ে শুধু একটা শব্দ করলে নীয়েরাৎ।

—"তারপর মনে হলো: কেন, যে কোনও বদমাইস লোক, যে-কোনও একটা বাজে ইতর লোক, যে-কোনও এক বুড়োহাবড়া এসে তো দিব্যি স্বচ্ছন্দে এদের যে-কোনও মেয়েকে কেবল একটা খেয়ালের বশে, ইচ্ছে হয় এক মুহূর্তের জন্যে, ইচ্ছে হয় সারারাতের জন্যে, নিয়ে চলে যেতে পারে; আর অসীম অবহেলায় হাজারো বারের পর ফের আর-একবার নারীত্বের সেই বস্তুটিকেই কলুষিত কলঙ্কিত করে রেখে চলে যায় যা হলো মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ—প্রেম।······বুঝতে পারছ—নিগৃহীত করে, পদদলিত করে চলে যায়, বিনিময়ে অর্থ দিয়ে মূল্য ধরে দিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে পকেটে হাত গুঁজে শিষ দিতে দিতে পথ চলে সে। আর সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা এই যে, এ তাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটির কাছেও এ আর কিচ্ছু নয়, ছেলেটির কাছেও নয়। অন্তরের অনুভূতি গেছে মরে, আত্মার দিব্যজ্যোতি পড়েছে ম্লান হয়ে। তাই নয় কি? তবুও এদের প্রত্যেকটি মেয়ের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে চলেছে একটি করে অপার্থিব ভগিনী, এক-একটি সতীলক্ষ্মী জননী। অ্যাঁ? এই কি সত্যি নয়?"

—"অ্যাঁ?···" শুধু একটা শব্দ করে উঠল নীয়েরাৎ।

—"তাই ভাবলাম: লম্বাচওড়া কথায় লাভ কী! সভাসমিতিতে যত সব ভণ্ডামির বক্তৃতা, গোল্লায় যাক সে সব। রসাতলে যাক গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ, আইনকানুন, মাগদালেন আশ্রম, আর এই সব আড্ডায় গিয়ে ধর্মগ্রন্থ বিতরণ! জাগ্রৎ হতে হবে আমায়, করতে হবে প্রকৃত সৎ লোকের কাজ, এই নরককুণ্ড থেকে অন্ততঃ একটি মেয়েকে উদ্ধার করে

নিয়ে যাব ; সুদৃঢ় ভূমিতে হবে তার স্থিতি ; দান করব শান্তি, জোগাব প্রেরণা, বিতরণ করব দয়া আর দাক্ষিণ্য।"

—"হুঁ—ম্!"—মুখভঙ্গি করলে নীয়েরাৎ।

—"অ্যাঁ, প্রিন্স! মনের মধ্যে তোর সদাসর্বদা খেলছে যত নষ্টামি। কিন্তু বুঝে দেখ, আমি কোনও মেয়েমানুষের বিষয়ে কথা কইছি না, কথা কইছি একটি মানুষের বিষয়ে ; রক্তমাংসের কথাই এ নয়, এ হচ্ছে গিয়ে আত্মার কথা।"

—"বেশ, বেশ, আত্মারাম, চলুক! তারপর?"

—"তারপর, যেই না ভাবা সেই না কাজ! আজই নিয়ে এলাম মেয়েটিকে আনা মারকোব্‌নার ওখান থেকে। আপাততঃ থাকবে ও আমারই কাছে। পরে—ভগবান যা করেন। গোড়ায় একটু লিখতে পড়তে শেখাব ; তারপর ওর জন্যে একটা ছোট্ট দেখে খাবারের দোকান করে দেব, নয় তো, ধর, এই মুদিখানা একটা। বন্ধুবান্ধবরা যে সাহায্য করতে বিমুখ হবে তা মনে করিনে। দেখ, ভাই প্রিন্স, মানুষের প্রাণের —প্রত্যেকেরই প্রাণের—প্রয়োজন হলো মমতা, আন্তরিকতা। আর দেখিস তখন এক বছর, কি দু'বছরের মধ্যেই সমাজের মধ্যে আবার ফিরে আসব আমি—একটি সচ্চরিত্র, শ্রমশীল, সুযোগ্য সদস্য রূপে, কুমারীর মতো শুচিশুভ্র অন্তর নিয়ে, বিচিত্র মহৎ সম্ভাবনার বীজ বহন করে।...ও তো কেবল দেহদানই করেছে, অন্তরাত্মা তো রয়েছে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।"

জিব দিয়ে শুধু টক্ টক্ শব্দ করতে লাগল প্রিন্স।

—"এর মানে কী রে, এঁড়ে-খচ্চর?"

—"একটা সেলাইয়ের কল কিনে দে না ওকে, অ্যাঁ?"

—"বিশেষ করে সেলাইয়ের কল কেন? বুঝতে পারলাম না, ভাই।"

—"কেতাবে ওই রকমই লেখে কি না, আত্মারাম, তাই। যেই না নায়ক উদ্ধার করলে এক চিরদুঃখিনী হতভাগীকে, অমনি দিলে কিনে একটা সেলাইয়ের কল।"

—"ভাঁড়ামি রাখ এখন,"—চটে গিয়ে হাত-ঝাপ্টা দিয়ে তাকে বিদায় করে দেবার ভঙ্গিতে বলে লিখোনিন : "সঙ এয়েছেন আর কী!"

নীয়েরাৎ গেল ক্ষেপে। চোখদুটো তার উঠল জ্বলে, কথার মধ্যে স্পষ্ট বেরিয়ে এল ককেসিয়ান টান, বলতে লাগল সে : "না গো, ভাঁড়ামি নয় গো, আত্মারাম! এ দু'য়ের একটা-না-একটা ঘটবেই ঘটবে। কিন্তু যাই ঘটুক ফল সেই একই। হয়, তুমি মাস পাঁচেক ওকে নিয়ে থাকবার পর ফের দূর দূর করে রাস্তায় বার করে দেবে, আর ও তখন ফের সেই বেশ্যাবাড়ীতে ফিরে যাবে, কি পথে পথে ব্যবসা চালিয়ে বেড়াবে। এ হতেই হবে! নয়, তুমি ওকে নিয়ে না থাকতে পার বটে, কিন্তু ওর ওপর যত রাজ্যের হাতের কাজ, কি মাথার কাজের এম্নি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ওর অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে গড়ে তুলতে চাইবে যে বিরক্তির চোটে একদিন তোমায় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হয় ও পথে এসে দাঁড়াবে, নয় গণিকালয়ে ফিরে যাবে। এ-ও সত্যি কথা। অবিশ্যি আরও একটা ব্যাপার ঘটলেও ঘটতে পারে। তুমি হয়তো ঠিক ভাইয়ের মতো, কি সেই নাইট ল্যান্সেলটের মতো, যাই হোক, ওর জন্যে খেটে খেটে সারা হয়ে যাচ্ছ, আর ও এদিকে গোপনে গোপনে আর কারো সঙ্গে নটঘট সুরু করে দিয়েছে। আরে আত্মারাম, জেনেই রাখো আমার কাছ থেকে যে, ওই যে মেয়েমানুষ একবার যখন ও মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে তখন চিরদিনই ও মেয়েমানুষ। আর সে লোকটাও দিনকয়েক ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মাস তিনেক কাটতে না কাটতেই দূর করে ওকে দেবে ছেঁটে ফেলে-হয় রাস্তায়, নয় বেশ্যালয়ে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে লিখোনিন। ঠিক মনের মধ্যে থেকে নয়, কিন্তু অন্তরের কোন অন্তস্থল থেকে, চেতনার অগম্য গহন গোপন প্রদেশ হতে হঠাৎ এই ধরণের একটা ভাব তার মধ্যে উদয় হলো যে নীয়েরাৎ যথার্থই বলেছে। কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে, হাত ছুঁড়ে, বিজয়ী বীরের মতো বলে উঠল সে : "এই বলে রাখলাম, দেখো, আজ থেকে ছয়মাস পরে কথা ফিরিয়ে নিতে হবে তোমায়, আর খেসারৎ বাবদ, বুঝলি রে বোকা পাঁঠা কোথাকার, এক ডজন বোতল ক্যাখেটাইন মদ দিয়ে আমার তুষ্টি বিধানের জন্যে পূজো দিতে হবে তোকে তখন।"

—"ওয়া! বহুৎ খুব!"—প্রিন্সের হাতখানা এসে সজোরে

লিখোনিনের হাতের 'পরে পড়ে সশব্দে তাল ঠুকে দিলে : "মেরে দিলকে খুশ! কিন্তু আমার কথা যদি ফলে যায়—তুই খাওয়াবি আমায়?"

—"তাই সই! আচ্ছা, আসি তবে, প্রিন্স! কার ওখানে শুতে যাচ্ছিস, অঁ্যা?"

—"এই তো এই বারান্দায়, সোলোবিয়েবের ওখানে। তবে, হ্যাঁ, তুই কিন্তু, ভাই, সেকেলে নাইটদের মতো তোর মহীয়সী রোজামন্দ্ আর তোর নিজের মাঝখানটায় একখানা দুধার তরোয়াল রেখে শুতে ভুলিসনে যেন— বুঝলি?"

—"ক্ষ্যাপা না পাগল! আরে, আমি যে নিজেই সোলোবিয়েবের ওখানে রাত কাটাব ঠিক করেছিলাম। যাক গে, দেখি, পথে বেরিয়ে পড়ি তো এখন, তারপর যেখানে হোক একটা আস্তানা বেছে নিলেই চলবে—তা সে জাইতেবিচ, স্ট্রাম্প, যার কাছেই হোকগে যাক। বিদায়, প্রিন্স!"

—"আরে, দাঁড়া, দাঁড়া!"—নীয়েরাৎ পিছু ডাকল তাকে : "আসল কথা যে বলতেই ভু.ল গেছি : পাৎর্জান বেকায়দা?"

—"বটে? তাই না কি?"—অবাক হলো লিখোনিন, সঙ্গে সঙ্গে বেশ তোয়াজ করে লম্বা একটা হাই তুলে ফেল্লে সে।

—"হ্যাঁ। তবে ভয়ের কিছু নেই; খানকয়েক বে-আইনী বইপত্তর আর কী কী যেন সব। এক বছরের বেশি ফাটক হবে না।"

—"ও কিছু নয়; ও, বাবা, চিমড়ে ছোঁড়া, বেড়ে কাটিয়ে দিতে পারবে'খন।"

"ঠিক বলেছিস, চিমড়ে ছোঁড়া,"—সায় দিলে প্রিন্স।

—"বিদায়!"

—"আসি তবে, নাইট গ্রুনওয়াল্‌ড্‌জ?"

—"এসো, আমার কাবার্দিনিয়ান মদ্দাঘোড়া!"[1]

—এগারো—

একা পড়ে রইল লিখোনিন। সারারাত জেগে কাটিয়ে, মনের মধ্যে এসেছে তার একই সঙ্গে অবসাদ আর উন্মাদনা। প্রাত্যহিক জীবনের সীমারেখা পার হয়ে এসেছে যেন সে, প্রতিদিনের পরিচিত জীবনযাত্রার ছবি ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে কোন্ সুদূরে—মন তার উদাসীন। অথচ তারই সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাধারায়, তার অন্তরাবেগে. ফুটে উঠেছে এক অপার্থিব নির্মলতা, শান্ত নির্লিপ্ত পরিচ্ছন্নতা, আর অন্তরের অন্তস্থলে বয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন বৈরাগ্যের ফল্গুধারা—স্বচ্ছ পরিনির্বাণের পরম আকৃতি।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে লিখোনিন। আশেপাশে, পায়ের নীচে, কত লোক ঘুমোচ্ছে অকাতরে—ভোরের ঘুম। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস তাদের ওঠানামা করছে তালে তালে, মুখেচোখে কী কঠিন তামসিকতা —মৃতের চেয়েও বীভৎস ঘুমন্ত মানুষের মুখ!

হঠাৎ লিউব্‌কার কথা মনে পড়ে গেল তার। তাই তো! একবার চট করে গিয়ে দেখে আসা দরকার কেমন আছে বেচারা। সকালবেলার জন্যে চায়ের ব্যবস্থাটাও ওরই সঙ্গে সঙ্গে করে আসতে হয় এখন। তবুও নিজেকে বোঝালে সে—না, ও-সব কথা তো ভাবছে না সে মোটেই। তাড়াতাড়ি এসে রাস্তায় নেবে পড়ল সে।

একটি চাষী রমণী পথ চলেছে। কাঁধে তার দুধের বাঁক। যুবতী নয়, বয়স হয়েছে—রগের কোণে মিহি রেখা, নাকের পাশ দিয়ে মুখ অবধি গভীর ভাঁজ, তবুও গালদুটিতে গোলাপী আভা, ছোট ছোট চোখদুটিতে চটুল হাসি। বাঁকের ভারে আর চলার স্বচ্ছন্দ গতিতে তালে তালে নিতম্বদু'টি ডাইনে-বাঁয়ে দুলে দুলে উঠছে—ঢেউখেলানো ভঙ্গিটির মধ্যে কেমন একটা বিলোল লালসার মাধুরী জড়িয়ে আছে যেন।

—'চণ্ডী মেয়েমানুষ, রঙ্গেভঙ্গে জীবন কাটিয়ে এসেছে এতদিন,'—

মনে মনে ভাবলে লিখোনিন। হঠাৎ কিন্তু ঠিক তাকেই পাবার জন্যে দুর্বার কামনার সঞ্চার হলো তার প্রাণে—এই যে একটি নারী, সম্পূর্ণ অপরিচিত, গ্রাম্য, বিগতযৌবনা, হয়তো নোংরা আর ইতরও হবে, কিন্তু তবুও যেন একটি ফলন্ত পাকা আপেল ফল মাটিতে খসে পড়েছে, কীটদষ্টও যে হয়নি তা নয়, তা বুঝি বেশ একটু কিছুকালই হয়ে গেল মাটিতে পড়ে রয়েছে এটি, তবুও তার বর্ণ-বৈভব, তার মদিরা-রস-সৌরভ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি এখনও।

হৈ হৈ করতে করতে সুমুখ দিয়ে চলে গেল একখানা শবযাত্রার গাড়ী—খালি গাড়ী, সামনে একজোড়া ঘোড়া, পেছনে বাঁধা আর এক জোড়া। মশালচি আর কবর-খোঁড়ার লোকজন সব মিলে মদে চুরচুরে হয়ে গলা ফাটিয়ে আবোল-তাবোল গান গাইছে। 'শব-শোভাযাত্রার জন্যে তাড়াহুড়ো করে চলেছে লোকগুলো, কিংবা হয়তো শেষ করেই ফিরছে এখন, কে জানে?'—মনে মনে ভাবলে লিখোনিন: 'মালদার লোক বটে সব!'

বড়ো রাস্তায় এসে পথের ধারে একখানা কাঠের বেঞ্চিতে বসে পড়ল লিখোনিন। দু'ধারে সারি সারি শত বৎসরের পুরোণো চেস্টনাট গাছ—ডালপালা মেলে ক্রমে ক্রমে কাছাকাছি হতে হতে শেষটায় একেবারে একখানি সুদীর্ঘ সবুজ তীরের মতো হয়ে পরস্পরের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল নববসন্তের দিনটিতে সে ঠিক এইখানে এই আসনটার 'পরেই এসে বসে ছিল। শান্ত বিনম্র সন্ধ্যা ধীরে নীরবে ঘুমিয়ে পড়ছিল যেন তার চোখের সুমুখটিতে—ঠিক যেন হাস্যমুখী ক্লান্ত কুমারী মেয়ে। গাছে গাছে গোলাপী ফল ধরেছে—কে যেন এসে মনের ভুলে আজ ঘরে ঘরে বড়োদিনের দেয়ালী সাজিয়ে রেখে চলে গেছে। 'হায়, আজ যেখানে ফলে ফলে পাক ধরেছে, কাল সেখানে ছিল থরে থরে বাসন্তী ফুলের রঙিন মেলা,' লিখোনিন ভাবতে লাগল বসে বসে: 'কোথায় গেল সে ফুলের ডালা! আবার বসন্ত আসবে, চলে যাবে আবার। হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!' হঠাৎ খেয়াল হলো তার চোখ জ্বালা করে জল এসে গেছে কখন।

উঠে পড়ল লিখোনিন। বিশ্ববিধাতার নিজ হাতে গড়া এই পৃথিবীটাকে নতুন করে দেখছে সে যেন আজ—দেখছে তিল তিল করে, এই বুঝি প্রথম তার জীবনে। হন্ হন্ করে তার পাশ দিয়ে কাজে চলে গেল একদল রাজমিস্ত্রী—ছবির মতো যেন।

নিউ কিষেণেবৃস্কী মার্কেট পেরিয়ে আসতে হলো তাকে। হঠাৎ খাবাবের গন্ধ নাকে আসতে মনে হলো তার দুপুরের পর থেকে এখনও খায়নি কিছু সে, তক্ষুণি ক্ষিদে পেয়ে গেল তার। এককালে প্রায়ই যখন উপোস করে থাকতে হতো, তখন এখানে এসেই রুটি-তরকারি কিনে খেত সে। এক টুকরো সসেজের দাম পড়ত দশ কোপেক, আর একখানা রুটি ছিল দু' কোপেক।

বাজারের পথ লোকে লোকারণ্য। দূর থেকেই কানে এল তার বাজনার শব্দ। ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে দেখে একদল পসারিণী নিজেদের মধ্যেকার নিত্যনিয়মিত ঝগড়াঝাঁটি গালমন্দ ভুলে সখী সেজে নাচনা গাওনা নিয়ে মেতে উঠেছে কাল সন্ধ্যা থেকে। রাতভোর চলেছে মাতামাতি। আসরের ঠিক মাঝখানটিতে বছর পাঁয়তাল্লিশেকের এক মেয়েমানুষ, দেখতে তখনও বেশ সুন্দরী রয়েছে সে, ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে চলেছে :

ঐ বাজে, প্রাণ, সারেঙ্গী ঐ।
—বঁধু পথের 'পরে,
মা দিয়েছে দোরে কাঁটা,
বেরোই কেমন করে!

লিখোনিন চিনত তাকে ; এই সেই মেয়েছেলেটি যার কাছে টানাটানির দিনে ধারে মাল পেত সে। মেয়েমানুষটিও চিনতে পারলে তাকে, বোঁ করে ছুটে এসে একেবারে জড়িয়ে ধরলে তাকে, বুকের ভেতর চাপতে চাপতে সোজাসুজি একেবারে তার ঠোঁটের 'পরে নিজের ভিজে, গরম মোটা মোটা ঠোঁট-জোড়া চেপে ধরে বারবার চুমো খেতে খেতে হয়রান করে দিল বেচারাকে। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে এক হাতের চেটো দিয়ে আরেক হাতের চেটোয় তাল ঠুকে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে

গদ্গদ স্বরে বলতে লাগল সে : "প্রাণ আমার, জীবনসর্বস্ব আমার, বঁধু আমার! মদ খেয়েছি বলে ক্ষমা করো এবারটির মতন তোমার এ অভাগী স্ত্রীকে। কী হয়েছে তাতে? একটু আমোদ করছি বৈ তো নয়!"

আবার বোঁ করে ছুটে এল সে লিখোনিনের হাতে চুমো খাবে বলে; বলতে বলতে এল : "আমি তো জানি, কত কোমল তোমার প্রাণ, আর পাঁচজনের মতো কঠিন নও তুমি। কৈ! তোমার হাতখানা এগিয়ে দাও, প্রাণের প্রাণ আমার গো! আমি যে তোমারই ওই মিষ্টি হাতখানায় চুমু দিতে চাই গো! না গো না! চাই গো, চাই গো আমি, চাই গো তোমায়!......"

—"সে কী কথা, গ্রাইসেরা মাসী!"—হঠাৎ কেন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল লিখোনিন : "এসো, তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা দু'টিতে এই ভাবে চুমু খাই এখন। কী মিষ্টি তোমার ঠোঁট দু'খানা, বাছা!"

—"আহা, প্রাণবল্লভ আমার! সোনার চাঁদ আমার! নয়নমণি আমার গো!"—গলে গেল গ্রাইসেরা : "দাও, ঠোঁটদু'টি এগিয়ে দাও গো তবে! হামি দিই, তবে!......"

উন্মত্ত হয়ে লিখোনিনকে তার বিশাল বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভিজিয়ে দিল সে একেবারে। তারপর তার জামার হাতা ধরে টানতে টানতে আসরের ঠিক মাঝখানটিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিল, আর নিজে হেলে-দুলে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে তালে তালে ধপাধপ করে তার চারদিকে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে চলতে লাগল মেয়েটা :

আউ! ফের লেব তোয়, হেই পারাস্কা
—খেয়ালখুশীর দায়,
বলি, আরে রে ছুটে আয়!
ঘাগরাতলায় মাকড়া পোষা,
কোঁচার তলায় হুল,
উঃ! চুলবুল চুলবুল!

তারপর বাজনদারদের বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে,

দেখতে দেখতে ধপ্ধপাধপ করে সুরু করে দিলে সে রুদে রুশিয়ানদের দুর্দান্ত 'গোপাক' নাচ :

আরে, আরে, চুক্ !
বাড় বেড়েচে বড্ড দেখি তোর !
ইল্লং তুই,
নোঙরা কেন কল্লি জামা তোর !

তাই তো বটে ! প্রিস্কো আমার,
করিস নে রে রাগ,
ভিজে যদি গিয়েই থাকিস,
মুছেই নে না দাগ !
তা না না না তা না না না
তা না না না তাগ্......

ঘাপটি মেরে ঘুমোয় খিমা
চুপটি করে শুয়ে,
মদ্দা কসাক শুয়েলো গ্যাখ,
মাদীর পাশে ছুঁয়ে।

স্যায়না মেয়ের বায়না,
কয় না কথা, কয় না,—
হ্যালা, করিস কেন ছল ?
হ' রে রসে ঢল মল !
তাই রে না না, নাইরে তা না,
তাইরে না না তল......

লিখোনিনের মাথায় খুন চেপে গেছে ততক্ষণে ; হঠাৎ মহা উৎসাহে সঙ্গিনীকে ঘিরে বোকাপাঁঠার মতো তড়াক তড়াক করে লাফাতে সুরু করে দিলে সে—যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ঘুরন্ত একটা গ্রহের উপগ্রহ। লিখোনিন এসে যখন ঢোকে এ আসরের মাঝখানে তখন সকলেই হ্রেষা-ধ্বনি করে তার অভ্যর্থনা করেছিল। এখন তাকে ধরে টেবিলে বসিয়ে

বোদকা আর সসেজ খাইয়ে দেওয়া হলো। নিজের গরজেই এক ভবঘুরেকে দিয়ে আনিয়ে নিলে সে বীয়ার, আর গেলাস হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে করলে তিন-তিনটে বাজে বক্তৃতা—একটা হলো উক্রাইনের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে, আর একটা হলো ক্ষুদে রুশিয়ার মেয়েদের রূপ আর ঘরকন্নার প্রশংসা করতে গিয়ে তাদের তৈরি সসেজের মাহাত্ম্য-কীর্তন, আর তেসরা দফায় চল্ল দক্ষিণ-রুশিয়ার ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে এক বক্তৃতা। সারাক্ষণ লিউকেরিয়ার পাশটিতে বসে তার কোমরে হাত জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল লিখোনিন; কিন্তু অমন লম্বা হাতখানায়ও তার পার পাচ্ছিল না। লিউকেরিয়া কিন্তু টেবিলের তলায় তার আগুনের মতো গরম, গোদা নরম হাতখানা দিয়ে এমন জোরে লিখোনিনের হাত চেপে ধরল যে বেচারার হাতে ব্যথা হয়ে গেল একেবারে।

বেশ চলছে সব। হঠাৎ কী নিয়ে যেন দুইজন পসারিণীর মধ্যে বেধে গেল ঝগড়া—একেবারে যেন দুই মোরগের লড়াই। কোমরে হাত দিয়ে মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জন, আর দুজনই দু'জনকে উদ্দেশ্য করে সব চেয়ে বাছা বাছা অকথ্য গালমন্দ করে চলেছে যত।

—"নেকী, একচোখী, কুত্তীর বাচ্চী!"—চেঁচাচ্ছে একজন: "তুই আমার এখানকারও যুগ্যি নস।" বলেই অপর পক্ষের দিকে পেছন ফিরিয়ে কোমরের তলায় থাবড়া মেরে দেখিয়ে দিলে সে: "এই যে, এখানকার, ঠিক এইখানকার!"

' —"ফের মিছে কথা বলছিস তুই, কুটনী মাগী কোথাকার! আমি ঠিকই আছি রে, ঠিকই আছি আমি!"

সুযোগ বুঝে উঠে পড়ল লিখোনিন—হঠাৎ কী-একটা কথা যেন মনে পড়ে গেছে তার।

—"তুমি একটু বসো, লিউকেরিয়া মাসী, আমি এই এলাম বলে।" —এক ছুটে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল সে।

—"ও কত্তা! কত্তা গো! যত শীগ্‌গির পার ফিরে এসো কিন্তু! এক্ষুণি! কথা আছে তোমার সঙ্গে!"—চেঁচিয়ে উঠল তার পার্শ্ববর্তিনী।

পথের বাঁকে এসে খানিকক্ষণ মনে মনে হাতড়ে বেড়ালে সে কী এমন জরুরী কাজ হাতে আছে তার যা এক্ষুণি, একেবারে এই মুহূর্তেই,

করা চাই তার! অন্তরের অন্তস্থলে জেগেই ছিল কথাটা, তবুও তা স্বীকার করতে গড়িমসি করতে লাগল সে কেবলই।

রীতিমতো বেলা হয়ে গেছে এখন। রাস্তায় রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়েছে। ফুলওয়ালীরা পথের ধারেধারে নানা রকম ফুলের ডালা সাজিয়ে নিয়ে বসে গেছে।

লিখোনিনের গোপন চিন্তাটা রূপ পেল এতক্ষণে। "এতক্ষণে লিউবকা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে নিশ্চয়,"—মনে মনে ভাবলে সে: "আর না-ই বা যদি জেগে থাকে, আমি গিয়ে পাটাতনটার ওপর একটু গাড়িয়ে নিই গে যাই।"

কেরোসিনের বাতিটা তখনও বারান্দার 'পরে ধোঁয়াচ্ছে পড়ে পড়ে। ওপর থেকে আলো প্রায় আসছেই না বল্লে হয়। দরজা শুধু ভেজানোই আছে। নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকে পড়ে লিখোনিন।

জানলার খড়খড়ির পাখি দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে ভোরের আবছা আলো। মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরম লোভীর মতো লিউবকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে থাকে লিখোনিন। গরম হয়ে শুকিয়ে এসেছে ঠোঁটদু'খানা তার, জিব দিয়ে চাটছে সে বারবার। হাঁটুদুটো কাঁপছে থর থর করে, আহা!

হঠাৎ তীরের মতো একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে যায় তার: "একবার জিজ্ঞেস করে দেখো কোনো কিছু চাই কি না ওর।"

চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে লিউব্‌কা—একখানা খালি হাত পাশে এলিয়ে পড়েছে, আর একখানা রয়েছে বুকের 'পরে নেতিয়ে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে লিখোনিন। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস ওঠানামা করছে তালে তালে। সুস্থ তরুণ দেহের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, ঘুমের মধ্যেও, রয়েছে একটি বিশুদ্ধতা—মদিরা সুরভি যেন। তার খোলা হাতখানির 'পরে সন্তর্পণে আঙুল বুলিয়ে দেয় লিখোনিন, স্তনপ্রান্তে দেয় মৃদু চাপ। "এ কী করছি আমি?"—অন্তর থেকে কানে আসে তার বিবেকের অস্ফুট আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন জবাব দিয়ে ওঠে তার হয়ে: "কৈ, কিছুই করছিনে তো আমি! একবারটি শুধু খবর নিতে এসেছি ভালো ঘুম হচ্ছে তো, চা-টা কিছু চাই কি!"

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় লিউব্‌কার, চোখ চায় সে, ফের চোখ বোঁজে, সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলে চায় আবার। লম্বা, বেশ লম্বা এক আড়া-মোড়া ভেঙে, মিষ্টি অবোধ হাসি হেসে, তপ্ত সবল বাহুলতা দিয়ে লিখোনিনের গলা জড়িয়ে ধরে সে।

"মধু আমার! প্রাণ আমার!"—গদগদ মনমাতানো সুরে কূজন করে ওঠে যেন: "তোমার জন্যে বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেল, রাগও হতে লাগল শেষে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনে, আর সারারাত ধরে শুধু তোমায়ই দেখেছি ঘুমের মধ্যে এতক্ষণ। এসো, কাছে এসো, লক্ষীটি আমার, এসো আমার মাণিক!" বুকের পরে টেনে নেয় তাকে লিউব্‌কা।

প্রায় কোনও বাধাই দেয় না লিখোনিন; সারা দেহ তার শীতে থরথর করে কাঁপছে যেন, দাঁতে দাঁত লেগে ফিস ফিস করে শুধু একটানা প্রলাপ বকে চলেছে বুঝি: "না, এই, লিউবা, অমন করে না···সত্যি, অমন করতে নেই, লিউবা···আহা, থাক এখন ওসব, লিউবা···দগ্ধো না আর আমায়···মুখ দেখাতে পারব না যে আমি···ছেড়ে দাও, এই, লিউবা, দোহাই তোমার!···"

—"বোক্‌-কা আম্‌-মার!"—সোহাগে সুখে মাতোয়ারা হয়ে হেসে উত্তর দেয় লিউব্‌কা: "এসো আমার কাছে, সুখটি আমার গো!"—সঙ্গে সঙ্গে লিখোনিনের শেষ ক্ষীণ বাধাটুকুও অবহেলে ঘুচিয়ে দিয়ে, তার মুখখানা নিজের মুখের 'পরে চেপে ধরে সে, উত্তপ্ত গভীর চুম্বন এঁকে দেয় সেখানে—জীবনে এই বুঝি তার একটিমাত্র আন্তরিক চুম্বন, একমাত্র সম্বল, এই প্রথম, এই শেষ।

—"ওরে, পাষণ্ড! করছিস কী তুই?"—কোন্‌ এক পরম বিজ্ঞ সাধুপুরুষ বলে ওঠে যেন লিখোনিনের অন্তরের মধ্যে—কিন্তু সে হচ্ছে তার বিবেকের অলীক ছায়ামূর্তি।

—"এখন তবে? ঠাণ্ডা হতে পেরেছ তো একটু?"—মমতাভরে শেষবারের মতো লিখোনিনের ঠোঁটে চুমো দিয়ে জিজ্ঞেস করে লিউব্‌কা: "ছোট্ট পড়ুয়াটি আমার গো!"

—বারো—

তারপর? নিদারুণ মর্মপীড়া আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নিজের আর লিউব্‌কার—বোধ করি সারা জগৎটারই—'পরে অপরিসীম বিদ্বেষ নিয়ে পাটাতনটার 'পরে এসে ধপ্‌ করে আছড়ে পড়ে লিখোনিন, আর মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়ে দাঁত কড়মড় করতে থাকে। নাঃ, ঘুমের মাথা খেয়েছে সে আজ—লিউব্‌কাকে সঙ্গে করে এনে কী ভুলই না করেছে! 'কিন্তু এখন সবই সমান,'—মনে মনে ভাবতে লাগল সে: 'একবার যখন কথা খসিয়েছি মুখ থেকে তখন এর শেষ অবধি না দেখে ছাড়ছি নে। হ্যাঁ, তাই বলে এই যা ঘটে গেল এখন, এ আর ঘটছে না ফের। হায়রে! ক্ষণিকের মতিভ্রমে এ সংসারে কারই বা না পা পিছলেছে একবারও?...কিন্তু কাল সকালে কী করে মুখ দেখাব ওর কাছে?'

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল তার। একটার পর একটা করে খালি সিগ্রেটই পুড়িয়ে চলল সে, আর মাঝে মাঝে উঠে এসে ঢক ঢক করে জল খেতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক সময় যেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলেই জোর করে সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলে সে; সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল একেবারে।

ফের যখন ঘুম ভাঙল তার, দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন—বেলা দুটো কি তিনটে হবে বুঝি। খানিকক্ষণের জন্যে ভোঁ হয়ে রইল বেচারা, হতবুদ্ধির মতো ঠোঁট চাটতে আর ঘরখানার চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল সে। রাতের বেলায় এত যে কাণ্ড ঘটেছে তার একবর্ণও মনে এল না তার। হঠাৎ লিউব্‌কার দিকে চোখ পড়তেই চেয়ে দেখে, মাথা নীচু করে বিছানার 'পরে উঠে বসে আছে সে, হাতদু'খানা হাঁটুর 'পরে পড়েছে এলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা মনে পড়ে গেল তার, বিরক্ত আর হতবুদ্ধি হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গোঙানি সুরু করে দিলে সে। নিজের দিকে তলিয়ে দেখেই বুঝতে পারলে বুঝি

রাতের ভুলচুকের দিকে ভোরের আলোয় চোখ মেলে চেয়ে দেখা কী কঠিন কাজ।

—"ঘুম ভেঙেছে তোমার, লক্ষ্মীটি?"—মমতাভরে জিজ্ঞেস করলে লিউব্‌কা। তারপর উঠে এসে তার পায়ের কাছটিতে বসে আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

—"আমি কিন্তু অনেকক্ষণ হলো জেগে বসে ছিলাম। তোমায় ডাকতে সাহস হ'চ্ছিল না। এমন ঘুমুচ্ছিলে তুমি।"—বলে এগিসে এসে তার গালে চুমো খেলে লিউব্‌কা। মুখে বিরক্তি টেনে এনে আস্তে করে সরিয়ে দিলে তাকে লিখোনিন।

—"থাক থাক, লিউবোচ্‌কা। ওসব করতে নেই।"—বলে উঠল সে: "বুঝতে পারলে—কোনই দরকার নেই, কক্ষণও না। কাল রাতে যা হয়ে গেছে সে হলো একটা দৈবদুর্বিপাক। ধরো, না হয় আমারই দুর্বলতা। না, তার চেয়েও দোষের কথা—বোধহয় ক্ষণিকের একটা নীচতা। কিন্তু, মাইরি বল'ছি, বিশ্বাস করো আমায় আমি কখ্‌খনও এ কথা ভাবিনি যে তোমায় আমার রক্ষিতা করে রাখব। তোমায় দেখতে চাই বান্ধবী, ভগ্নী, সাথী্র মতন।...যাক, ও কিছু নয়, তবে; সবই ঠিক হয়ে যাবে, আসবে অভ্যাস হয়ে। শুদ্ধু মনের মধ্যে পাপ না ঢুকলেই হলো। যাক, বাছা, জানলার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে একটুখানি চোখ ফেরাও দিকিনি, চট করে ঠিকঠাক হয়ে নিই আমি।"

ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে, মুখখানা গোমড়ামতন করে, জানলার সামনে উঠে এসে লিখোনিনের দিকে পেছন ফিরিয়ে দাঁড়াল লিউব্‌কা। বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, সখিত্ব, এই সব লম্বাচওড়া বুলির একবর্ণও ঢুকল না তার সাদাসিধে বুদ্ধি আর পাড়াগেঁয়ে সরল প্রাণে। বরং একজন ছাত্র—যা তা নয়, একেবারে একজন শিক্ষিত লোক, কে জানে কালে হয়তো হবে একজন ডাক্তার কি উকীল কি জজসায়েব, সে এসে নিয়েছে তার ভার—এই কথাটাই তার প্রাণ মাতিয়ে তুলেছিল।...আর, এই এখুনি কি না, দিব্যি সুখটি আদায় করে নিয়ে, কেটে পড়তে চাইছে! এরা সবাই সমান, এই ব্যাটাছেলেগুলো!

লিখোনিন উঠে তাড়াতাড়ি চোখেমুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে

এসে জানলাগুলো খুলে দিলে। তারপর লিউব্‌কার কাছে এসে সদয় ভাবে তার কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লে, "কিচ্ছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি···যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। তবে ভবিষ্যতের জন্যে এ একটা শিক্ষা হয়ে রইল।···তোমার এখনও চা খাওয়া হয়নি, লিউবোচ্‌কা ?"

—"না, সারাক্ষণ তো তোমারই জন্যে বসে ছিলাম। তা' ছাড়া কার কাছে যে চাইতে হয় তাও জানিনে। আর তুমিও তো বেশ আছ গো! সেই যে বেরিয়ে গেলে তোমাব বন্ধুর সঙ্গে, ফিরেও এলে, দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেও খানিকক্ষণ—শুনতে পেলাম সবই। কিন্তু কৈ, চলে যাবার সময় বলেও গেলে না তো একটি বার! তা কি ঠিক হয়েছে তোমার ?"

বেশ মজা লাগল লিখোনিনের, কোনও রকম রাগ না করে ভাবলে সে—' এই তো, সাংসারিক কলহের সূত্রপাত!"

লিউব্‌কার সাদাসিধে নিরীহ অভিমানী মুখখানার দিকে চেয়ে আর নিজে যে সে পুরুষ মানুষ, সমস্ত দায়িত্ব যে তার একারই, একথা ভেবে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল লিখোনিন। দোর গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে নোংরা অন্ধকার ঘুরঘুট্টি বারান্দার দিকে চেয়ে হাঁকলে সে: "আল্‌ একজান্‌ দ্রা: একবাটি সামোভা-র! দু'খানা রুটি-ই, মাখ-ন, আর সসেজ! আর ছোট্ট এক বোতল বো-দ্‌কা!"

বারান্দায় চটির চটাপট আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে দূরে থাকতে থাকতেই এক বুড়ীর গলার আওয়াজ আসতে লাগল: "এত হাঁকডাক কিসের? হাঁকডাক কেন, অ্যাঁ? হো, হো, হো, লড়ুইয়ে ঘোড়া চেঁচিয়ে আস্তাবল মাথায় করে তুলেছে যেন! দেখতে শুনতে আর ছোট্টটি নেই বাপু; ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছ এখন, তবুও রাস্তার হ্যাংলা ছোঁড়াগুলোর মতো হালচাল আর গেল না! হ্যাঁ, কী চাই এখন ?"

বলতে বলতে বুড়ী এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। এই হলো আলেকজান্দ্রা, ছাত্রাবাসের পুরোনো ঝি, ছাত্রদের বন্ধু আর মহাজন; বছর পঁয়ষট্টির বুড়ী, কুঁদুলে আর খিটখিটে।

কী কী চাই ফের বলে, লিখোনিন এক-রুবলের একখানা নোট ছুঁড়ে

দিলে তার হাতে। বুড়ী তবুও যায় না, ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর রাগত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘরের মধ্যে কে-একটা মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে।

—"কী হলো তোমার আবার, আলেকজান্দ্রা, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে?"—হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে লিখোনিন: "না কি, চেয়ে চেয়ে দেখে আশ মিটছে না বুঝি আর? বেশ শোনোই তবে: ও হলো আমার খুড়তুতো বোন, আপন খুড়তুতো বোন—লিউবোব..."[১] এক মুহূর্তের জন্যে সামান্য একটু থতমত খেয়ে গেল লিখোনিন, তক্ষুণি ফের সুরু করলে: "লিউবোব বাসিলিয়েব্না। কিন্তু আমার কাছে খালি শুধু লিউবোচ্কা। যখন এই এত্তটুকু ছিল,"—লিখোনিন টেবিল থেকে দেড় বিঘৎ প্রমাণ জায়গা দেখিয়ে দিলে,—"তখন থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ওকে। আর যা দুষ্টু ছিল, কানমলা চড়চাপড় কত যে খেয়েছে তখন! তবে হ্যাঁ, পোকামাকড়ও ধরে দিয়েছি কত!...তা, যাকগে,...তুমি এখন যাও দিকিনি, জড়ভরত আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী কোথাকার। এই যাবে আর আসবে—বুঝলে?"

বুড়ী তবুও নড়তে চায় না। দরজার দিকে ফিরেছে কি না ফিরেছে, আড়চোখে লিউব্কার দিকে বিষদৃষ্টিতে চেয়ে বিড় বিড় সুরু করে দিয়েছে: "হেঁ, আপন খুড়তুতো বোন! এ রকম ঢের ঢের আপন খুড়তুতো বোন জানা আছে সবার। কাশ্তোনোবায়া স্ট্রীটে পালে পালে ঘুরে বেড়ায় মাগীরা। আর, এই মদ্দা-কুকুরের পালের এততেও যদি আশ মেটে!"

—"নে, নে, বুড়ী কুত্তী! কাজে যা এখন, ঘেউ ঘেউ করিস নে!"—চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন: "নইলে তোর সেই পেয়ারের পড়ুয়া ত্রিয়াজোব-এর মতো তোকে ধরে পুরো একটি দিন আর এক রাত পোষাক-কুঠরীতে তালা দিয়ে আটকে রাখব'খন।"

আলেকজান্দ্রা চলে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি তার থপথপে চটির শব্দ আর বিড়বিড় বকুনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পাওয়া

---

১ প্রেম

যেতে লাগল। ছাত্রদের সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পরিচর্যা করে আসছে। তাদের অনেক কিছুই গায় মাখে না সে—মাতলামি, তাস পেটানো, কেলেঙ্কারি, হৈ হল্লা করে নাচনা গাওনা, এমন কি ধারদেনা পর্যন্ত। কিন্তু, আহা! নিজে বেচারী হলো গিয়ে চিরকুমারী, তাই একটি জিনিস তার উপবাসী অন্তরাত্মা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না—সে হচ্ছে ওই ব্যাভিচার।

—তেরো—

—"চমৎকার!...সুন্দর!...অপরূপ!"—খোঁড়া টেবিলখানার চারপাশে ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লিখোনিন: "আহা! কতকাল যে শুদ্ধাচারে ভদ্দরলোকের মতো ঘরসংসারে বসে চা খাইনি! ..বসো, লিউব্‌কা, লক্ষ্মীটি আমার. আজ থেকে ঘবগের স্বামীর ভার নিলে তুমি।...নিজ হাতে চা ঢালো দিকিনি!"

বড্ড যেন বাড়াবাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে লিখোনিন; ঠিক ভরসা পাচ্ছে না বেচারা লিউব্‌কা। তবুও আস্তে আস্তে মনের মেঘ কেটে এল তার, মুখখানা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। কিন্তু চা তো ভালো তৈরি করতে জানে না সে। ওদের সেই কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে চা ছিল মস্ত সৌখিন বড়মানুষী খাবার—তা-ও আবার বিশেষ কোনও গণ্যমান্য অতিথি এসে পায়ের ধূলো দিলে, কি পালপার্বণের দিনে, বাড়ীর কর্তা নিজে এসে সকলকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে চা খেতে বসতেন। তারপর মফঃস্বল শহরে এসে লিউব্‌কা শুধু পেটভাতায় যখন প্রথম এক পুরুত-ঠাকুরের বাড়ীতে, পরে এক বীমার দালালের ওখানে (ইনিই ওকে প্রথম বেশ্যাবৃত্তির পথে নাবান) ঝীগিরির কাজ নেয়, তখন গিন্নীঠাকরুণরা তার জন্যে শেষ-ছাঁকুনির একটুখানি জুড়িয়ে যাওয়া চা ফেলে রেখে দিতেন শুধু। তাই, কচি কচি ছেলেমেয়েরা যেমন জ্ঞানবাঁয়ের তফাৎ বুঝতে গলদঘর্ম হয়ে ওঠে, চা-তৈরির মতো সিধে কাজটা নিয়েও লিউব্‌কার এখন হলো সেই জ্বালা। তার ওপর

আবার লিখোনিনের হৈ চৈ-এর ঠেলায় বেচারা আরও গুলিয়ে যেতে লাগল পদে পদে।

—"বুঝলে, লক্ষীটি, চা-তৈরি হলো গিয়ে একটা মস্ত বড়ো বিদ্যে! মস্কৌ থেকে শিখে পড়ে না এলে চলে না।…চীনেরা কি চা-তৈরির বোঝে কিছু? আরে, ওরা হলো গিয়ে কাফের, শুদ্ধাচারে চা-তৈরির বুঝবে কী?…প্রথমে শুকনো টী-পটটা সামান্য একটু গরম করে নিতে হয়, তারপর……"—বকবক করেই চলেছে লিখোনিন।

লিউব্‌কার মিষ্টি মুখখানা একটু ম্লান হয়ে আসে, কাতর হয়ে বলে সে: "দোহাই তোমার! রাগ কোরো না।…চা-তৈরি আমি দু'দিনেই শিখে নেব। দেখো, আমি বেশ চটপটে আছি কিন্তু।… আচ্ছা, তোমার নাম তো বাসিল বাসিলিচ—নয়? আমায় কেন এত পর পর ভাবছ বলো তো, বাসিল বাসিলিচ, আমার? এখন তো আর অচেনা নই আমরা, অ্যাঁ?"

মমতাভরে চায় লিউব্‌কা তার মুখের পানে। বাস্তবিক, আজই ভোরে, তার এই স্বল্পপরিসর অথচ বিসদৃশ জীবনে এই প্রথম, একজন পুরুষের কাছে দেহদান করেছে সে স্বেচ্ছায়—নিজের দিক থেকে তাতে করে কণামাত্র সুখও সে পায়নি বটে, তবুও কেবল কৃতজ্ঞতা আর অনুকম্পার বশেই স্বেচ্ছায় করেছে সে আত্মদান—অর্থের প্রত্যাশায় নয়, বাধ্যতার বশে নয়, বহিষ্কার বা গোলযোগের ভয়েও নয়—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাবৃত আজকের তার এই আত্মদান। তার চির-অম্লান নারী-হৃদয় যা সততই প্রেমের আহ্বানে উৎফুল্ল হয়ে সাড়া দিয়ে ওঠে, সূর্যমুখী যেমন প্রতি-নিয়ত সূর্যের পানে মুখ না ফিরিয়ে বাঁচে না, এখন তা কানায় কানায় ভরে উঠেছে বিশুদ্ধ মমতায়।

কিন্তু লিখোনিনের হঠাৎ যেন গলায় কাঁটা বেঁধে,—এই যে একটি মেয়ে সদ্য কালও যে ছিল তার সম্পূর্ণ অচেনা অজানা, দৈবাৎ সে আজ হয়ে পড়েছে তার রক্ষিতা, সে কথা মনে হতেই কেমন একটা বিদ্বেষ অনুভব করতে থাকে সে মেয়েটির প্রতি। "ঘর-সংসার পাতার সুখ সুরু হলো এবার"—কথাটা আপনা থেকেই মনে আসে তার। তবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে, লিউব্‌কার কাছটিতে গিয়ে, তার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে

তাকে বুকের কাছটিতে; তারপর তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—না বুঝে ছলনা করেই বলে বুঝি: "বাছা আমার, ছোট্ট আদরের বোনটি আমার, কাল রাত্তিরে যা ঘটে গেছে সে আর ঘটবে না কিছুতেই। তার জন্যে সব দোষই আমার; চাও তো বলো, আমি নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করতে রাজি আছি সে জন্যে। হঠাৎ যে কী হলো, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করে কী যেন একটা হয়ে গেল—একেবারে হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে—বিশ্বাস করো আমায়, বিশ্বাস করো গো লক্ষ্মীটি আমার! আমি নিজে একবারও ভাবতে পারিনি যে এমন একটা কাণ্ড ঘটবে! বিশ্বাস করো, বহুকাল আমার অন্তরঙ্গভাবে কোনো নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি।...একটা বীভৎস মূর্তির অসংযত পশু জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে...আর...কিন্তু, হা ভগবান! আমার অপরাধ কি তাই বলে এমনই গুরুতর? মনের জোরে সাধুসজ্জন মহাপুরুষদের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না আমার, তবু তাঁরাও দুর্বার রক্তমাংসের প্রলোভন জয় করতে না পেরে পতিত হয়েছেন। তবুও তুমি যা চাও তাই সাক্ষী রেখে শপথ করে বলছি আমি, ও-রকমটি আর কখনও ঘটবে না।...হলো এবার?"

কেবলই তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে লিউব্‌কা। ঠোঁটদু'টো তার সামান্য একটু বাইরের দিকে ঝুলে পড়ে, অবনত চক্ষুপল্লব কাঁপে থরো থরো। কচি মেয়েটি যেন—কিছুতেই মানবে না কোনও কথা এম্নিভাবে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে সে: "হ্যাঁ, ...বেশ, বুঝতে পাচ্ছি, আমায় নিয়ে সুখী হতে পারছ না তুমি কিছুতেই। বেশ তো, সোজাসুজি তাই বলে দাও না কেন তবে, শুধু আমার গাড়ীভাড়াটা দিয়ে দাও, আর সামান্য কয়েকটা পয়সা বেশি, এই, যা তোমার খুশী। রাতের মজুরী তো দিয়েই আসা হয়েছে। আমি ফিরে যাই...যেখান থেকে এসেছি সেখানে।"

মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে লিখোনিন, ঘরের মধ্যে লাফাতে লাফাতে বলতে সুরু করে সে: "আহা, তা নয়, তা নয়! একটু বুঝে দেখতে' চেষ্টা করো, লিউবা! ভোরবেলা যা ঘটে গেছে, তাই নিয়েই চলতে গেলে—ও হলো পাশবিকতা, আত্মসম্মান জ্ঞান যার আছে তার

পক্ষে অনুচিত কাজ। ভালোবাসা! ভালোবাসা হচ্ছে গিয়ে মন, প্রাণ, চিন্তাধারা, রুচি—এ সব জিনিসের পরিপূর্ণ মিলন, শুধু দেহের মিলন নয়। ভালোবাসা হচ্ছে এক বিপুল মহান অন্তরাবেগ, নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির মতোই শক্তিশালী, বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাওয়া নয়। তোমার আমার মধ্যে তেমন কোনও ভালোবাসা নেই, লিউবোচকা। যদি কখনও তা আসে, তবে তোমার আমার দু'জনেব পক্ষেই সে হবে অপরিসীম আনন্দের বস্তু। কিন্তু এখন আমি হচ্ছি তোমার বন্ধু, তোমার বিশ্বস্ত সাথী, এই জীবনেব পথে। সেই যথেষ্ট, তাতেই সব চলবে···; আর, মানসিক দৌবল্য থেকে যদিও মুক্ত নই আমি, তবুও নিজেকে আমি সৎলোক বলেই জানি!"

মুশড়ে পড়ে লিউব্‌কা। "ও বুঝি ভাবছে আমি চাই ও বিয়ে করুক আমায়? কিন্তু তা তো চাইনি আমি একটিবারও।"—বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবে সে: "এ ভাবেই তো বেশ থাকতে পারা যায়। কতজন তো আছে এ ভাবে শুধু খাওযা-পরা নিয়ে। আর শুনতে পাই বে-থা করাব চেয়ে ঢের সুখেই আছে তাবা। দোষ কী এতে এমন? শান্তিতে নিরিবিলি ভদ্রভাবে দিন কাটবে···ওর মোজা সেলাই করে দেব, ঘর ধোয়াপোঁছা করব, রান্না করে খাওয়াব···অবিশ্যি সাদামেটে খাবারগুলো শুধু। একদিন অবিশ্যি ও যাবে বিয়ে করতে কোন এক বড়লোকের মেয়েকে। তা' বেশ, তাই বলে তো আর আমায় ন্যাংটো করে রাস্তায় বার কবে দেবে না। একটু বোকা ধরণের বটে ছেলেটি, বকবকও করে বড্ড বেশি, কিন্তু লোকটি বেশ ভালো—তা এক আঁচড়েই বুঝতে পারা যায়। যেমন তেমন করেই হোক তখন একটা ব্যবস্থা আমার জন্যে ও করেই দেবে। আর, কে জানে, হয়তো আমাকে মনেও ধরতে পাবে ওর একদিন, সয়েও যেতে পারে আমাকে? তা' আমি বাপু, সাদাসিধে মেয়েমানুষ, দুরন্তপনা করতে পারিনে, কখ্‌খনও কারও কথায় ভুলে ওর সঙ্গে ছল-চাতুরী খেলব না। লোকে বলে, ওই করেই না কি বাধে যত গণ্ডগোল।···শুদ্ধু ওকে এ-সব কিচ্ছুটি টের পেতে দেব না। কিন্তু ও ঠিক আবার আমার সঙ্গে শুতে আসবে, হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই আসবে—ভগবান যেমন সত্যি এও ঠিক তেমনি সত্যি।"

লিখোনিনও চিন্তিত হয়ে ওঠে, চুপচাপ বসে বিষণ্ণ মনে ভাবতে থাকে সে—কী ভীষণ গুরু দায়িত্ব নিয়েছে মাথায়, শক্তিতে কুলোলে হয় এখন। হঠাৎ কে যেন এসে বাইরে থেকে দোরে টোকা দেয়; দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশী হয়ে ওঠে সে, চেঁচিয়ে বলে: "ভেতরে এসো।" দু'জন ছাত্র এসে ঘরে ঢোকে—সোলোবিয়েব আর নীয়েরাৎ।

—"এই গৃহের অভ্যন্তরভাগে"—ঢুকতে ঢুকতেই আর্চডীকনের ভঙ্গীতে তামাসা সুরু করে দেয় সোলোবিয়েব: "যেখানে এঁরা সবাই সদ্ভাবে, শান্তিতে, নিষ্পাপে বসবাস করে আসছেন···" কিন্তু সুর মেলে না। তবুও মাঠে-মারা-যাওয়া তামাসাটাকে টেনেবুনে বজায় রাখবার জন্যে বলতে থাকে সে: "গুরুদেবগণ···কিন্তু এ কী! এ যে দেখছি···দেখছি···আঃ, কী পাপ···এ যে হলো সোনিয়া। নাঃ, আমারই ভুল—নাদিয়া···অ্যাঁ, ঠিক হয়েছে!···লিউবা, আনা মারকো-ব্নার বাড়ীর লিউবা···ঠিক···!"

লজ্জায় কান অবধি গরম হয়ে ওঠে লিউবার, চোখে এসে যায় জল, দু' হাতে মুখ ঢাকে বেচারা। লিখোনিন ওর মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কড়া ভাবে থামিয়ে দেয় সোলেবিয়েবকে: "ঠিকই বলেছ, সোলোবিয়েব। ঠিকুজির ভুল হয়নি তোমার। ইয়ামকার লিউবকাই বটে। আগে ছিল বেশ্যা। তাই বা কেন? কাল পর্যন্তও ছিল তাই, কিন্তু আজ থেকে—আমার বন্ধু, আমার বোন। আমি চাই আমার 'পরে যাদের সামান্য একটু আস্থাও আছে তারা সবাই যেন এই চোখেই দেখে ওকে। নইলে···"

—"ব্যস, ব্যস, ভাই! ঢের হয়েছে"—মোটকা সোলোবিয়েব চট করে এসে লিখোনিনকে জড়িয়ে ধরে বুকের ভেতর: "ঝোঁকের মাথায় একটা বোকামি করে ফেলেছি। আর হবে না। এসো, আমার দুখিনী বোন!"—বলে লিউব্কার দিকে হাত বাড়িয়ে তার ছোট্ট কচি হাতখানা সজোরে চেপে ধরে সে: "আমাদের এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছ, সে ভালোই হয়েছে। আমাদের ছন্নছাড়া জীবনে শ্রী ফিরে আসবে আবার, আদবকায়দা সভ্যভব্য হয়ে উঠবে।···

আলেকজান্দ্রা, বী-য়ার!"—চেঁচামেচি বাধিয়ে দেয় সে: "আমরা অসভ্য বর্বর হয়ে উঠেছি, খিস্তিখেউড, মাতলামো, কুঁড়েমি, কত রকমের দোষে ডুবে আছি। আর তার একমাত্র কারণ হলো নারী সাহচর্যের অভাব। আবার তোমার হাতে হাত মেলাচ্ছি—তোমার ছোট্ট সুন্দর হাতখানিতে।...বী-য়ার!"

—"আসছি, আসছি,"—দরজার বাইরে থেকে আলেকজান্দ্রার অসন্তুষ্ট গলা শোনা যায়: "চেঁচিয়ে মরছ কেন? ক'বোতল চাই, অ্যাঁ?"

সোলোবিয়েব সে কথা বুঝিয়ে বলবার জন্যে বারান্দায় উঠে যায়। খুশী হয়ে তার দিকে চেয়ে হাসে লিখোনিন, সে-ও যাবার পথে বন্ধু-ভাবে লিখোনিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে যায়। আর দু'জনও বুঝতে পারে সোলোবিয়েবের চক্ষুলজ্জার মর্ম।

—"কাজের কথায় এসো এখন সব,"—ফিরে এসে সাবধানে একখানা মান্ধাতার আমলের চেয়ারের 'পরে বসে বলতে সুরু করে সোলোবিয়েব: "আমায় দিয়ে তোমাদের কোনও উপকার হতে পারে কি? শুধু আধঘণ্টা সময় দাও আমায়, কফিখানায় গিয়ে একেবারে ওখানকার সেরা দাবাড়েকে এক মিনিটে সাবড়ে দিয়ে নিয়ে এসে দিই তা হ'লে। এক কথায়, আমি এখন তোমাদের হুকুমের গোলাম।"

সোলোবিয়েবের হরেক রকম গুণের মধ্যে এও ছিল একটা—দাবা-খেলায় তার জুড়ি ছিল না, অতি-বড়ো পেশাদার দাবাড়েরও তার সামনে হৃৎকম্প উপস্থিত হতো—এ যেন ছিল তার আজন্মের সহজাত সংস্কারের মতন। অথচ খেলায় তার স্পৃহা ছিল না মোটেই, খেলত সে শুধু বন্ধুবান্ধবদের তাগিদে, কি অপর কারও গরজে।

—"ভারী মজার লোক তো আপনি!"—একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে হাসতে হাসতে বলে ওঠে লিউব্‌কা। সোলোবিয়েবের খোশমেজাজি চাল আর কথাবার্তা বলবার অদ্ভুত ধরণটাও ঠিক মনের মধ্যে মেনে নিতে না পারলেও, ছেলেটির মধ্যে কী যেন একটা ওর সরল প্রাণকে তার দিকে টানতে থাকে।

—"থাক, থাক! এখন তার কোনও দরকার নেই,"—উত্তর দেয়

লিখোনিন: "এখনও বেড়ে শাঁসালো আছি আমি। বরঞ্চ চলো, এখন কোনও একটা আড্ডাখানায় গিয়ে বসি গে যাই। তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু সলাপরামর্শ আছে। যাই হোক না কেন, তোমরাই হলে, এখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর দেখতে যতটা সাদাসিধে বোকা বলে মনে হয় তা নও মোটেই। তারপর আমাকে বেরুতে হবে ওর একটা ব্যবস্থা করতে···মানে, লিউবার পাশপোর্টখানার তদ্বিরে। আমার জন্যে ততক্ষণ তোমরা বসে অপেক্ষা কোরো। দেরি হবে না তেমন।···এক কথায়, বুঝতেই তো পারছ এখন, কাজটা কী ধাঁচের, হাঁসিতামাসা করে সময় নষ্ট করবার ফুরসৎ নেই এখন। আমি চাই,"— আবেগে গলা কেঁপে ওঠে লিখোনিনের, নিজেরই সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে না তো সে?—"আমি চাই তোমরাও আমার এ দায়িত্বের ভাগ নাও কিছু। নেবে তো?"

—"আলবাৎ!"—তাল ঠুকে বলে ওঠে প্রিন্স (কিন্তু শোনায় যেন 'বুর্বাক!'), আর কী জানি কী ভেবে লিউব্‌কার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে চেয়ে গোঁফে চাড়া দিতে থাকে সে। চোখের কোণে চেয়ে দেখে লিখোনিন প্রিন্সের দিকে। সোলোবিয়েব কিন্তু সরল প্রাণেই বলে "তাই ঠিক। একটা খুব বড়ো রকমের কাজে হাত দিয়েছ তুমি, লিখোনিন। প্রিন্স রাত্তিরেই বলেছে আমায় সব কথা। বেশ তো, ক্ষতিটা কী এতে? তারুণ্য রয়েছে কিসের জন্যে তবে—সৎকাজে ছেলেমানুষীই না করলে যদি?···বোতলটা আমার হাতে দাও, আলেকজান্দ্রা, আমিই খুলছি, তুমি খুলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসবে শেষটায়।···নবজীবনের পথে, লিউবোচকা, খুড়ি···লিউবোব···লিউবোব···"

—"নিকোলোব্‌না। যাক, যা মুখে আসে তাই বলেই ডাকবেন আমায়—লিউবা, লিউবাই সই।"

—"তাই বেশ, লিউবা। এসো তবে, প্রিন্স আলীবর্দী!"

—"জয় হোক!"—বলে দু'জন গেলাস ঠোকাঠুকি করে বীয়ারে চুমুক দিতে সুরু করে। তারপর গেলাসখানা হাত থেকে নাবিয়ে রেখে জিব দিয়ে গোঁফের ডগা চেটে নিয়ে বলতে থাকে সোলোবিয়েব: "আর এ-ও বলছি, ভাই লিখোনিন, তোমার জন্যে গর্ব হচ্ছে আমার; নমস্কার

তোমায়! তুমি, শুধু তুমি ছাড়া, আমাদের মধ্যে আর কেউই এমন নিরহঙ্কারে অনর্থক বাগাড়ম্বর না করে, সত্যিকারের রুশীয় বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে পারত না।"

—"থাক, থাক!···এর মধ্যে বীর্যবত্তাটা আবার দেখতে পেলে কোথায়?"—বিরস বদনে বলে লিখোনিন।

—"বটেই তো!"—সায় দেয় নীয়েরাৎ: "তুই খালি বলিস আমিই না কি রাতদিন আবোল তাবোল বকে থাকি, দেখ দিকিনি নিজেই এখন কেমন বাজে বকতে সুরু করেছিস!"

—"ও কিছু নয়!"—জবাব দেয় সোলোবিয়েব: "এর চেয়ে ঢের ঢের লম্বাচওড়া হলেও তাতে কিছু এসে যেত না আজ! যাক, আমাদের এই চিলেকুঠী-সঙ্ঘের একজন প্রবীণ সদস্য হিসেবে আমি এই সর্বসমক্ষে ঘোষণা করছি যে, আজ থেকে লিউবা অত্র সঙ্ঘের একজন মাননীয়া সদস্যার পদে বৃতা হলেন।" তারপর সোজা উঠে এসে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, কথার মধ্যে খুব খানিকটা দরদ ঢেলে দিয়ে বলে ওঠে সে:

"শূন্য এ ভবনে আজি দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন,
এসো এসো গৃহলক্ষ্মী, হও সমাসীন।"

লিখোনিনের মনে পড়ে যায়, আজ ভোরে সে নিজেও ঠিক এই কথাগুলোই আবৃত্তি করে নাটকীয় ভঙ্গিতে লিউবকাকে এনে ঘরে তুলেছিল। লজ্জায় চোখ বোঁজে বেচারা।

—"থাক, থাক, ঢের হয়েছে; আর ভাঁড়ামি করতে হবে না। আসুন তবে, ভদ্রমহোদয়গণ! সাজগোজ সেরে বেরুবে চলো, লিউবা!"

—চোদ্দ—

সেখান থেকে দূরে নয় ছাত্রদের খানাঘর, 'চড়ুই পাখীর নীড়', শ'দুয়েক পায়ের মধ্যেই। হাঁটতে হাঁটতে লিউব্‌কা সবার অগোচরে খালি টানছে লিখোনিনের জামার হাতা ধরে, আর তাই করে করে ওরা দু'জন পড়েছে দল ছাড়াহয়ে কয়েক পা পিছিয়ে। সোলোবিয়েব আর নীয়েরাৎ চলেছে আগে আগে।

—"সত্যি সত্যিই ঠিক করেছ তবে, বাসিল বাসিলিচ্ লক্ষ্মীটি আমার?"—মমতাভরা কালো চোখদু'টি তুলে চায় লিউব্‌কা তার মুখের পানে: "আমায় নিয়ে তামাসা করছ না তা হলে?"

"তামাসার কী থাকতে পারে এতে, লিউবোচ্‌কা? আমি কি নরাধম যে তামাসা করতে যাব এমন একটা ব্যাপার নিয়ে? আবার বলছি আমি, আমি তোমার বন্ধু, ভাই, সাথী, সবার বাড়া। যাক, এ নিয়ে আর বেশি কথা কয়ে লাভ কী? তবে আজ ভোরের দিকে যা ঘটে গেছে সে আর কখনও ঘটবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার তুমি। আজই আমি তোমার জন্যে আলাদা একখানা ঘর ভাড়া করছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে লিউব্‌কা। অবশ্য লিখোনিনের সাধু সঙ্কল্পের কথায় ক্ষুণ্ণ হয় না সে,—সত্যি কথা বলতে কী, এ বিষয়ে বিশেষ কোনও আস্থাও নেই ওর। ওর অন্ধ সঙ্কীর্ণ অন্তরে একথা ও কখনও ধারণাই করতে পারে না যে, নরনারীর পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে এক সম্ভোগ ছাড়া আর কিছু আবার থাকতে পারে। এ ছাড়া জীবনে ও শুধু অনুভব করেছে গৃহীতা বা পরিত্যক্তা নারীর আদিম অসন্তোষ। আনা মারকোব্‌নার আলয়ে গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে এ মনোভাব; সম্প্রতি তা নির্জীব হয়ে পড়লেও, ক্রোধ আর আন্তরিকতার অভাব নেই তার মধ্যে; সময় সময় গর্বিত প্রতিযোগিতার রূপ ধরে তা আত্মপ্রকাশও করে থাকে সেখানে। এই যে সোলোবিয়েব—লিউবার

চেনা আর পাঁচজন ছাত্রের মতো বৈঠকখানা ঘরে বসে সবার সামনে, কি, শুধু মেয়েদের সুমুখেই, মেয়েছেলেদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, যদিও সে এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়,—তবুও তাকে ববঞ্চ বুঝতে পারে লিউব্‌কা—বিশ্বাসও করতে পারে অনায়াসে—স্বেচ্ছায়ই যেন। চোখেমুখে মাখানো রয়েছে ওর কেমন একটা হাসিখুসি ভাব, আন্তরিক সরলতা।

'চড়ুইয়ের নীড়ে' কিন্তু লিখোনিনের খুব খাতির, কারণ তার মতো ধীরস্থির, দেনা-পাওনা নিয়ে হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ না-করা ছেলে, ছাত্রদের মধ্যে বড়ো-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই তাকে নিয়ে খাতির করে একটা আলাদা কুঠুরীতে বসানো হলো। সেখানে গিয়ে বসবার পথে হঠাৎ শিমানোব্‌স্কী নামে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই তাকেও সঙ্গে নিতে হলো। "আমায় নিয়ে সঙ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে না কি ?"—মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবে লিউব্‌কা। সামান্য একটু ফাঁক পেয়ে লিখোনিনের কানে কানে বলে বেচারী : "এত লোক ঢোকাচ্ছ কেন গো, লক্ষীটি! লজ্জা করছে যে আমার। ভিড় সইতে পারিনে আমি।"

—"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, বোন"—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে লিখোনিন: "এরা সব চমৎকার লোক, বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধব। ওরা তোমায় সাহায্য করবে, আমাদের দু'জনকে সাহায্য করবে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসা করবে, গুলগাল ছাড়বে, রাগ কোরো না তাতে। মন কিন্তু ওদের সব খাঁটি সোনা।"

—"তবুও ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার ; লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ওরা সব্বাই জানে কোত্থেকে তুমি কুড়িয়ে এনেছ আমায়।"

—"ও কিছু নয়, ও কিছু নয়! কেন, জানলেই বা সব !"—সস্নেহে বলতে থাকে লিখোনিন : "পুরোনো কথা ভেবে ঘাবড়াচ্ছ কেন এত ? লুকিয়ে কী হবে ? এক বচ্ছরের মধ্যেই দেখো সব সঙ্কোচ কেটে যাবে তোমার, লোকের চোখের পানে চেয়ে বলতে পারবে তুমি : 'হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।' এসো, ভেতরে এসো, লিউবোচকা!"

পরিবেষণ সুরু হয় ; যার যা খুশী সে তাই ফরমাস করতে থাকে ;

তবুও এক শিমানোব্স্কী বাদে আর সবার মনের মধ্যেই কেমন একটা অস্বস্তির ভাব যেন। অবশ্য ওই শিমানোব্স্কীর উপস্থিতিটাই হচ্ছে এর একটা কারণ। ফিটফাট ছোকরাটি, গোঁফদাড়ি কামানো, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পাঁশ-নে চোখে, হামবড়া ভাব—যেন মস্ত কেউ-কেটা লোক একটি। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে কেউ নেই তার, কিন্তু ছাত্ররা সবাই বেশ সমীহ করে চলে তাকে, মূল্য দেয় তার মতামতের। কেন তা কেউই বোঝে না বটে, কিন্তু আসলে সে হচ্ছে গিয়ে ওর ওই সবজান্তা মুখভঙ্গি আর হামবড়া ভাবের জন্যেই।

খাওয়া-দাওয়া যখন মাঝপথে এসে পৌছেছে তখন এক এক করে মুখ ফুটতে লাগল সবার; শুধু এক লিউব্‌কাই রইল চুপচাপ বসে, কথাবার্তার জবাবে সংক্ষেপে 'হাঁ', 'না' দিয়েই কাজ সারতে লাগল, খাবার-দাবারও ছুঁল না প্রায় কিছুই। সবচেয়ে বেশি বকবক করতে লাগল লিখোনিন, সোলোবিয়েব, আর নীয়েরাৎ। লিখোনিন কথা কইছে বিচক্ষণ কাজে লোকের মতো, সাগ্রহ বাক্যবিন্যাসের মধ্যে কী যেন একটা বাস্তব, গোপন, অস্বস্তিকর, বেদনাদায়ক তথ্য চাপা দিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে; সোলোবিয়েব ছেলেমানুষের মতো খুশীতে মেতে উঠেছে, কথা কইতে কইতে উল্লাসের আতিশয্যে থেকে থেকে টেবিল চাপড়াচ্ছে সে; আর নীয়েরাৎ কথা কইছে কেমন একটা সংশয় নিয়ে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কী ভেবে ফিরে চাইছে শিমানোব্স্কীর মুখের দিকে। নিজে কিন্তু সে বিশেষ মতামত প্রকাশ করছে না, শুধু হামবড়া ভাব নিয়ে মাথা তুলে পাঁশ-নের ভেতর দিয়ে এর-ওর দিকে চোখ তুলে চাইছে বারবার।

শেষে টেবিলের 'পরে আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগল সে: "তা, লিখোনিন যা করেছে তা বেশ চমৎকার, সৎসাহসের কাজই বলতে হবে। আর এই যে প্রিন্স আর সোলোবিয়েব তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে এ-ও খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি বলি কী, আমাদের বান্ধবীকে তাঁর নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী চলতে দেওয়াই কি ঠিক নয়?" তারপর লিউব্‌কার দিকে ফিরে চেয়ে জিজ্ঞেস করে: "বলো দেখি, বাছা, কী কাজ জান তুমি, কী রকম কাজ

করতে পারবে? এই ধরো যেমন সেলাই, বোনা, এম্ব্রয়ডারী, কি এই রকমের আর কিছু?"

রাঙা হয়ে ওঠে লিউব্‌কা; চোখ নীচু করে টেবিলের তলায় আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে চাপা গলায় জবাব দেয়: "ও সব কিছু জানি নে।"

হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে লিখোনিন: "আমরা যে ভুল পথে চলেছি হে সব! ওরই সামনে ওর বিষয় আলোচনা করে ভারী অস্বস্তিতে ফেলেছি ওকে। দেখো দিকি নি—লজ্জায় কথা কইতে পারছে না বেচারা। ওঠো লিউব্‌কা, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি গে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে আসব। তারপর কথাবার্তা হবে'খন। কেমন?"

—"আমার জন্যে ভেব না কিচ্ছু,"—অস্পষ্ট স্বরে জবাব দেয় লিউব্‌কা: "যা বলবে তাই করব আমি, বাসিল বাসিলিচ। শুদ্ধু আমার এখন বাড়ী যেতে ইচ্ছে করছে না।"

—"কেন?"

—"সেখানে একা একা কেমন লাগবে। আমি না হয় পার্কে ঢোকবার রাস্তায় কোন-একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করি গে যাই ততক্ষণ।"

—"ওহো, বুঝতে পেরেছি!"—মনে পড়ে যায় লিখোনিনের: "আলেকজান্দ্রার জন্যে ভয় করছে বুঝি। দাঁড়াও, বুড়ী হতভাগীকে দেখাচ্ছি মজা! তা হোক, চলো যাই, লিউবোচ্‌কা!"

বেচারী উঠে ভয়ে ভয়ে সকলের দিকে হাত বাড়ায়; তারপর লিখোনিনের সঙ্গে যায় ঘর থেকে বেরিয়ে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসে লিখোনিন। ওর অনুপস্থিতিতে বন্ধুরা মিলে যে ওর কথা আলোচনা করেছে তা ভেবে ভারী অস্বস্তি বোধ হতে থাকে ওর। খানিকক্ষণ সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইবার পর, টেবিলে হাত রেখে বলে সে: "তোমরা সবাই আমার বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু,"—আড়চোখে চট করে একবার শিমানোবৃস্কীর দিকে চেয়ে নেয়: "তা ছাড়া সবাই দায়িত্বশীল

ভদ্রলোকও বটে। আমি তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করছি। স্বীকার করি যে, কাজটা করে বসেছি ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই করেছি।"

—"সেটাই তো আসল কথা,"—কথার পৃষ্ঠে বলে ওঠে সোলোবিয়েব।

—"চেনা অচেনা লোকেরা সব এর জন্যে কী বলবে না-বলবে সে কথা ভাবিনে। কিন্তু মেয়েটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য—মাপ কোরো, এত বড়ো কথাটা মুখ থেকে চট করে বেরিয়ে গেল বলে—মেয়েটিকে উৎসাহ দিতে, বেঁচে উঠতে সাহায্য করতে, কখনও পেছ-পা হব না আমি। অবশ্য আমি ওর জন্যে সস্তায় ছোটোখাটো একখানা ঘর ভাড়া করতে পারি, আপাততঃ খাওয়াপরার ব্যবস্থাও করতে পারি; কিন্তু তারপর? তারপর কী করা যেতে পারে সে ভাবনাই কঠিন হয়ে উঠেছে আমার কাছে। টাকাকড়ির কথা নয়, সে আমি যেমন করে হোক যোগাড় করতে পারব দরকার মতো,—কিন্তু বসে বসে শুধু খাওয়াদাওয়া করবে, কাজকর্ম কিছুই করবে না, এ ভাবে থাকতে বাধ্য হলে বেচারাকে কুঁড়েমিতে পেয়ে বসবে, উৎসাহ উদ্যম সব হারিয়ে বসে থাকবে। আর তার ফল কী হতে পারে সে তো জানাই আছে তোমাদের। তাই ওকে এখন কী কাজ দেওয়া যায় তাই ভেবে দেখতে হবে আমাদের। একটু চেষ্টা করে দেখো, ভাইসব; যা হোক একটা কিছু পরামর্শ দাও।"

—"ও কী কাজ করতে পারবে আগে সেটা জানা দরকার,"—উত্তর দেয় শিমানোব্স্কী: "ওখানে এসে ঢোকবার আগে একটা-না-একটা কিছু করত নিশ্চয়ই।"

হতাশার ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে বলে লিখোনিন: "কিছুই নয় সে। সামান্য একটু-আধটু সেলাই-ফোঁড়াই জানে শুধু—পাড়াগাঁয়ের মেয়েছেলে মাত্রই যেমন জানে। আর বল কেন, বেচারা তখনও পনোরো বছর পেরোয় নি এমন সময় এক সরকারী কেরানী ওকে আনে বার করে। ও শুধু জানে ঘর ঝাঁট দিতে, ধোঁয়ামাজা করতে, আর যদি চাও তো সামান্য এটা সেটা রেঁধে দিতে। আর কিছু নয়, বোধহয়।"

—"এ আর এমন কী!"···জিব দিয়ে একটা শব্দ করে শিমানোব্স্কী।

—"তার ওপর আবার নিরক্ষর।"

—"এ আর এমন বড়ো কথা কী!"—বলতে লাগল সোলোবিয়েব: "আরে, যদি একটি সুশিক্ষিতা মেয়েকে নিয়ে, কিংবা, তার চেয়ে আরও খারাপ, যদি একটি অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীকে নিয়ে কারবার করতে হতো আমাদের, তবে আমরা যা করতে চাইছি তাতে ফল হতো হিতে বিপরীত—একেবারে মাঠে মারা যেত সব প্রচেষ্টা। এখানে বরং আমরা পেয়েছি আফলা ক্ষেত, আ-ছোঁয়া আ-চষা জমি।"

—"হীঃ-হীঃ!"—দু'দিকেই তাল রেখে হাসতে সুরু করে দেয় নীয়েরাৎ।

সোলোবিয়েব কিন্তু তামাসা করে নি, তাই একেবারে ক্ষেপে গিয়ে প্রিন্সের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন: "শোনো, প্রিন্স, যে-কোনও বিশুদ্ধ ভাব, যে-কোনও শুভকর্মকে বিসদৃশ, অশ্লীল করে তোলা যেতে পারে। তাতে কোনও মুন্সিয়ানা নেই। আমরা যা করতে চাইছি তা নিয়ে যদি জানোয়ারের মতো অমন দাপাদাপি কর তো সিধে পথ দেখতে পার।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি নিজেও তো একটু আগে ঘরের মধ্যে···" অপ্রতিভ হয়ে জবাব দেয় প্রিন্স।

সঙ্গে সঙ্গেই রাগ পড়ে যায় সোলোবিয়েবের, বেশ মোলায়েম হয়ে বলে সে: "তা, হ্যাঁ, বোকার মতো নেচে উঠেছিলাম বটে, সে জন্যে দুঃখিত আমি। এখন সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করছি যে, লিখোনিন চমৎকার ছেলে, মহাপ্রাণ ব্যক্তি। আমার দিক থেকে সব কিছু করতেই রাজি আমি। ফের বলছি, লিখতে আর পড়তে জানাটা হলো গৌণ বিষয়। খেলাধূলোর ভেতর দিয়েই তা শিখে ফেলতে পারা যায়। আর এই রকমের নিপাট মন দিয়ে, ইস্কুলে না গিয়ে, স্বেচ্ছায় লিখতে পড়তে আর হিসেবপত্তর রাখতে শেখা হচ্ছে গিয়ে পানসুপুরি চিবিয়ে খাবার মতোই সিধে কাজ। তবে হ্যাঁ, একটা কিছু হাতের কাজ শেখা দরকার, যাতে করে পেট চালাবার ব্যবস্থা হতে পারে, তা সে কত

রকমের কাজই তো রয়েছে হে, তার যে-কোনও একটা আয়ত্ত করতে দু' হপ্তার বেশি লাগে না।"

—"যথা?"—জিজ্ঞেস করে প্রিন্স।

—"এই ধরো যেমন···ধরো যেমন···বেশ তো, ধরোই না ওই নকল ফুল তৈরির কাজ। হ্যাঁ, তার চেয়েও ভালো হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই ফুলের দোকানে হিসেবপত্তর রাখার কাজ। চমৎকার কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

—"রুচি থাকা চাই," —নিঃস্পৃহভাবে বলে শিমানোব্স্কী।

—"রুচিই বলো আর ক্ষমতাই বলো, জন্মগত নয় কিছুই। নইলে মনীষার উদ্ভব দেখতে পেতে শুধু সুশিক্ষিত ভব্য সমাজে; আর চিত্রকর জন্মাত শুধু চিত্রকরের ঘরেই, গায়ক জন্মাত গায়কের ঘরে। কিন্তু তা তো দেখতে পাইনে আমরা। যাক গে, তর্ক করতে চাইনে। বেশ তো, ফুলওয়ালী না হোক, আরও তো কত কী রয়েছে। ধরো, এই বেশিদিন আগে নয়, একটা দোকানে আমি দেখেছি একটি মেয়েকে ছোট্ট একটা পা-দিয়ে-চালানো কল নিয়ে বসে কাজ করতে।"

—"বাব্বা! আবার সেই কল!"—হেসে ফেলে প্রিন্স।

—"চুপ করো, নীয়েরাৎ!"—শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠে লিখোনিন: "লজ্জা নেই তোমার!"

"আহাম্মক কোথাকার!"—ধমক দিয়ে ওঠে সোলোবিয়েব; তারপর বলতে থাকে সে: "কলটা সামনে-পেছনে চলে, আর একটা চৌকো মতন পাটাতনের ওপর পাতলা ক্যাম্বিশের টুকরো বিছিয়ে, তার ওপর মেয়েটা কী-একটা-যেন কল চালিয়ে দিচ্ছে, ঠিক ধরতে পারলাম না, আর কী করে যেন রঙবেরঙের ছাপা সিল্ক তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে তা থেকে—কত রকমের ডিজাইন—পুকুরে ফুল ফুটেছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে, এই রকম কত কী, একেবারে জীবন্ত ছবি সব! তাই ইচ্ছে করেই গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কলটার দাম কত। শুনলাম দাম এই এম্নি সেলাইএর কলের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হবে, তবে কিস্তীবন্দীতেও কিনতে পারা যায়। আর যারাই সেলাইএর কল একটু-আধটু চালাতে জানে তারাই অনায়াসে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এটা

চালাতেও শিখে নিতে পারে। নানান রকমের নতুন নতুন ডিজাইনও পাওয়া যায়। আর পর্দা, আলোর ঢাকনা, অ্যালবাম, এই রকমের ছাইপাঁশের জন্যে বিক্রীও হয় খুব, পয়সাও আছে মন্দ নয়।"

—"তা এ-ও একটা ব্যবসা বটে,"—দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তিতভাবে বলে লিখোনিন: "তবে সত্যি কথা বলতে কী আমি ভেবেছিলাম ওকে একটা খুব ছোট্ট মতন খাবারের দোকান করে দেব—সস্তা অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ছাত্রদের অনেকেরই তো খাওয়া-দাওয়ার কোনও বাছবিচার নেই; তা ছাড়া তাদের খাবার জায়গারও দস্তুরমতো অভাব রয়েছে। তাই একটু চেষ্টাচরিত্র করলেই হয়তো আমাদের চেনাশোনা সব ছাত্রদেরই সেখানে ভিড়িয়ে আনতে পারব।"

—"তা ঠিক,"—সায় দেয় প্রিন্স: "তবে সে হবার নয়। জানই তো আমরা সবাই খেতে আরম্ভ করব ধারে, আর আমরা সব কী মেকদারের খদ্দের সে তো জানাই রয়েছে। এ কাজ চালাতে হলে চাই ধড়িবাজ কাজের লোক। আর সে যদি হয় মেয়েছেলে তবে তার থাকা চাই শাণিত ক্ষুরধার জিহ্বা, তবুও তার পেছনে থাকা দরকার একজন ব্যাটছেলের! সত্যি বলতে কী, লিখোনিন পারবে না কাউন্টারে দাঁড়িয়ে চোখ রাখতে, কখন কে এসে দিব্যি আরামে খেয়ে দেয়ে মস্কাটি মেরে নিয়ে সুড়ুৎ করে গা ঢাকা দিয়ে পালালে।"

কঠোর দৃষ্টিতে চায় লিখোনিন তার দিকে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে বসে থাকে।

পাঁশ-নেটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে ধীরে সুস্থে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে, বলতে সুরু করে সিমানোব্স্কী: "তোমাদের উদ্দেশ্য যে অতি মহৎ সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কি তোমরা? খাবারের দোকান খুলতে গেলে, কি অন্য কোনও ব্যবসা চালাতে হলে চাই টাকা, চাই অপরের সহায়তা—এক কথায় পৃষ্ঠপোষকতা। বেশ, টাকার না হয় ব্যবস্থা হলো—সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত, লিখোনিন। কিন্তু এভাবে গোড়া থেকেই সব রকম ব্যবস্থা করে, আঁটঘাট বেঁধে দিয়ে, ব্যবসায় নাবালে তার ফল কী হতে পারে—ওই গা-ঢিল দেওয়া, অবহেলা, আর শেষ অবধি ব্যবসার

'পরেই বিতৃষ্ণা এসে যাওয়া ছাড়া ? 'হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়'। নাঃ, যদি বেচারী মেয়েটাকে তোমরা সত্যিই সাহায্য করতে চাও তবে এক্ষুণি যাতে ও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে তার ব্যবস্থা করো।"

—"তবে এখন ও করবে কী তোমার মতে ?"—অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে সোলোবিয়েব : "বাসনপত্তর মাজাঘসার কাজ ?"

—"নয়ই বা কেন ?"—শান্তভাবে জবাব দেয় সিমানোব্স্কী : "বাসনপত্র মাজা, কাপড়চোপড় কাচা, রান্নাবাড়া করা, এই সব। শ্রমের দ্বারা মানুষ উন্নতই হয়ে ওঠে হে।"

মাথা নাড়ে লিখোনিন : "খুব খাঁটি কথা। জ্ঞান স্বতঃই স্ফূর্ত হয়েছে তোমার মুখ দিয়ে, সিমানোব্স্কী। বাসনপত্তর মাজাঘসা, রান্নাবাড়া করা, ঝী-এর কাজ, ঘর-সংসার দেখা···কিন্তু, প্রথম কথা হচ্ছে, এ-সব কাজ ওকে দিয়ে হবে কি না সন্দেহ ; দ্বিতীয় কথা, এর আগে ঝী-এর কাজ ও করে এয়েছে, আর তাতে করে মনিবদের লম্বাচওড়া বোলচাল, দোরের আড়ালে, কি খোলা বারান্দার ফাঁকে তাঁদের হাত-টিপুনি, এ-সব জিনিসের যে কী সুখ তা-ও চেখে দেখে আসতে হয়েছে বেচারাকে। কেন, তোমার কি এ-কথা জানা নেই যে এই সব ঝী-দের মধ্যে থেকেই বেশ্যাদের দলে ভিঁড়ে থাকে শতকরা নব্বই জন করে মেয়ে ? তাই একেবারে প্রথম ধাক্কাতেই বেচারী লিউবা আবার তা হলে ফিরে যাবে যেখান থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছি সেখানে—যদি তার চেয়েও অবশ্য খারাপ কিছু না ঘটে, কারণ ওটা তো ওর কাছে এক রকম গা-সওয়াই হয়ে গেছে, এমন কিছু ভয়ের কথা বলেও মনে হবে না তখন ; চাই কী, মনিবঠাকুরের ব্যবহারের পর ও-ই বরং পছন্দসই বলেও মনে হতে পারে ওর কাছে। আর এতখানি চেষ্টাচরিত্র করে একটা প্রাণীকে এক নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করে আনার পর তাকে আর একটা নরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া কি উচিত হবে আমাদের ?"

—"ঠিক !"—সায় দিয়ে ওঠে সোলোবিয়েব।

—"যা ভালো বোঝ করো তবে,"—অবহেলাভরে জবাব দেয় সিমানোব্স্কী।

—"তবে আমার কথা বলতে গেলে,"—আরম্ভ করে প্রিন্স: "বন্ধু হিসেবে আর কৌতূহলবশতঃও বটে, এ পরীক্ষার ফলাফল জানতে আর তাতে যোগদান করতে প্রস্তুত আছি আমি। তবে আজও ভোরে তোমায় আমি সাবধান করে দিয়েছি, লিখোনিন, আর এখনও বলছি যে এ-রকম পরীক্ষা এর আগেও ঢের ঢের হয়ে গেছে, আর তার সবক'টাই —অন্ততঃ ব্যক্তিগত ভাবে যে-ক'টার খবর রাখি আমরা সে-ক'টা—কেলেঙ্কারিতে পর্যবসিত হয়েছে: আর যে-ক'টার খবর আমরা এর-ওর মুখে শুনেছি শুধু, সেগুলোর যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। তবে তুমি যখন কাজটায় হাত দিয়েইছ তখন চালিয়ে যেতে থাকো—আমরাও রয়েছি তোমার পেছনে।"

টেবিলে একটা চড় মেরে বলে ওঠে লিখোনিন: "না! সিমানোব্‌স্কীর কথাও অনেকটা ঠিক—কাউকে 'হাঁটি-হাঁটি-পা-পা' করে হাত ধরে নিয়ে বেড়ানোয় বিপদ আছে। তাই বলে আর কোনও পথও খুঁজে পাচ্ছিনে। প্রথমে আমি ওর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব…যা হোক একটা সহজ দেখে কাজের ব্যবস্থাও করে দেব, দরকারী মালমসলা কিনে এনে দেব। তারপর দেখা যাক কী হয়। আর ইতিমধ্যে ওর সামান্য একটু শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। ওর অন্তঃকরণটি কিন্তু ভারী সুন্দর, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়। অবশ্য এ বিশ্বাসের মূলে কোনও যুক্তি নেই আমার, তবে আমি নিশ্চিত এ সম্বন্ধে, অনেকটা যেন প্রত্যক্ষই করেছি বলা চলতে পারে।…এই নীয়েরাৎ! ভাঁড়ামি নয়! চুপ!"—বিবর্ণ হয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন; "ঢের সয়েছি তোর পেজোমি। এতদিন জানতাম তোর সদ্বিবেচনা আছে, হৃদয় আছে। ফের যদি অসভ্যের মতো রসিকতা করিস তো তোতে-আমাতে চিরকালের মতো এখানেই শেষ!"

—"আরে, এই, কোনও কিছু ভেবে বলিনি ভাই…সত্যি, আমি… আরে একেবারে ফোঁস করে উঠলি যে? বেশ, আমি একটু ফুর্তি করি তা যদি না চাস তো এই আমি চুপ করলাম। দে ভাই, দেখি, তোর হাতখানা, লিখোনিন; আয়, এক চুমুক খাওয়া যাক তবে!"

"বেশ, বেশ, আর লাগিস নে আমায় পেছনে। এই যে, তোর

কল্যাণ হোক! শুধু ফের ছেলেমানুষি করিস নে, বুড়ো মেড়া কোথাকার! হ্যাঁ, যা বলছিলাম: সিমানোবৃস্কী যেমন যথার্থই বলেছে, যদি তেমনি কোনও ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে করে ওকে কারও গলগ্রহ হয়ে না থেকে, নিজেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তার জন্যে চেষ্টার ক্রটি করব না। যা যা শেখানো যেতে পারে তার সব কিছুই শেখাব ওকে; থিয়েটারে নিয়ে যাব, কথকতা, বক্তৃতা, যাদুঘর সর্বত্রই নিয়ে বেড়াব; পড়ে শোনাব, গানবাজনা শোনবার আর শুনে তা বুঝতে শিখতেও সাহায্য করব। অবশ্য একা আমি অত শত করে উঠতে পারব না; তোমাদেরও সাহায্য চাই; তারপর ভগবান যা করেন।”

—“তা' বেশ!”—সায় দেয় সিমানোবৃস্কী: “কাজটা নতুনই বটে, পুরোনো একঘেয়ে নয়; তা' অজানাকে জানব আমরা কী করে—কে জানে তুমি, লিখোনিন, হয়তো কালে একটি মুমুক্ষু প্রাণীর মুক্তিপথের গুরু হয়েই দাঁড়াবে। আমিও এতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।”

—“আমিও! আমিও!”—অপর দু'জনও সোৎসাহে বলে ওঠে। তারপর সেই টেবিলে বসেই ছাত্র চারজন মিলে লিউব্‌কার শিক্ষাদীক্ষার জন্যে এক অভূতপূর্ব বিরাট কর্মপন্থা স্থির করে ফেললে।

সোলোবিয়েব নিলে ব্যাকরণ আর লিপিচাতুর্য শিক্ষা দেবার ভার। যাতে একঘেয়ে পড়াশোনায় বেচারার বিরক্তি ধরে না যায়, আর তার সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপও বটে, সে তাকে সহজবোধ্য দেশী ও বিদেশী উপন্যাস পড়েও শোনাবে। লিখোনিন নিজের হাতে রাখলে অঙ্ক, ভূগোল, আর ইতিহাস শিক্ষার ভার।

প্রিন্স এবার আর তার অভ্যাসমতো রসিকতা না করে খোলাখুলি ভাবেই বল্লে: “আমি, ভাই, কিছুই জানিনে; যেটুকুও বা জানি সে-ও খুব ভালো করে নয়। তা হোক, আমি ওকে জর্জিয়ান কবি রুস্তাবেল্লীর অপরূপ কাব্য ‘ব্যাঘ্র-চর্মের’ প্রত্যেকটি লাইন পড়ে তর্জমা করে শোনাব। আমি তেমন ভালো গুরুমশাই নই। তাই বলে, বীণা, ম্যাণ্ডোলিন, আর ব্যাগপাইপ বাজাতে আমার চেয়ে কেউ ভালো শেখাতে পারবে না।”

নীয়েরাৎ সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই কথা বলছিল ; তাই লিখোনিন আর সোলোবিয়েব খুশী হয়ে হাসছিল বসে বসে। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে সিমানোবৃস্কী ওকে সমর্থন করতে লেগে গেল : "প্রিন্স যথার্থ কথাই বলছে। যাই হোক না কেন, যে-কোনও একটা বাজনায় হাত এসে গেলে তাতে করে সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায় ; আর জীবনে তা কাজেও লাগে। আর আমি আমার দিক থেকে…ঠিক করেছি তরুণীটিকে কার্ল মার্কস্-এর 'ক্যাপিটাল' আর মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস পড়ে শোনাব। তা ছাড়া, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আর অর্থনীতি, এ সবও শেখাব।"

সিমানোবৃস্কীর ভারিক্কীচাল ওদের গা-সওয়া হয়ে গিয়ে যদি না থাকত তবে বাকি তিনজন ওর মুখের 'পরেই হেসে কুটোপাটি হয়ে পড়ত। এখন ওরা শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। তাতে কিন্তু একটুও বিচলিত না হয়ে সে বলেই চল্ল : "আর হ্যাঁ, ওকে আমি রসায়ন আর পদার্থবিজ্ঞানের যে সব পরীক্ষাগুলো বাড়ীতেই করা চলে তা সব করে দেখিয়ে দেব ; এ-সব যেমন উপভোগ্য, তেম্নি শিক্ষাপ্রদ, আর মন থেকে কুসংস্কারের জাল সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে পৃথিবীর গঠন আর পদার্থের লক্ষণ এ-সবও কিছু কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। আর কার্ল মার্কস্-এর কথা যদি বল, তবে স্মরণ রেখো যে যুগান্তকারী গ্রন্থমালা পণ্ডিতের কাছেও যেমন, একটি অশিক্ষিত চাষার কাছেও তেম্নি সহজবোধ্য—যদি তা হৃদয়গ্রাহী ভাবে তার কাছে উপস্থাপিত করা যায়। মহৎ ভাব মাত্রই যার-পর-নাই সরল।"

লিখোনিন পার্কের যেখানটিতে লিউব্কাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেখানটিতেই বেঞ্চির 'পরে বসে ছিল সে। বেচারা বড়ই অনিচ্ছায় উঠে ওর সঙ্গে বাড়ী চল্ল। লিখোনিন যেমন আন্দাজ করেছিল, আলেকজান্ড্রাকে বেচারার ভারী ভয়—প্রাত্যহিক জীবনের সত্যের সঙ্গে কতকাল হলো যোগ হারিয়ে বসে আছে লিউব্কা ; কত রকমের অস্বাচ্ছন্দ্যে ভরা কঠিন তার জীবন! তা' ছাড়া লিখোনিন যে ওর অতীতের কথা কিছুই লুকিয়ে রাখতে চায় না, এই চিন্তাটাও দুর্বহ হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। কিন্তু বেচারা এতকাল আনা মারকোবনার

ওখানে থেকে নিজের সত্ত্ব একেবারেই হারিয়ে বসেছে, যে-কোনও অজানা অচেনা লোকের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই অভ্যাস হয়ে গেছে এখন ওর; তাই একটি কথাও না বলে লিখোনিনের অনুসরণ করলে লিউব্‌কা।

এদিকে ধড়িবাজ আলেকজান্দ্রা করেছে কী—ইতিমধ্যে কোন্ এক ফাঁকে গিয়ে বাড়ীর কর্তাকে জানিয়ে দিয়ে এসেছে যে লিখোনিন কোত্থেকে একটা আইবুড়ো মেয়েকে কুড়িয়ে এনে তার সঙ্গে একই ঘরে সারারাত কাটিয়েছে। কর্তামশাই ভারী কড়া লোক, ভাড়াটেদের সঙ্গে ব্যবহার করেন—যেন এক বিধ্বস্ত নগরে প্রবেশ করেছেন এসে কোন্-এক বিজয়ী বীর; ওরই মধ্যে যা-একটু ভয় করে চলেন তিনি সে ওই ছাত্রদের, তাদের কাছেই মাঝে মাঝে ভারী জব্দ হতে হয় তাঁকে। যা হোক, শেষ অবধি নিজের ঘরখানা থেকে খানকয়েক ঘর ছাড়িয়ে, সেই একই ছাদের তলায় লিউব্‌কার জন্যে ছোট্ট একখানা কামরা তখন-তখনই ভাড়া করে লিখোনিন শান্ত করলে বাড়ীওয়ালাকে।

—"তা হোক, মঁসিয়ে লিখোনিন, কালই অবশ্য অবশ্য আপনি ছাড়-পত্রখানা এনে দাখিল করবেন,"—যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন তিনি: "আপনাকে অনেক কাল থেকে চিনি আর মান্যগণ্য ভদ্রলোক বলেই জানি, তাই শুধু আপনারই খাতিরে করলাম এ কাজ। জানেনই তো দিনকাল কী খারাপ পড়েছে। কেউ যদি লাগানি ভাঙানি করে তবে আমরা চাকরী তো যাবেই, চাই কী দেশছাড়াও করতে পারে আমায়। বড্ড কড়াকড়ি করছেন ওঁরা আজকাল।"

সন্ধ্যার সময় লিউব্‌কাকে নিয়ে প্রিন্স-পার্কে বেড়াতে গেল লিখোনিন; তারপর অভিজাত-মহলের বাজনা শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। লিউব্‌কাকে ওর ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে, বাপের মতো ওর কপালে আশীর্বাদী চুম্বন দিয়ে, দোরগোড়া থেকেই বিদায় নিলে সে। তারপর কাপড়চোপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে একখানা আইনের বই পড়তে সুরু করেছে, এমন সময় বিড়ালের মতো দোর আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ লিউব্‌কা এসে ঢুকে পড়ল তার ঘরের ভেতর।

—"প্রিয় আমার! প্রাণ আমার! আবার তোমায় বিরক্ত করতে

এসেছি, মাপ করো। স্ট্‌চস্‌তো আছে তোমার কাছে ? তাই বলে রাগ কোরো না আমার 'পরে ; এক্ষুণি চলে যাচ্ছি আমি।"

—"লিউবা! মিনতি করছি তোমায়, এক্ষুণি নয়, এই মুহূর্তেই চলে যাও তুমি। শেষ অবধি বলছি, যাও তুমি!"

—"প্রিয় আমার, মাণিক আমার!"—বিসদৃশভাবে অথচ করুণ সুরে বলতে থাকে লিউব্‌কা: "সারাটা দিন আমায় কেবলই গর্জে বেড়াচ্ছ কেন তুমি?" সঙ্গে সঙ্গে চট করে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারের মধ্যে এসে লিখোনিনের কোল ঘেঁসে শুয়ে পড়ে সে।

—"না, লিউবা, এ হতে পারে না আর,"—দশ মিনিট বাদে, দোরের পাশে দাঁড়িয়ে, কম্বলে সারা অঙ্গ ঢেকে, বলতে থাকে লিখোনিন: "কালই আর একটা বাড়ীতে ঘরভাড়া করে রেখে আসব তোমায়। আর এ-ও বলছি ফের, এ রকমটি ঘটতে দিয়ো না আর! ভগবান তোমায় রক্ষা করুন, বিদায় এখন! আর কথা দিয়ে যাও আমায় যে আমাদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতন শুধু, আর কিছু নয়।"

—"কথা দিলাম, বন্ধু; দিলাম, দিলাম, দিলাম!"—হেসে ছেলে-মানুষের মতো তিন সত্যি করে লিউব্‌কা; তারপর চট করে প্রথমে তার ঠোঁটে, পরে তার হাতে চুমো দিয়ে দেয়।

শেষ চুম্বনটি ছিল তার সম্পূর্ণ সহজাত ব্যাপার; হয়তো লিউব্‌কার নিজের কাছেও একেবারে অপ্রত্যাশিত। জীবনে এ যাবৎ ও এক ওই ধর্মযাজক ছাড়া আর কোনও লোকেরই হস্তচুম্বন করেনি কখনও। হয়তো এর দ্বারা ও প্রকাশ করতে চেয়েছে লিখোনিনের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা, তার কাছে তার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ—সে যেন ওর জীবন-দেবতা।

—পনেরো—

রুশিয়ার সুধিজনদের মধ্যে বিস্তর চমৎকার লোক রয়েছেন—রুশিয়ার মাটিতে জন্ম তাঁদের, রুশিয়ারই কৃষ্টিতে মানুষ তাঁরা—বীরের মতো মরণের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে লেশমাত্র দ্বিধা নেই তাঁদের অন্তরে, একটা আদর্শের জন্যে আজীবন অচিন্তনীয় দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-যাতনা, সবই অক্লেশে বরণ করে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু সামান্য একটা দরোয়ানের হুমকিতেই দিশেহারা হয়ে পড়েন তাঁরা, মাটির সঙ্গে মিশে যান হয়তো এক ধোপানীর মুখের সামনে, আর যদি কখনও থানায় যেতে হয় কোনও কাজে, তবে তো আর কথাই নেই! লিখোনিন ছিল অবিকল এই ছাঁচে গড়া একটি মানুষ। পরের দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে সে; মনে পড়ে গেল, আজই তো লিউব্‌কার ছাড়পত্রখানার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর হাত-পা যেন পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধুল। তার 'পরে আবার ছিপ্‌ ছিপ্‌ করে পড়ছে বৃষ্টি। "নাঃ, দুর্দৈব আর কাকে বলে! বেছে বেছে এমন সময়টিতেই বৃষ্টি!"—আস্তে আস্তে জামাকাপড় পরতে পরতে ভাবলে লিখোনিন।

ইয়ামস্কায়া ওর ওখান থেকে তেমন যে কিছু দূর তা নয়—এক মাইলেরও কম। আর ও-দিকে যে ও যেতও না কখনও তা-ও নয়, তবে এর আগে দিনের বেলা কখনও যাবার দরকার হয়নি বটে। রাস্তায় এসে বেচারার মনে হতে লাগল—ঠিকেগাড়ীর গাড়োয়ান, পুলিশম্যান, সবাই কৌতূহলী হয়ে চেয়ে আছে ওর দিকে, বুঝে নিয়েছে তারা ওর গন্তব্যস্থান কোথায়। অস্বস্তি! সেখানে গিয়ে ও কী কী বলবে, তারপর থানায় গিয়েই বা কী বলবে, বারবার মনে মনে আউড়ে চলে বেচারা, আর যত বারই ও গোড়া থেকে সুরু করে ততবারই তা মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়। আঃ কী জ্বালা!

—"মেয়েটিকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রাখবার কোনও অধিকার নেই তোমার!"

—"বেশ তো! তা সে নিজেই এসে বলুক না কেন।"

—"তা, আমি তো তারই নির্দেশমাফিক কাজ করছি।"

ক্রমে আনা মারকোবনার বাড়ীতে এসে পৌঁছয় লিখোনিন। দরজা-জানলা সব বন্ধ, ঘুমিয়ে আছে যেন বাড়ীখানা। আশেপাশের সব বাড়ীগুলোও তাই। সারা রাস্তাটাই জনশূন্য, খাঁ খাঁ করছে সব। মহামারীর প্রকোপে উচ্ছন্ন হয়ে গেছে বুঝি অত বড়ো অঞ্চলটা, ঘরদোর বন্ধ করে পালিয়েছে যেন সবাই। ভয়ে ভয়ে গিয়ে ঘণ্টা নাড়ে লিখোনিন।

একজন ঝী মেজে ধোয়াপোঁছা করছিল; এসে সামনে দাঁড়ায়।

—"জেন্‌কার সঙ্গে দেখা করতে চাই,"—ভয়ে ভয়ে বলে লিখোনিন।

—"তা, এই, মিস্ জেনী তো এখন লোক নিয়ে আছেন। এখনও ঘুম ভাঙেনি গো ওনাদের।"

—"বেশ, তামারাকে ডেকে দাও তবে।"

সন্দিগ্ধ চোখে চায় ঝী তার দিকে, তারপর বলে: "মিস তামারা —জানিনে···মনে হচ্ছে যেন তিনিও লোক নিয়ে আছেন। তা কী চাই গো আপনার···বসতে এয়েছেন, না আর কিছু?"

—"আঃ, সে যাই হোক গে! ধরোই না হয়, বসব।"

—"জানিনে বাপু। দেখে আসিগে। বসুন গো একটু তবে।"

আবছা অন্ধকারে একা একা পায়চারি করতে থাকে লিখোনিন। "নাঃ, অনর্থক এ কৌতুককর নাটকীয় ব্যাপারে হাত না দেওয়াই উচিত ছিল আমার!"—মনে মনে তোলাপাড়া করতে থাকে সে: "সারা য়ুনিভার্সিটিতে একটা আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছি আমি এখন। দেখছি নেহাৎ শয়তান এসে ভর করেছিল কাঁধে আমার। কালও তো ও চলে আসতে চেয়েছিল এখানে; রেহাই পেতাম তা হলে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে এখন। তা' কাল আরও দেরি হবে, পরশু আরও। তা এখনও বোধহয় সময় আছে। আর নয়ই বা কেন? একদম ছ্যাবলা মেয়ে, অপরিণত, হয়তো ওদের আর সবার মতো মাথাপাগলাও একটু। নাঃ, আস্ত একটা জানোয়ার, জানে শুধু আকণ্ঠ গিলতে আর লোকের সঙ্গে শুতে। উঃ! কী পাপ!" চোখ বোঁজে লিখোনিন: "হায় রে!

যদি প্রলোভনে না ভুলতাম সেদিন !" তারপর নিজেকেই নিজে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে সে : "দু'দুবার পা হড়কেছে এরই ভেতর ; চলন তা হলে এই রকম…"

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বিপরীত চিন্তাধারাও বইতে থাকে তার মাথার মধ্যে দিয়ে ; "তা হোক, মরদ আমি ! মরদ কি বাত হাতী কি দাঁত ! যে ভাবে ভাবিত হয়ে করেছি এ কাজ তা খুবই মহৎ, উদার, অপার্থিব। মনে তো পড়ে তখনকার সেই অপরূপ উন্মাদনা যখন আমার চিন্তাধারা কর্মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করলে। কী বিশুদ্ধ প্রচণ্ড অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠেছিল অন্তরে তখন ! না কি সে ছিল শুধুই চিত্তবিকার, মত্ততার খেয়াল, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, আর উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনার ফল ?"

সঙ্গে সঙ্গে মনের গহনে তার ভেসে ওঠে লিউব্কার মুখখানা— অবোধ, সরল, মমতামাখা মুখখানা, যেন কতকালের কতদিনের চেনা সে মুখ, অসীম আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন তার সঙ্গে,—তবুও বিরাগ আসে কেন, অন্যায় অকারণে ?

—"আমি কি কাপুরুষ ?"—মনে মনে গর্জে ওঠে লিখোনিন : "কৈ, এতদিন তো পরোয়া করে চলিনি কাউকে ! আজ তবে কী হয়েছে তোমার, লিখোনিন ? এই যে একটি অপরূপ ভাব, একটি মানবাত্মা নিয়ে গবেষণা, শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে বিফল, ভেবে দেখো, তার গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছ তুমি—কিন্তু তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে যাবে তুমি কার কাছে ? কার কাছে ? জেগে ওঠো, লিখোনিন ! তৃণবৎ অগ্রাহ্য করতে শেখো লোকনিন্দা !"

ঘরে এসে ঢোকে জেনী—আলুথালু কেশ, ঘুমন্ত ভাব, পরণে সাদা হাফঘাগরার 'পরে রাতের কোর্তা।

…"আ-আ !"—হাই তুলে লিখোনিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে : "কেমন আছ, পড়ুয়া মশাই ! নতুন জায়গায় গিয়ে তোমার লিউবোচ্কার লাগছে কেমন ? একবার নিয়ে যেয়ো আমায় নেমন্তন্ন করে। না কি নিরিবিলি মধুমাস যাপন করছ এখন, অ্যাঁ ? বাইরে থেকে সাক্ষীসাবুদ নেই বুঝি কেউ ?"

—"বাজে কথা থাক এখন, জেন্নেচ্‌কা। আমি এসেছি পাশপোর্টের তদ্বিরে।"

—"ও ··! পাশপোর্ট,"—ভাবতে বসে যায় জেন্‌কা: "তা, এখানে তো নেই পাশপোর্ট, বাড়ীউলীর কাছ থেকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে একখান' শাদা টিকিট। বুঝলে, আমাদের এই বেশ্যামাগীদের যে শাদা টিকিট থাকে তাই, তারপর থানায় গেলে সেখানা বদলে আসল বইখানা দিয়ে দেবে ওরা। কিন্তু আমি থাকলে আবার হবে হিতে বিপরীত। বাড়ীউলী কি দরোয়ানের কাছে এ নিয়ে দরবার করতে গেলে আর আস্তটি রাখবে না আমা'য়। তুমি বরঞ্চ এক কাজ করো। ঝীকে দিয়ে বাড়ীউলীকে বলে পাঠাও যে একজন খদ্দের এয়েছে, পুরানো লোক, জরুরী কাজে তার সঙ্গে তোমায় সাক্ষাৎ আলাপ করতে হবে। আমায় কিন্তু মাপ করতে হবে—সটকে পড়ছি আমি, রাগ কোরো না, মিনতি করছি। জানই তো—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু এখানে এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কেন? ক্যাবিনেট-ঘরে গিয়ে বসো গে যাও। আমি বরঞ্চ বীয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি সেখানে। না, কি কফি? না, আর কিছু, অ্যাঁ?"—দুষ্টুমি-ভরা চোখে চেয়ে বলে: "না, কি কোন ছুঁড়ীকে দেব পাঠিয়ে, অ্যাঁ? তামারা তো কাজে ব্যস্ত এখন, তা বোধহয় নিউরা কি ভেরকাকে হলেই চলবে···কেমন?"

—"থামো, জেনী! এসেছি একটা জরুরী কাজে, আর তুমি কি না···"

—"বেশ, বেশ, আর বলব না! আর বলব না! এম্নি ঠাট্টা করে বলছিলাম শুধু। তা দেখছি, বেশ নিষ্ঠা মেনে চল তুমি। খুব ভালো বলতে হবে তোমায়। এসো তবে।"

তাকে ক্যাবিনেট-ঘরে এনে বসায় জেনী। তারপর ভেতর থেকে জানলা খুলে দিতেই সকালবেলার সোনালি আলোয় ভেতরটা হেসে ওঠে। "ঠিক এইখানটিতে বসেই আরম্ভ হয়েছিল,"—বিষণ্ণ হৃদয়ে মনে পড়ে লিখোনিনের।

—"আমি চলে যাচ্ছি,"—বলে ওঠে জেন্‌কা: "মাগীর সামনে কিন্তু একদম নুয়ে পড়ো না—সাইমনের সামনেও নয়। যতটা পারবে,

হুমকি লাগাবে ওদের। এখন দিনের বেলা, কিস্সুটি করতে পারবে না তোমায় ওরা। যদি তেমন তেমন দেখো, সিধে শাসিয়ে দেবে যে এক্ষুণি তুমি গবর্ণরের কাছে গিয়ে নালিশ করবে ওদের নামে। বলবে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওদের এ-সব বন্ধ হয়ে যাবে, আর দেবে শহর থেকে তাড়িয়ে। খালি ধমক-ধামক লাগাবে, দেখবে, একেবারে ভিজে বেড়ালটি হয়ে পড়েছে তোমার সামনে। আচ্ছা, আসি এখন, জয় হোক তোমার!"

জেনী চলে যায়। মিনিট দশেক পরে এম্মা এডোয়ার্ডোব্না এসে ঘরে ঢোকেন। লিখোনিন উঠে করমর্দন করে তাঁর সঙ্গে, গোদা হাতখানা হাতের মধ্যে নিয়ে ঘৃণাভরে ভাবে লিখোনিন: জাহান্নমে যাক! শয়তানীর হাতখানার মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কত শত খুনখারাপিই না লেখাজোখা আছে!

ইয়ামকাতে আসবার সময় টাকাকড়ির সঙ্গে সঙ্গে লিখোনিন পকেটে একটা রিভলভারও এনেছিল লুকিয়ে—কী জানি যদি দরকারে লাগে! কিন্তু এখন দেখা গেল ও-জিনিসটির কোনই দরকার ছিল না, কিন্তু যেমনটি ভেবে এসেছিল ও, কাজ হাসিল করাটা তার চেয়ে ঢের সহজ অথচ ক্লান্তিকর আর নীরস ভাবে সমাধা করতে হলো—অপ্রীতিকরও হয়ে উঠল অনেক বেশি।

—"আসুন, মশাই!"—অবহেলাভরে বেশ একটু ভারিক্কী চালে বলেন বড়োখবরগিরনী ঠাকরুণ; তারপর নিজের পর্বতপ্রমাণ দেহভার নীচু-মতন একখানা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে একটি সিগ্রেট ধরিয়ে সুরু করেন তিনি: "পয়সা দিলেন মশাই মোটে একটি রাতের জন্যে, তারপর আরও এক রাত আর একটা দিন দিলেন কাবার করে মেয়েটাকে নিয়ে। তার ওপর, আরও পঁচিশ রুবল ধারেন আপনি। কোনও ছুঁড়ীকে যখন আমরা একরাতের জন্যে ছেড়ে দিই তখন নিয়ে থাকি দশ রুবল, আর চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পঁচিশ রুবল। ওই হচ্ছে মাশুল, আর কী। সিগ্রেট খাবেন না?"—কেসটা এগিয়ে দেন তিনি, লিখোনিনও পুতুলের মতো তুলে নেয় একটা সিগ্রেট।

—"সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়ে কথাবার্তা কইতে এসেছিলাম আমি।"

—"ও! তা সে আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি সব। বোধ করি মশায় ছুঁড়ীদেরকে, মানে এই লিউব্‌কাদের, নিজের কাছে নিয়ে রাখতে চান—তা ওই কী বলে যেন, এই 'উদ্ধোর' করতে ছুঁড়ীদেরকে—অ্যাঁ? বেশ, বেশ, বেশ! অমন কাণ্ড ঢের ঢের হয়ে থাকে এখানে। বাইশটে বচ্ছর কাটাচ্ছি আমি এই বেউশ্যে বাড়ীতে, জানি আমি বোকচন্দর ছেলেছোকরাদের এ সব কাণ্ডকারখানা। তবে বলে দিচ্ছি, কিস্‌সু লাভ নেই ওতে।"

—"তা লাভ হয় কি না হয় সে আমি বুঝব এখন"—নিজের হাতের আঙুলগুলোর 'পরে চোখ রেখে, মনমরার মতো উত্তর দেয় লিখোনিন; হাঁটুদুটো কাঁপছে তখন তার।

—"হ্যাঁ, তা তো বটেই, সে আপনিই বুঝবেন, পড়ুয়া মশাই"—চাপা হাসিতে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে এমমা এডোয়ার্ডোব্‌নার থলথলে গালদু'খানা আর প্রকাণ্ড থুৎনিটা: "আপনাকে আমি দিল থেকে সোহাগ জানাচ্ছি, পেয়ার-পিরীত জোটে যেন আপনার নসীবে। কিন্তু ওই হতভাগী লিউব্‌কাকে বলবেন, এখানে ফের যেন নাক গলাতে না আসে ছুঁড়ী, আপনি যখন কুকুরছানাটির মতো দূর দূর করে রাস্তায় খেদিয়ে দেবেন মাগীকে। ক্ষিদেয় ককিয়ে ককিয়ে মরুক ছুঁড়ী বেড়ার ওধারে পড়ে, নয়তো যায় যেন মরতে সেপাইদের ওই সব আধ-কুবলের আড্ডাখানায়।"

—"ভয় নেই, ফিরবে না সে কোনদিন। আমি ওর সার্টিফিকেট-খানা নিতে এসেছি, চটপট দিয়ে দিন।"

—"সার্টিফিকেট? বেশ তো! চান তো এক্ষুণি দিচ্ছি বার করে। শুদ্ধু ওর ধার-দেনা যা রয়েছে তা মিটিয়ে দিয়ে যান। একবার চোখ চেয়ে দেখুন, এই যে ওর জমাখরচের খাতা। ইচ্ছে করেই সঙ্গে করে এনেছি। আগেই আঁচ করেছি কি না, কী নিয়ে কথাবার্তা হবে আপনার সঙ্গে।" বুকের ভেতর থেকে বইখানা তুলে ধরে এম্‌মা—ছোট্ট একখানা বই, মলাটের 'পরে লেখা রয়েছে: 'মিস আইরীন্ বোথশেন্-কোবার জমাখরচ, আন্না মারকোবনা সোইবেশ পরিচালিত গণিকালয়, ...নং ইয়ামস্কায়া স্ট্রীট।' বইখানা টেবিলের ও-পাশে এগিয়ে দেয়

এম্‌মা। খাতা খুলে লিখোনিন প্রথম ছাপানো হরফে লেখা নিয়মাবলির কতকটা পড়ে দেখে। লেখা রয়েছে, বইখানার দু'কপি রাখতে হবে, একখানা থাকবে বাড়ীউলীর কাছে, আর একখানা গণিকাটির কাছে; আয়ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব দু'খানা বইতেই তুলতে হবে; চুক্তিমতো গণিকাটি থাকা, খাওয়া, আলো, জ্বালানি, বিছানাপত্র, এসব পাবে, আর তার জন্যে বাড়ীউলীকে যে ভাড়া দিতে হবে, তা তার আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারবে না কোনোমতেই; বাকি টাকা দিয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে বেশভূষা করতে হবে; বাইরে বেরোবার জন্যে তার থাকা চাই অন্ততঃ দু'দফা পোষাক-আষাক। স্ট্যাম্প দিয়ে বাড়ীউলীকে টাকা নিতে হবে; মাসে মাসে জমাখরচের হিসেব তৈরি করতে হবে। ধারদেনা সত্ত্বেও যদি কোনও গণিকা কখনও গণিকালয় ত্যাগ করতে চায় তবে বাড়ীউলী সাধারণ ঋণ-আইনের শর্ত মাফিক তার দেনার জন্যে মুচলেকা নিয়ে আর সব মকুব করতে বাধ্য।

এই শেষের সর্তটার 'পরে আঙুল বুলিয়ে দেখিয়ে, মহা উৎসাহে বলে ওঠে লিখোনিন: "এই যে দেখুন, যে-কোনও সময় বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার অধিকার রয়েছে ওর। কাজে কাজেই যখন খুশি সে এই নরককুণ্ড থেকে, যেখানে আপনাদের অত্যাচার...." বকবক করেই চলে লিখোনিন, ধীরে-সুস্থে এম্‌মা থামিয়ে দেয় তাকে: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বেশ ভালো করেই জানা আছে আমার। বেশ তো, যাক না চলে; কিন্তু যাবার আগে ধারদেনাটা শোধ করে দিয়ে যাবে তো!"

—"হাতচিঠে দিলে হবে? তাই দেবে ও।"

—"ফুঃ! হাতচিঠে দেখাচ্ছে! পয়লা নম্বর, ও জানে না লিখতে পড়তে; দোসরা নম্বর, ওর হাতচিঠের দাম কী? এক থোক থুথুর সামিল, তার বেশি নয়। তবে যদি একজন নির্ভরযোগ্য লোককে জামিন দিতে পারে, আমার বলবার কিছুই থাকবে না।"

—"কৈ, আইনে তো জামিনটামিনের কথা কিছু বলছে না।"

—"আইনে অনেক কিছুই বলে না! আইনে একথাও বলে না যে মালিকদের না জানিয়ে কোনও ছুঁড়ীকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া চলে।"

—"অতশত বুঝিনে। ওর শাদা টিকিটখানা আমায় দিতেই হবে।"

—"তেমন বোকা পেলে আমায়, অ্যাঁ? কোনও মান্যগণ্য ভদ্রলোক আর পুলিশকে নিয়ে এসো এখানে; পুলিশ বলুক যে তোমার বন্ধুটি শাঁসালো লোক; তিনি দাঁড়ান তোমার জামিন; তা ছাড়া পুলিশ বলুক যে, তুমি ছুঁড়িকে দিয়ে ব্যবসা চালাতে, কি তাকে আর কোথাও বেচে দিতে যাচ্ছ না—তারপর যা অভিরুচি তোমার! ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে এসো, বাছা।"

—"গোল্লায় যাক!"—চেঁচিয়ে ওঠে লিখোনিন: "কিন্তু আমি যদি জামিন হই, আমি নিজে! আমি যদি হাতচিঠেয় সই দিই সিধেসিধি…"

—"দেখো ছোকরা! তোমাদের ওই সব য়ুনিভার্সিটীগুলোতে কী যে লেখাপড়া শেখানো হয় তা জানিনে, তাই বলে আমাকে কি তুমি এমনই আহাম্মক পেলে না কি গো? ভগবান করুন, তোমার পরণে যে ছ্যাতাকাঁথা রয়েছে তার বাড়বাড়ন্ত হোক। ভগবান করুন, আজীবন দোকানপসার থেকে এঁটোকাঁটা কিনে খাবার ক্ষমতা থাকে যেন তোমার, আর তুমিই কি না বলছ হাতচিঠে দেবে! আমার মাথা খারাপ করবার যোগাড় করছ কেন বসে বসে?"

ক্ষেপে যায় লিখোনিন, পকেট থেকে টাকার থলি বার করে ঝনাৎ করে রাখে টেবিলের 'পরে।

—"বেশ তো, এক্ষুণি নগদ টাকা দিয়ে দিচ্ছি আমি!"

—"তা, সে হলো আলাদা কথা,"—মিঠে করে বলে বাড়ীউলী, তবুও সন্দেহ তার ঘোচে না: "একবার একটু কষ্ট করে তোমার পীরিতের রাঁড়ের জমাখরচের খাতাখানা উল্টে দেখবে কি?"

—"মুখ সামলে কথা ক, ঘাটের মড়া কেথাকার!"

—"বেশ, মুখ বুঁজেই রইলাম, মুখ্যুর সর্দার!"—দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয় বাড়ীউলী।

খাতাখানা খুলে দেখতে থাকে লিখোনিন, রুলটানা পাতাগুলোর বাঁদিকে জমার ঘর, ডানদিকে খরচের। পড়তে থাকে লিখোনিন:

১৫ই এপ্রিল—জমা—১০ রুবল; ১৬ই—৪ রুবল; ১৭ই—১২; ১৮ই—অসুস্থ; ১৯শে—অসুস্থ; ২০শে—৬ রুবল; ২১শে—২৪।"

—"কী সর্বনাশ!"—ভয়ে, ঘৃণায়, না ভেবে থাকতে পারে না লিখোনিন: "বারো জন লোক এক রাতে!"

মাসের শেষে জমার ঘরে অঙ্ক দাঁড়িয়েছে: মোট ৩৩০ রুবল।

—"বাপ্‌স্! কী পাপ! একশো পঁয়ষট্টি বার লোক বসিয়েছে একটি মাসে!"—মনে মনে হিসেব করতে থাকে লিখোনিন, পাতাও উল্টে চলে সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ডানদিকের ঘরগুলো দেখতে বসে সে: 'লেস দেওয়া লাল সিল্কের পোযাক—৮৪ রুবল, পোষাকউলী এল্‌দোকিমোবা; প্রভাতী পোযাক, আটপৌরে, লেস দেওয়া—৩৫ রুবল, পোষাকউলী এল্‌দোকিমোবা। সিল্কের মোজা ৬ জোড়া,—৩৬ রুবল।' 'গাড়ীভাড়া, মেঠাই, সুগন্ধি'...'মোট ২০৫ রুবল।' তারপর ৩৩০ রুবল থেকে বাড়ীউলীর প্রাপ্য বাবদ কেটে নেওয়া হয়েছে ২২০ রুবল; রইল ১১০ রুবল। তা থেকে পোষাক-আষাক, জিনিসপত্র কেনাকাটা, এ সবের জন্যে ১১০ থেকে দাম কেটে নেবার পর ধার রয়েছে ৯৫ রুবল, আর গত বছরের ৪১৮ রুবলের জের টেনে এনে এ যাবৎ মোট ধার দাঁড়িয়েছে এসে ৫১৩ রুবলে।

দমে যায় লিখোনিন। প্রথমটায় জিনিসপত্রের দরটর নিয়ে খানিকটা আপত্তি জানাবার চেষ্টা করে। সুবিধে হয় না।

—"তোমার এই পোষাকউলীটি একটি খাঁটী রক্তচোষা।"—গর্জে ওঠে লিখোনিন। "ষড় আছে তোমার সঙ্গে।"

লিখোনিন যতই উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করতে থাকে, এম্মা এডোয়ার্ডোবনা ততই যেন তামাসা দেখে বসে বসে। শেষে বলে সে: "দ্যাখো, এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। বেশি চিল্লাচিল্লি করো না, নইলে দরোয়ানকে ডেকে ঘাড় ধাক্কা দিইয়ে বার করে দেব।"

বিস্তর বাগবিতণ্ডা ঝুলোঝুলির পর শেষে একটা রফা করতে হলো লিখোনিনকে। নগদ ২৫০টি রুবল গুণে দিয়ে, বাকিটার জন্যে হাতচিঠে লিখে, রেহাই পেতে হলো তাকে—তা-ও আবার য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রমাণ করার পর যে এ বছরই পাশ করে ও আইনের ব্যবসায় নাববে।

টিকিটখানা আনতে গেল বাড়ীউলী। একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ লিখোনিনের চোখে পড়ল কাঁচের ফ্রেমে বাঁধাই পুলিশী আইনের ছাপানো বিজ্ঞাপনীর 'পরে। জিনিসটা এই প্রথম নজরে পড়ল তার। কৌতূহলী হয়ে পড়ে দেখতে গেল সে। সরকারী কেতায় লেখা—নির্লজ্জ ব্যবসাদারি ভাষায় কুৎসিৎ সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়, মেয়েদের গুপ্ত প্রসাধন, সাপ্তাহিক ডাক্তারী পরীক্ষা আর তার জন্যে যে অবস্থায় তাদের সব থাকতে হবে, এই সব বিষয়ের নির্দেশ। লিখোনিন পড়তে লাগল—কোনও গণিকালয় গির্জাঘর, ইস্কুলকলেজ, আদালত, এ-সব স্থানের একশো পায়ের মধ্যে থাকতে পারবে না, মেয়েছেলে বাদে আর কেউ কোনও গণিকালয় রাখতে পারবে না; বাড়ীউলী আর মেয়েদের মধ্যে সদ্ভাব রেখে চলতে হবে; খদ্দেরের সঙ্গে বেশ্যাদের ভদ্র ব্যবহার করতে হবে; কোনও বেশ্যা কখনও গর্ভপাত করতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। "কী উঁচু নৈতিক আদর্শ রে!"—বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে লিখোনিন।

শেষ অবধি এম্মা এডোয়ার্ডোব্‌নার সঙ্গে কারবার মেটে বটে! রসিদ লিখে এম্মা টিকিট আর রসিদখানা একসঙ্গে এগিয়ে দেয় লিখোনিনের দিকে, আর লিখোনিনও টাকাটা গুণে আস্তে আস্তে এগিয়ে দেয় এম্মার দিকে—দু'জনেই সাবধানে খরতর দৃষ্টি রাখে দু'জনের 'পরে, কেউই কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না একতিল। লিখোনিন কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, এম্মা আসে দোরগোড়া অবধি তাকে এগিয়ে দিতে। রাস্তায় এসে নেবে পড়েছে লিখোনিন, এম্মা সিঁড়ির 'পরে দাঁড়িয়ে; গলা বাড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে এম্মা: "ছোকরা, হেই ছোকরা!

ফিরে দাড়ায় লিখোনিন: "আবার কী?"

—"একটা কথা আছে। শোনো, তোমার লিউব্‌কা, বুঝলে, ওটা হলো একদম বাজে মাল, চোর আর গর্মিরুগী। আমাদের সেরা খদ্দেররা কেউই পুঁছত না ওকে,—বুঝলে? যাক, ভালোই হয়েছে যে তুমি এসে ওকে নিয়ে চলে গেলে, নইলে দু'দিন বাদে আমরাই ওকে তাড়িয়ে দিতাম এখান থেকে। থাকত ও আমাদের দরোয়ানের সঙ্গে

কারবার চালাত পুলিশ, দরোয়ান, ছিঁচকে চোর, এদের সঙ্গে। তোমার এ বৈধ বিবাহে অভিনন্দন জানাচ্ছি গো।"

—"উঃ। বিচ্ছু!"—হুঙ্কার দিয়ে ওঠে লিখোনিন।

—"উজবুক কোথাকার!"—গালাগাল দিয়ে ঝনাৎ করে দোর বন্ধ করে দেয় বাড়ীউলী।

একখানা গাড়ী ডেকে লিখোনিন চলে থানার দিকে। সাদা কাগজখানা এতক্ষণে উল্টেপাল্টে দেখে সে। এই সেই প্রসিদ্ধ 'হলদে টিকিট!' তাতে লেখা আছে লিউব্‌কার নাম, বাপের নাম, পদবী, আর পেশা লেখা রয়েছে—"বেশ্যাবৃত্তি।" আর এক পিঠে আছে বেশ্যাদের চালচলন, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এই সব বিষয়ে নানা রকমের সংক্ষিপ্ত বিধিনির্দেশ। "যে কোনও খদ্দেরের,"—পড়ে দেখে লিখোনিন, "বেশ্যাটির কাছ থেকে তার শেষবারের ডাক্তারী পরীক্ষার সার্টিফিকেটখানা চেয়ে দেখবার অধিকার রয়েছে।"

—"আহা, বেচারী মেয়েরা!"—বিষণ্ণ হৃদয়ে ভাবে লিখোনিন: "কী-ই না করা হয়ে থাকে তোমাদের প্রতি! যত রকমের অন্যায় অবিচার হতে পারে তার সবই—যাতে করে সব তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শেখ তোমরা সেই 'কলুর চোখঢাকা বলদের মতো'।"

থানায় এসে জেলার দারোগা সাহেব বারকেশের সঙ্গে দেখা হলো। হ্যাঁ, দারোগা তো দারোগা বারকেশ দারোগা!

—"কী চাই হে তোমার, ছাত্রবাবাজী?"

সংক্ষেপে তার উদ্দেশ্য বিবৃত করে লিখোনিন।

—"আর তাই আমি চাই মেয়েটিকে আমার কাছে নিয়ে রাখতে··· তা' আপনার কাছে আমায় এখন কী বলে মুচলেকা দিতে হবে···ঝী বলে, না, এম্নি আত্মীয় বলে···কী করে করতে হয় এসব?"

"তা' ধরোই না হয় এই বাঁধা রাঁড়, কি, বৌ বলেই হলো"—তাচ্ছিল্যভরে জবাব দেন বারকেশ; মনোগ্রাম-করা রূপোর সিগারকেসটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন: "আমার দ্বারা কিছুই হতে পারে না···অন্ততঃ এক্ষুণি তো নয়ই। যদি বিয়ে করবার মতলব থাকে ছুঁড়ীকে তো তোমার য়ুনিভার্সিটীর কর্তাদের কাছ থেকে যথা-

নিয়মে অনুমতিপত্র এনে দাখিল করতে হবে। আর যদি পেটভাতায় নিয়ে গিয়ে রাখতে চাও তো একবার বুঝে দেখতে চেষ্টা করো এর মধ্যে যুক্তিটা কোথায়? বার করে আনতে চাইছ তুমি একটা ছুঁড়ীকে এক কুস্থান থেকে, তার সঙ্গে অন্যায় ভাবে সহবাস করবে বলে।"

"ঝী হয়ে থাকবে সে, তবে,"—উত্তর দেয় লিথোনিন।

—"তা ঝী-ই না হয় হলো। তোমার বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে তবে একটা এফিডেভিট দাখিল করতে হবে, কেন না—মনে হচ্ছে—নিজের কোনও ঘরদোর নেই তোমার? তা হলেই হলো, বাড়ীওয়ালাকে এভিডেটে বলতে হবে, ঝী পোষবার ক্ষমতা রয়েছে তোমার; তা ছাড়া আরও দলিলপত্র চাই—তুমি নিজে যে-লোক বলে পরিচয় দিচ্ছ, বাস্তবিকই যে তুমি সে-ই লোক তারই বা প্রমাণ কী? এই ধরো, যেমন, তোমার জেলা থেকে একখানা দলিল, য়ুনিভার্সিটি থেকে একখানা—এই রকম আর কী! তা তোমার নাম বোধকরি রেজিস্ট্রী করাই আছে? না, কি বে-আইনি ভাবে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছ তুমি, অ্যাঁ?"

—"না, আমার নাম রেজিস্ট্রী করাই আছে,"—উত্তর দেয় লিথোনিন। ধৈর্য হারাতে সুরু করেছে সে।

—"তা বেশ! কিন্তু সেই তরুণী মহিলাটি যাঁর জন্যে এমন কষ্ট ভোগ করছ তুমি?"

—"না, এখনও রেজেস্ট্রী হয় নি, তবে তার শাদা টিকিটখানা আমি পকেটে করেই এনেছি; দয়া করে সেখানা বদলে যদি তার আসল ছাড়পত্রখানা ফিরিয়ে দেন তবে এক্ষুণি তার নাম রেজেস্ট্রী করে ফেলব আমি।"

হাতদু'খানা ছড়িয়ে একবার আড়ামোড়া ভেঙে নেয় বারকেশ, তার পর ফের সিগার-কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে: "কিছুই করবার জো নেই, ছাত্রবাবাজী, একেবারে কিচ্ছুটি নয়, যতক্ষণ না সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করা হচ্ছে। আর ছুঁড়ীটার কথা হচ্ছে কী জান, তার তো থাকবার ঠাঁই নেই কোথাও, এক্ষুণি গ্রেপ্তার করে তাকে পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হবে—যদি না সে যেখান থেকে এয়েছে সেখানটিতেই ফিরে যেতে চায়। আচ্ছা, সসম্মানে নমস্কার জানাচ্ছি এখন।"

হ্যাট মাথায় দিয়ে দোরের দিকে মুখ ফেরায় লিখোনিন; কিন্তু চট করে একটা সুবুদ্ধি খেলে যায় তার মাথায়, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাবও উদয় হয় তার মনে। পেটের ভেতর থেকে বমি ঠেলে আসে যেন তার, হাতের চেটো দুটো ঘেমে নেয়ে ওঠে একেবারে, পায়ের আঙুলগুলো দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে; ফিরে এসে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে কিন্তু গলার সুরে বেশ একটুখানি সরস ভাব টেনে এনে বলে সে: "মাপ করবেন, দারোগা সাহেব। আসল কথাটাই ভুলে গেছি; আমাদের দু'জনেরই চেনা এক ভদ্রলোক আপনার কাছে তাঁর একটা সামান্য ধার শোধ করতে দিয়েছেন আমায়।"

—"হুঁ! চেনা ভদ্রলোক?"—নীল চোখদুটো মেলে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে জিজ্ঞেস করে বারকেশ: "কে তিনি?"

—"বার···বারবারিসোব।"

—"ও, বারবারিসোব? বটে, বটে, বটে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!"

—"তবে দয়া করে নিন রুবল দশটা?"

মাথা নাড়ে বারকেশ: "জান, তোমার এই বারবারিসোব, খুড়ী, আমাদের এই বারবারিসোব—ইনি হলেন গিয়ে আস্ত একটি শূয়ার। মোটে দশটি রুবল ধারে না সে আমার কাছে, ধারে সে পুরো একটি শতকের সিকি ভাগ। কোথাকার পাজি ওটা! পঁচিশ পঁচিশটে রুবল, মশাই; তা' ছাড়া খুচরোও আরও কিছু। তা খুচরোটা আমি অবশ্য ধরছিনে তার ধারের মধ্যে। পয়মন্ত হোক সে ভগবানের কৃপায়! জান, এ হলো গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার ধার। একেবারে খুনে ডাকাত লোকটা, খেলেও বেইমানি করে। ···তা, বাবাজী, বার করো পকেট হাতড়ে আরও পনেরোটা রুবল।"

—"তা, আপনিও তো দেখছি কম ঘুঘু নন, দারোগা সাহেব,"—টাকাটা বার করতে করতে বলে লিখোনিন।

—"রক্ষে করো, বাবা!"—একেবারে ভালোমানুষটি সেজে বলতে শুরু করেন দারোগা সাহেব: "বৌ, ছেলেপিলে···জানোই তো, বাবাজী,

কী মাইনে পাই আমরা···এই যে, এসো বাবাজী, এই তো পাশপোর্ট-খানা। রসিদ সই করো এখন।···কল্যাণ হোক!"

অবাক কাণ্ড! পাশপোর্টখানা যে শেষ অবধি তার পকেটে এসেছে, জ্ঞান হতেই লিখোনিনের অস্থির চিত্ত শান্ত হয়ে আসে, নতুন করে উৎসাহও জাগে তার প্রাণে।

—"যাক, সবচেয়ে কঠিন কাজটা সমাধা হলো তবে,"—তাড়াতাড়ি পথ চলতে চলতে ভাবে সে: "আসল কাজের পত্তনী হলো এতক্ষণে! দৃঢ় হও, লিখোনিন, ঝিমিয়ে পড়ো না ফের! যে কাজে হাত দিয়েছ তুমি, অপূর্ব, মহৎ সে কাজ। সৎকর্মে পুরস্কারের আশা করতে নেই। তবে কাল তোমার শিক্ষিত ভদ্রলোকের সামনে অতটা নেতিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। একটু ছেলেমানুষি আর বিচক্ষণতার অভাব দেখা গেছে, আর যাই হোক না কেন, সাত তাড়াতাড়ি সব ফাঁস না করাই ছিল ভালো। তা হোক গে যাক, সময়ে সব দোষই শোধরানো যায়···"

যেন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পাশপোর্টখানা এনে লিউবকাকে খুলে দেখায় লিখোনিন। তেমন কিছু অবাক হয় না সে, উৎফুল্ল হয়েও ওঠে না মোটে। বেশ একটু আশ্চর্যই বোধ করে লিখোনিন। লিউবকা শুধু খুশী হয় লিখোনিনকে ফিরে পেয়ে। বোধকরি বেচারার আদিম সরল অন্তরাত্মা ইতিমধ্যেই তার উদ্ধারকর্তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল—কে জানে? একেবারে লিখোনিনের ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিউবকা। লিখোনিন ধরে ফেলে তাকে, শান্ত ভাবে—প্রায় তার কানে কানেই—জিজ্ঞেস করে: "লিউবকা, বলো দেখি··· সত্যি কথা বলতে ভয় পেয়ো না, যা-ই কেন না হোক তা···এই এক্ষুণি ওরা বল্লে আমায়, তোমাদের বাড়ীতে, যে তোমার না কি কী-একটা ব্যামো আছে···জানোই তো ওই যাকে বলে খারাপ রোগ। বলো আমায়, যদি আমার 'পরে কিছুমাত্রও আস্থা থেকে থাকে তোমার, তবে বলো আমায় লক্ষ্মীটি, কথাটা সত্যি না মিথ্যে?"

রাঙা হয়ে ওঠে লিউবকা, দু'হাতে মুখ ঢেকে পাটাতনটার 'পরে আছাড় খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে বেচারা: "প্রাণ আমার! বাসিল বাসিলিচ! বাস্‌সিঙ্কা আমার! ভগবান সাক্ষী!

ভগবান সাক্ষী! কক্ষণো ও-সব কিচ্ছু হয়নি আমার গো! বড্ড ভয় ছিল আমার ওতে। ভারী সাবধানে থাকতাম আমি। এত ভালোবাসি তোমায়! নিশ্চয়ই বলতাম তোমায় তা হলে।" লিখোনিনের হাত দু'খানা ধরে বারবার তার ভিজে মুখের 'পরে চেপে চেপে ধরতে থাকে বেচারা—অনর্থক মিথ্যে দোষে দোষী কচি মেয়েটি যেন হাপুস নয়নে কেঁদে প্রাণপণে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চায়।

লিখোনিনের অন্তরাত্মা বুঝি বলে তার কানে কানে—বাস্তবিক নির্দোষ এ মেয়েটি।

মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহ শান্ত স্বরে বলতে থাকে লিখোনিন: "বিশ্বাস করছি তোমায়, বাছা! আর পাগলামি করে না, কাঁদে না, ছিঃ! শুধু ফের যেন আমাদের দুর্বলতার প্রশ্রয় না দিই আমরা। যা হয়ে গেছে—হোক গে যাক। ফের যেন অমনটি আর না হয়।"

—"তুমি যা চাইবে তাই করব আমি,"—লিখোনিনের হাতে, জামার কাপড়ে, বারবার চুমো খেতে খেতে ছোট্ট মেয়েটির মতো আধো আধো স্বরে বলতে থাকে লিউব্‌কা: "ফের যদি অমন করে বিরক্ত করি তোমায়, যা খুশী কোরো আমায় তবে।"

তবুও সে রাত্রেও ফের ধরা দিতে হয় প্রলোভনের দায়ে। তারপর প্রতিরাত্রেই। শেষে আর এ পতনদশা লিখোনিনের অন্তরে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করে না, একরকম অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে যায় ব্যাপারটা, পশ্চাত্তাপের জ্বালা জুড়িয়ে ছাই হয়ে যায় শেষে।

—ষোলো—

লিখোনিনকে কিন্তু প্রশংসাই করতে হয়। লিউব্কা যাতে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে থাকতে পারে তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি সে। এ সাড়ে-পাঁচমহলা পায়রার খোপ ছেড়ে দিতে হলো তাকে—অসুবিধার জন্যে ততটা নয়, আলেকজান্ড্রার দিনকে দিন দাপটের ঠেলায় যতটা। শহরের শেষপ্রান্তে গিয়ে সস্তা অথচ সুবিধে মতো দেখে, মাসিক নয় কবল ভাড়ায়, দুটো কামরা আর একখানা রান্নাঘরওয়ালা ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে, নতুন ঘর-সংসার পেতে বসলে সে লিউব্কাকে নিয়ে। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ঢের দূরে পড়ে গেল বটে লিখোনিন, কিন্তু নিজের স্বাস্থ্য আর সহনশক্তির 'পরে অগাধ আস্থা তার, প্রায়ই বলে সে: "দু'দু'খানা ঠ্যাং রয়েছে আমার, সে কি শুধু শুধু বসে থাকবার জন্যে?"

তা' দৌড়োদৌড়িও তাকে কম করতে হয় না। তাসের বাজি জিতে পুঁজিপাটা যা করেছিল, তা এই লিউব্কার পাশপোর্ট সংগ্রহ করতে আর নতুন সংসারের জন্যে এটা-ওটা-সেটা কেনাকাটা করতেই হাওয়া হয়ে গেল। ফের বাজি রেখে তাসখেলা সুরু করে লিখোনিন, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারে সে—তাসের তারা তার উল্টোবাজি খেলতে সুরু করেছে এবার।

এতদিনে লিখোনিন আর লিউব্কার আসল সম্পর্কটা বেমালুম ধরা পড়ে গেছে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তবুও তাদের সামনে বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্বের ভোল বজায় রেখে কথা কইতে চায় সে,—বোঝে না এ-ভাবে অনর্থক ভাণ করা আর মিছে কথা বলাটা বোকামির চূড়ান্ত হচ্ছে তার পক্ষে; কিংবা হয়তো বুঝেও সুর পাল্টাতে চক্ষুলজ্জায় বাধে ওর। তা' ওদের দু'জনার মাখামাখির মধ্যে লিখোনিন সর্বদাই গৌণ অংশে অভিনয় করে চলে, লিউব্কার তরফ থেকেই আসে প্রথম ধাক্কা

—আদর, সোহাগ, যা কিছু। (তা' লিউব্‌কা লিউব্‌কাই রয়ে গেছে এখনও, কী জানি কেন লিখোনিন একদম ভুলে বসে আছে যে পাশ-পোর্টে আসল নাম লেখা রয়েছে তার 'আইরীন।')

এই তো সেদিনও যে-লিউব্‌কা নিরাসক্ত ভাবে—কিংবা যথার্থ বলতে গেলে, অশস্ত উন্মাদনার ভাণ করে—দৈনিক দলে দলে লোকের কাছে করেছে দেহদান, মাসে মাসে বসিয়েছে শত শত লোক, সে-ই আজ তার সমস্ত নারীত্ব নিয়ে, প্রেম নিয়ে, ঈর্ষ্যা নিয়ে, একান্ত ভাবে হয়ে উঠেছে লিখোনিনের অনুরাগিণী—কায়মনোবাক্যে করেছে তার কাছে আত্মসমর্পণ। প্রিন্সকে ওর খুব মজা লাগে, সোলো-ভিয়েবকে মনে ধরেছে আমুদে লোক বলে, সিমানোব্‌স্কীর প্রচণ্ড মুরুব্বিয়ানায় অপরিসীম আতঙ্কের সঞ্চার হয় ওর প্রাণে; কিন্তু লিখোনিন ওর কাছে হলো একাধারে দেবতা ও প্রভু, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে যা হচ্ছে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস, লিখোনিন হলো ওর পার্থিব সম্পদ, ওর দৈহিক আনন্দ।

দেখা যায়, যে-পুরুষ জীবনটাকে একবার পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করে এসেছে, কামকলার নিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ ছারখার হয়ে গেছে যে, জীবনে আর কখনও সে দৃঢ়, একনিষ্ঠ ভাবে ভালোবাসতে পারে না—তার সে ভালোবাসায় কখনও একই সঙ্গে আত্মত্যাগ, পবিত্রতা, আর দুর্বার অমোঘ শক্তি দেখতে পাওয়া যায় না। মেয়েদের বেলায় কিন্তু এ রকম কোনও বিধান নেই, কোনও সীমারেখাও টানা চলে না। আর লিউব্‌কার জীবনে এখন বিশেষ করেই যেন অভিব্যক্ত হয়ে উঠল এই বাধাবন্ধনহীন প্রেমের লীলা। লিখোনিনের সুমুখে আনন্দে ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে পারে সে, পারে তাকে ক্রীতদাসীর মতো সেবাশুশ্রূষা করতে; কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে চায় সে লিখোনিন যেন একান্ত তারই হয়ে রয়—এই যে টেবিলখানা, ওই যে পোষা কুকুরছানাটি, এই তার নিজের গায়ের রাতের ব্লাউজখানা, এ সব জিনিসের চেয়েও তার একান্ত নিজের করে পেতে চায় সে লিখোনিনকে—এই সর্বগ্রাসী প্রেমের মধ্যে যাক হারিয়ে প্রেমাস্পদের নিখিল সত্তা, হোক তার আত্মাহুতি। লিউব্‌কার এই দুরন্ত দুর্বার প্রেমে পরিপূর্ণ ভাবে সাড়া দিয়ে উঠতে পারে না লিখোনিন,

বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে সেদিনকার সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর অকস্মাৎ দুর্বার নদীস্রোতের মতো দু'কূল প্লাবনে। মাঝে মাঝে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে বসে বসে মনে মনে ভাবে সে :

—"প্রতি সন্ধ্যায় করতে হয় আমায় চিরসুন্দর যোসেফের অভিনয়। তবু সে-ও একদিন কামনাময়ী নারীর হাতে পরিধানের অন্তর্বাসখানি ছেড়ে রেখে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে পেরেছিল। আমি কবে পাব কাঁধের এ জোয়াল থেকে রেহাই?"

তা ছাড়া তার নিজের আর লিউব্‌কার প্রতি বন্ধুদের দোমনা ভাবের জন্যেও মনে মনে বিষণ্ণ বোধ করে লিখোনিন। ওদের চির-অবারিত দ্বারে ভিড় করে আসে তারা সব 'পতঙ্গ বহ্নিমুখাৎ' যেন। লিউব্‌কার সঙ্গে তাদের কথাবার্তায়, তাদের গলার সুরে, তাদের হাবভাবে, বুঝি সে আন্তরিক সম্ভ্রমের ভাবটি ফুটে ওঠে না যা বন্ধুপত্নী, বন্ধুর প্রণয়িনী, কিংবা বন্ধুর ভগ্নীর প্রতি তরুণদের পক্ষে একান্ত সঙ্গত। লিউব্‌কার প্রতি তাদের মৌখিক ভদ্রতার আড়ালে লিখোনিন বুঝি তাদের অন্তরের আসল ভাব-খানা স্পষ্ট বুঝতে পারে: "এই তো নিয়ে আসা হয়েছে তোমায় এক কুস্থান থেকে, নিঃখরচায় সস্তা আমোদ লাভের জন্যে। এই তো সেদিনও তুমি দশে দশে, শতে শতে লোক বসিয়ে এসেছ শুধু অর্থের বিনিময়ে; যাই কর না কেন, তুমি সেই যে পণ্যনারী ছিলে আজও তাই-ই রয়েছ; তোমার পূর্বতন কর্মের কলঙ্ক-কালিমা ধুয়েপুঁছে যাবে না আর কিছুতেই; এক রাতের জন্যে তোমায় তু তু করে ডেকে নিয়ে যাওয়া, সে আর এমন বেশি কথা কী? একটি মুহূর্তও ইতস্তত না করে দিব্যি চলে আসবে তুমি পিছু পিছু—আসতে বাধ্য যে তুমি!"

বোধের অতীত কেমন যেন এক পরম বিরাগ নিয়ে বসে বসে ভাবে লিখোনিন—বন্ধুরা তাকেও কোথাকার কে-এক এই লিউব্‌কার সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলে নীরবে অপমান করে চলেছে। আর তারই জন্যে মনে মনে লিউব্‌কার প্রতি কেমন একটা গোপন বিদ্বেষের বিয়ে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে থাকে সে অন্তরে অন্তরে। কত অসম্ভব রকমের মুক্তির পথই না মনে মনে কল্পনা করে সে; কোনও কোনও কৌশল তার এমনই অসাধু প্রকৃতির যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই, নয়তো পরের

দিনই সে-সব কথা মনে করে অপরিসীম লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ে সে নিজেরই কাছে।

"নৈতিক আর মানসিক অবনতি সুরু হয়েছে আমার,"—আতঙ্কগ্রস্ত চিত্তে বসে বসে ভাবে লিখোনিন। দু'হপ্তার মধ্যেই ঝিমিয়ে আসে লিউব্‌কাকে নিয়ে লিখোনিনের যত সব কল্পনা। ধরা দেয় সে লিউব্‌কার আদরে সোহাগে—অত্যাচারের হাতে নীরবে করে যেন আত্মসমর্পণ।

এতদিনে লিউব্‌কা কিন্তু পেয়েছে স্বস্তি, পায়ের তলায় ফিরে পেয়েছে কঠিন মাটি; চোখের সুমুখে দিনকে দিন চেহারা ফিরে যায় তার—সন্ত কালও যে ছোট্ট ফুল-কলিটি ছিল শুকনো, বর্ষার জল পেয়ে রাতারাতি তাজা পাপড়ি মেলতে সুরু করে দেয় সে বুঝি আজ। কোমল মুখখানা থেকে মেচেতার দাগগুলো তার সব উঠে গেছে, দাঁড়কাক-ছানার মতো কালো চোখদু'টিতে সেই যে সদাসর্বদা কেমন একটা অবোধ ভীরু ত্রস্ত ভাব জেগে থাকত, সেখানে দেখা দিয়েছে এখন খুশীর ঝিকিমিকি। লিখোনিন কিন্তু বুঝতে পারে না অতশত, বন্ধুদের প্রশস্তি শুনে ভাবে—"মস্করা করছে ছোঁড়ারা।"

গিন্নী হিসেবে কিন্তু তেমন সুবিধের নয় লিউব্‌কা, রাঁধাবাড়ায় যুৎ করে উঠতে পারে না; ভালোবাসে শুধু ঘরদোর ধোয়ামোছার কাজ।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে লিখোনিন কিস্তিবন্দীতে কিনে দিলে ওকে মোজা বোনার একটা কল। দৈনিক নাকি তিন রুবল আয় হতে পারে সেটা দিয়ে। ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই তিন বন্ধুতে শিখে ফেলে কল চালানো, পারলে না শুধু লিউব্‌কা। অথচ নকল ফুল তৈরির কাজটা, বলতে গেলে, নিজেরই চেষ্টায় শিখে নিলে ও চট করে। তবে হপ্তায় এক রুবলের বেশি উপায় হয় না তাতে; তবুও তাই হলো ওর ভারী গর্বের বিষয়। প্রথম দিনের আধ-রুবল রোজগার দিয়ে লিখোনিনকে একটা সিগ্রেট-কেস কিনে দিলে লিউব্‌কা।

ক্রমে ওদের সংসারটা ছাত্রদের কাছে হয়ে ওঠে যেন এক পরম রম্য শান্তিতীর্থ। আর তার আসল কারণই হলো এই অবোধ অকর্মার ঢেঁকি মেয়েটার আন্তরিক স্বাচ্ছন্দ্য, তার সস্নেহ নীরব আতিথেয়তা, পরমা প্রীতি। পরে বিষণ্ণ কৃতজ্ঞ অন্তরে মনে মনে স্মরণ করত লিখোনিন—

সমোবারের চারদিক ঘিরে তাদের সেই জমজমাট সান্ধ্য আসরটি—তর্কের খৈ ফুটছে সবার মুখে, চোখে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন; আর তার মাঝখানটিতে লিউবৃকার বিরামবিহীন নম্র নীরব সেবা। বিচ্ছেদের পর লিউবৃকার 'পরে লিখোনিনের বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ অবশিষ্ট ছিল না। তা' এই তো ঘটে থাকে সচরাচর।

বড়োই দুরূহ হয়ে ওঠে লেখাপড়ার কাজটা। এই সব স্বয়ং-সিদ্ধ গুরুমশাইদের শিক্ষানীতি আর শিক্ষাপদ্ধতি চলে বিপরীত দিকে। লিউবৃকা বেচারী হিসেবপত্র করে একগণ্ডা দু'গণ্ডা, এক কুড়ি দেড় কুড়ি করে—তা' প্রায় পূরো একশো অবধি অক্লেশে চলতে পারে সে। তবুও সেদিক দিয়ে মাড়াবে না লিখোনিন, জোর-জবরদস্তি করে শেখাবেই তাকেই সংখ্যাপদ্ধতি। ফল হয় না কিছুই, আর চটেমটে চেঁচামেচি লাগিয়ে দেয় লিখোনিন, লিউবৃকা বেচারা ভিজে চোখের পাতা মেলে অবাক হয়ে ভয়ে ভয়ে চুপটি করে চেয়ে বসে থাকে শুধু। অথচ যোগ আর গুণের অঙ্ক চটপট শিখে ফেলে সে, বিয়োগ আর ভাগ নিয়েই বাধে যত গোল। এদিকে আবার মাথাঘোলানো যত সব মৌখিক ধাঁধার উত্তর নিমেষে বলে দেয় লিউবৃকা, কিন্তু ভূগোল পড়তে বসে বুঝবেও না, মানবেও না কিছুতে যে পৃথিবী গোলাকার; আর এত বড়ো এই মাটির পৃথিবীটা যে বোঁ বোঁ করে শূন্তে ঘুরে চলেছে সে কথা শুনে তো হাসির চোটে দম বন্ধ হয়ে মরবার জোগাড় আর কী! অথচ—তা বোধকরি ওর চাষীসুলভ সংস্কারের জন্তেই হবে—ঘরে বাইরে সর্বত্র ও নিখুঁৎভাবে দিগুনির্ণয় করতে পারে—লিখোনিন লাগেই না ওর কাছে। আলাদা আলাদা নক্সা এক-আধবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েই কিন্তু চমৎকার মনে রাখতে পারে ও। "কোন্‌টা ইতালী?"—জিজ্ঞেসা করে লিখোনিন। "এই যে, বুটজুতোর পাটিখানা,"—পট করে আপেনাইন উপদ্বীপের 'পরে আঙুল বুলিয়ে মহা উল্লাসে দেখিয়ে দেয় লিউবৃকা। "সুইডেন আর নরোয়ে?"—"এই যে, ছাত থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ছে একটা কুকুর।" "বল্টিক সাগর?"—"এক বিধবা হাঁটু গেড়ে বসে আছে।" "কৃষ্ণসাগর?"—"এই জুতোর পাটিটা।" "স্পেন?"—"এই টুপীপরা মুটকী মাগী।" এই রকম সব। ইতিহাস নিয়েও সুবিধে

হয় না। এ কথাটা একদম লিখোনিনের মাথায়ই আসে না যে, ওর সরল শিশুমন গল্পের কাঙাল ; তার বদলে নাম আর সন-তারিখের তালিকায় বিব্রত করে তোলে সে লিউব্‌কাকে। এদিকে একটুতেই আবার চটে যায় লিখোনিন ; আর এই যে একটি মেয়ে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তার প্রতি গোপন অথচ সতত বর্ধিষ্ণু বিরাগবশতঃ ক্রমশঃই সে অতি অল্পেই পড়াশোনার সময় ক্ষেপে উঠে সব ভেস্তে দিতে লাগল।

গুরুমশাই হিসেবে নীয়েরাৎ ঢের ভালো। ওর বীণা আর ম্যাণ্ডোলিন ঝোলানো পড়ে থাকে এদের খাবার ঘরে। ম্যাণ্ডোলিনের খনখনে আওয়াজের চেয়ে বীণাযন্ত্রের মিঠে নরম সুরই লিউব্‌কার প্রাণ টানে বেশি করে। তাই নীয়েরাৎ এলেই বীণখানি সযত্নে ঝেড়ে পুঁছে নীয়েরাতের হাতে তুলে দেয় লিউব্‌কা। নীয়েরাৎও সেটা নিয়ে বসে বসে খানিকক্ষণ ধরে সুর বাঁধে, তারপর গলা খ্যাঁকারি দিয়ে, পায়ের 'পরে পা তুলে দিয়ে, আয়েস করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, আর ভরাট গলায় চড়া সুরে গান জুড়ে দেয় :

চু-চচ্-চু চুমকুড়ি !
খুড়ি !
শিউরে ওঠে প্রাণ !
নিশুত রাত, নিথর বায়,
আকাশ কম্পমান !
যুগল প্রাণের মিঠে, রে ভাই,
সবার বাড়া ধন,
শান্তিবারির ছিটে, রে ভাই,
চুমো এ মোহন।
ওরে আমার প্রাণ !
এক লহমার মিলন লাগি
করে যে আনচান !

গাইতে গাইতে চোখ বুঁজে, হাত নেড়ে, মাথা দুলিয়ে, নানা রকমের ভাবভঙ্গি দেখায় নীয়েরাৎ, নিজের গানে নিজেরই ভাব লেগে যায় বুঝি

তারি ; হঠাৎ কখন আবার স্থির স্থাণুর মতো একেবারে পাথর হয়ে গিয়ে স্বপ্নালস মদির চোখে লিউব্‌কার চোখে চোখে চেয়ে বিঁধে দেয় তাকে। অসংখ্য গাথা, রসের ছড়া, সাবেক কালের হাসির গান, জানা আছে নীয়েরাতের। সেগুলোর মধ্যে কারাপটকে নিয়ে আর্মেনিয়ানদের মধ্যেকার সেই যে চলতি ছড়াটা—তাই হলো লিউব্‌কার সব চেয়ে পছন্দ :

কারাপটের ছিল সে এক তাক,
ছিল তাতে মিঠে সে এক চাক,
চাকে ছিল আঁকা সে এক পট—
তারি গোমর করত কারাপট।

এই রকমের অগুণতি ছড়া মুখস্থ নীয়েরাতের ; সবক'টাই তার আবার একই আখর দিয়ে শেষ হয় শেষে :

সাবাস, সাবাস, কাতেন্‌কা !
কাতেরিন পেত্রোব্‌না !
মাথায় চুমু দাও গো আমায়,
গালে দিয়ো না।

নীয়েরাৎ গায়, আর কারাপটের বিষয় নিয়ে মুখে-চোখে এমন একটা ভয়ানক আশ্চর্যের ভাব দেখায় যে হাসতে হাসতে বুকে-পিঠে খিল ধরে যায় লিউবকার, জলও এসে যায় চোখে। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রিন্সের সামনে যখন সঙ্কোচ কেটে এল তখন লিউব্‌কা তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গানও গাইতে লাগল—দু'জনের গলার মিলও হয় ভারী চমৎকার। ভারী মিহি আর সুরেলা এই লিউব্‌কার গলা, তাতে তার অতীত জীবনের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া আর পেশাদারী আতিশয্যের ছাপ নেই মোটেই। আর—ভগবানেরই আশীর্বাদ বলতে হবে—তার আছে গানের ধুয়ো ধরে চলবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। শেষটায় তাদের পরিচয়ের শেষদিকে এমনও দিন এল যখন লিউব্‌কার দিক থেকে আর প্রিন্সকে গাইবার জন্যে খোসামোদ করতে হয় না, প্রিন্সই করে এখন ওর খোসামোদ—পল্লীগাথা শোনবার লোভে। তা লিউব্‌কার নিজেরও

জানা আছে বিস্তর পল্লীগাথা। টেবিলের 'পরে কনুই রেখে, পল্লী-রমণীদের ঢঙে হাতের চেটোয় মাথা কাৎ করে উঁচিয়ে সযত্নে বীণার সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে বসে লিউবকা :

ক্যামে আমার রাত হবে গো ভোর,
ফেলে গেছে পরাণ-বঁধু মোর!
হায়, পোড়ামুয়ে বেরিয়ে গেল গান—
বলি, —অ কালামু' মোদোমাতাল!

'মোদোমাতাল' কথাটার 'পরে ঝোঁক দিয়ে দুঃখীর মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটাকে একদিকে কাৎ করে তাল ঠোকে প্রিন্স, আর লিউবকার সঙ্গে সঙ্গে শেষের কলিটা একত্রে গেয়ে চলে—বীণাযন্ত্রের কম্পমান বিলীয়মান ধ্বনির সঙ্গে তান রেখে এমন ভাবে এসে শেষ হয় গানখানা যে ধরতেই পারা যায় না ঠিক কোন্‌খানে এসে তা লীন হয়ে গেল নীরবতায়।

কিন্তু মুস্কিল হয় ওই জর্জিয়ান কবি রুস্তাবেল্লীর 'শার্দুলচর্ম' নিয়ে। কাব্যখানার সমস্ত মাধুর্য লুকিয়ে আছে তার ওই গ্রাম্য শব্দঝঙ্কারের মধ্যে; সুর করে পড়তে বসে প্রিন্স, আর লিউবকা হাসি চাপতে না পেরে শেষটায় হি হি করে লুটিয়ে পড়ে একেবারে; চটে গিয়ে ধপ করে বইখানা বন্ধ করে দেয় প্রিন্স, গালমন্দ শুরু করে; আবার শেষ অবধি মিটমাটও হয়ে যায় দু'জনে।

কখনও কখনও আবার নীয়েরাতের ঘাড়ে চাপে বোকাপাঁঠার মতো যত রাজ্যের দুষ্টুমির ভূত। ভাবখানা দেখায়, এই বুঝি ধরবে জড়িয়ে লিউবকাকে; বসে বসে চোখ মারে তাকে, আর নাটকীয় ভঙ্গিতে বিহ্বল অবশ স্বরে বলতে থাকে: "প্রেয়সী আমার! আমার গুলবাগিচার সেরা ফুল! সুধাভরা ঠোঁটদু'খানি তোর! শিক-কাবাবের খোসবু তোর শ্বাস-প্রশ্বাসে! আয়, তোর ওই অধরের সুরাপাত্র হতে মহানির্বাণ-সুধা পান করি। আয় রে আমার তিফ্‌লিশিয়ান ছাগসুন্দরি!"...রকমসকম দেখে হাসতে শুরু করে দেয় লিউবকা, শেষে

রাগ করে নীয়েরাতের হাতে থাবড়া মারতে মারতে শাসায়—লিখোনিনকে বলে দেবে সব।

—"ব্-বাঃ। লিখোনিন?"—হাতদু'খানা সটান মেলে দিয়ে বলে ওঠে প্রিন্স: "লিখোনিন আবার কে? আমার বন্ধু, সাঙাৎ। তাই বলে ও কি জানে লোফ্‌ফী কাকে বলে? তোমরা সব উত্তুরে লোক, কী বুঝবে তোমরা লোফ্‌ফীর? শুধু আমরা, জর্জিয়ানরাই জানি কী চীজ এ। দেখো তবে, লিউব্‌কা!" তারপর হাত মুঠ করে, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এমন দুর্দান্তের মতো চোখ পাকাতে পাকাতে, দাঁত কড়মড় করতে করতে সিংহের মতো গর্জাতে থাকে যে, তামাসা দেখছে জেনেও ছেলেমানুষের মতো ভয় পেয়ে ছুটে পালায় লিউব্‌কা পাশের ঘরে।

অবশ্য পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনার মতো যেখানে সেখানে প্রেম ক'রে বেড়ানোয় প্রিন্সের আপত্তি নেই বিশেষ, কিন্তু তবুও ও ওর জর্জিয়েন মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নৈতিক দৃঢ়তা। বন্ধুপত্নীর শুচিতা ওর কাছে হলো অলঙ্ঘনীয় বস্তু। তা' ছাড়া এ-ও বোধকরি বুঝত ও—আর এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সব প্রাচ্যদেশের লোকেদের মধ্যে রয়েছে এক রকমের সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতি—যার বলে ও অনায়াসেই বুঝে নিয়েছিল যে, যদি একটি মুহূর্তের জন্যেও ও লিউব্‌কাকে প্রণয়িনীর চোখে দেখে তবে এই-মনোরম, শান্ত গৃহস্থালীর চমৎকার সান্ধ্য-জীবনটি, যাতে এতখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ও আজ, চিরকালের মতো হারাতে হবে ওকে। সম্পূর্ণ নারাজ ও এ অপরূপ বস্তুটি হারাতে; কারণ প্রায় সারা য়ুনিভার্সিটিময়ই যদিও সবাইকে তুইতোকারি করে বেড়ায় ও তবুও এই দূর প্রবাসে অপরিচিত প্রতিবেশের মধ্যে বড়োই নিঃসঙ্গ বোধ করে প্রিন্স।

সোলোবিয়েবই কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনন্দলাভ করে থাকে এই পড়াশোনার ব্যাপারে। এই বিশালবপু, বলবান, উদাসীন মানুষটি কেমন করে যেন অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে নারীত্বের গুপ্ত, অনধিগম্য, অপরূপ, মায়ামমতার জালের মধ্যে এসে জড়িয়ে পড়ে। শেষে ছাত্রীটিই কর্তৃত্ব ফলাতে সুরু করে আর গুরুমশাই অবনত শিরে

তা মেনে চলতে থাকেন। অন্যান্য অনেক ছেলেমেয়ের মতো লিউব্‌কাও পড়বার আগেই লিখতে শিখে ফেলেছে। করেও ও কত রকমের ছেলেমানুষী। তাতে কোনোই বাধা দেয় না সোলোবিয়েব। এই দেড় মাসের মধ্যেই ওর বিরাট, প্রশস্ত, বলবান হৃদয়খানা বাঁধা পড়ে যায় এই হঠাৎ-পাওয়া অবলা ভঙ্গুর প্রাণীটির কাছে—এ যেন হলো বিশালকায় এক হস্তীর একটি ক্ষীণজীবী, অসহায়, মুরগীর ছানার 'পরে সতত সশঙ্ক, উদার, অবোধ মমতা।

বই পড়া হলো মস্ত বড়ো একটা আমোদ দু'জনার কাছেই, আর তাতেও লিউব্‌কারই পছন্দমতো বই বাছাই করা হয়ে থাকে। 'ডন কুইক্‌জোট'খানা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না লিউব্‌কা, কিন্তু মহা উল্লাসে 'রবিনসন ক্রুসো'খানা আগাগোড়া শুনে নিলে বসে বসে, আর বহুকাল পরে ক্রুসোর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটায় কেঁদে ভাসিয়ে দিলে একেবারে। ডিকেন্সের গল্পও বেশ ভালো লাগে ওর, তাঁর হাসিমস্করার রসও গ্রহণ করতে পারে ও অনায়াসে। শেকোবের গল্পও পড়ে ওরা; আপনা থেকেই লিউব্‌বা তাঁর পরিকল্পনার সৌন্দর্য, তাঁর হাসি আর অশ্রুর অন্তর্নিহিত মাধুর্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্পে ভারী মুগ্ধ হয়ে ওঠে লিউব্‌কা—দেখে তখন হাসিও পায়, মায়াও হয়। সোলোবিয়েব একবার ওকে পড়ে শোনায় শেকোবের একটা গল্প; তাতে একটি ছাত্র জীবনে প্রথমে যায় গণিকালয়ে, আর পরদিন তার জন্যে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে বেচারা। সোলোবিয়েব ভাবতেই পারে নি, গল্পটা লিউব্‌কার মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করবে—সারাক্ষণ হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে, হাত রগড়াতে রগড়াতে, কেবলই বলতে থাকে লিউব্‌কা: "হা ভগবান! কোত্থেকে এত শত জানতে পারলেন উনি, এমন খুঁটে খুঁটে বলেছেন সব কথা। এ যে ছত্রে ছত্রে ঠিক আমাদেরই কথা লেখা গো সব!"

একবার আব্বে প্রোভোস্ত-এর লেখা, 'মানোঁ লেকুৎ আর গ্রাউ'র শেভালিয়ের-এর ইতিহাস' নামে একখানা প্রাচীন প্রেমকাহিনী লিউব্‌কাকে পড়ে শোনায় সোলোবিয়েব। সোলোবিয়েব নিজেও এই প্রথম পড়ছিল বইখানা, আর গল্পটায় প্লটের অভাব, সাদাসিধে ভাবে

গল্প বলার ধরণ, পুরাতন রচনাশৈলী, সব মিলে মোটেই ভালো লাগছিঃ না তার। লিউব্‌কা কিন্তু এই বিসদৃশ অমর উপন্যাসখানার রহস্যমধুর করুণ, মর্মস্পর্শী, চটুল ঘটনা-সমাবেশ শুধু কান দিয়েই নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে লাগল।

"সেন্ট ডেনিসে আসিয়া আমাদের বিবাহের কথা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গেল,"—পড়ে চলেছে সোলোবিয়েব: "ধর্মনীতির বন্ধন খসিয়া পড়িল; এভাবে অজ্ঞাতসারে আমাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয় গেল।"

—"কী করলে ওরা?"—অস্বস্তিস্বরে হাতের কাজ ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে লিউব্‌কা: "পুরুতটুরুত সবাইকে বাদ দিয়ে? এম্নি এম্নিই?"

—"তাই তো!"—উত্তর দিলে সোলোবিয়েব: "হয়েছে কী তাতে? অবাধ প্রেম, এই আর কী! এই যেমন তোমার আর লিখোনিনের মধ্যে।"

—"আ, আমার কপাল! এ হলো গে আলাদা কথা। জানোই তো কোত্থেকে ও কুড়িয়ে এনেছে আমায়। কিন্তু এ তো হচ্ছে নিখুঁৎ মেয়ে গো। ছেলেটার পক্ষে অমন কাজ করা নষ্টামির একশেষ, বাপু! দেখেই নিয়ো, ছুঁড়ীটাকে ভাসিয়ে দেবে শেষে। আহা, হতভাগী!"

কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা শুনতে শুনতেই লিউব্‌কার সমস্ত মনপ্রাণ ঘুরে যায় বঞ্চিত নায়কটির প্রতি।

"যাহা হউক, মঁসিয়ে দ্য ব—এর এই তস্করের ন্যায় আগমন ও পলায়ন আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।…'না, না মানোঁ কি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে? ইহাও কি সম্ভব!' বলিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম: 'সে তো জানে, তাহাকে আমি কত ভালবাসি'।"

—"আহা, বেচারা! বেচারা!"—সহানুভূতিতে ভরে ওঠে লিউব্‌কা: "কেন, বুঝতে পারছ না তোমার মানোঁ ওই বড়লোকটার বাঁধা হয়ে আছে। উঃ মুখপুড়ী!"

গল্পটা যতই এগিয়ে চলতে থাকে লিউব্‌কার আগ্রহও ততই বেড়ে চলে।

—"সোলোবিয়েব, লক্ষীটি, কে এই লেখক ?"

—"একজন ফরাসী পুরোহিত।"

—"রাশিয়ান নয় তবে ?"

—"না, ফরাসী, বল্লুমই তো।"

—"পুরুত বল্লে না ? এত কথা জানতে পারলেন কী করে তবে ?"

—"এম্নিতেই জেনেছিলেন! মানে, প্রথমে ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। জীবনে অনেক কিছুই দেখেছিলেন তিনি। পরে আবার সন্ন্যাস ত্যাগ করে চলে আসেন।"

গ্রন্থকারের জীবনী পড়ে শোনায় সোলোবিয়েব। মনোযোগ দিয়ে আগাগোড়া শোনে লিউব্‌কা; মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে; যেখানটা বুঝতে পারে না, ফিরে জিজ্ঞেস করে নেয়; তারপর শেষ হয়ে গেলে গম্ভীর ভাবে বলে ওঠে: "ও, এই তবে উনি! ভারী চৎকার লিখেছেন কিন্তু। তবে মেয়েটা এত নীচ কেন ? কত ভালোবাসতেন উনি তাকে, সারা মন-প্রাণ দিয়ে; আর তাকেই কি না ঠকিয়ে এয়েছে আজীবন ?"

—"তা, আর কী করবে, লিউবোচ্‌কা ? মেয়েটাও ওঁকে ভালোবাসত বৈ কি! তবে ছিল বড্ড দেমাকী, নাচুনির একশেষ, আর ছন্নমতি। চাইত শুধু সাজগোজ, গয়নাগাঁটি, এই সব আর কী।"

জ্বলে ওঠে লিউব্‌কা: "আমি হলে মুখ থেঁৎলে দিতাম হতচ্ছাড়ীর! এর নাম ওর ভালোবাসা! কাউকে যদি ভালোবাসিস তবে সে তোকে ইচ্ছে করে যা দেবে তাই মাথায় করে রাখবি তুই। সে যদি জেলে যায়, তুইও যাবি তার সঙ্গে সঙ্গে। সে যদি হয় চোর তুই হবি চোরণী; সে যদি হয় ভিখিরী, তুই হবি ভিখিরিণী। ভালোবাসাই যদি থাকে তবে এক টুকরো বাসি রুটীতেই পেট ভরবে তোর। ও মাগী ছিল হতচ্ছাড়ী, একলসেঁড়ে। আমি হলে মুখ দেখতুম না শয়তানীর।"

উপন্যাসখানা শেষ করতে অনেক দিন লাগে লিউব্‌কার; শুনতে বসলেই হু হু করে কেঁদে ফেলে বেচারা, আর তখনই পড়া বন্ধ করে দিতে হয়।

কান্নাকক্ষে প্রণয়ীযুগলের দুর্দশার কাহিনী, মানোঁর আমেরিকায় নির্বাসন আর দ্য গ্রীউ'র স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ, এ সব ঘটনা এমন ভাবে

লিউবৃকার কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে যে বেচারা শেষটায় মন্তব্য প্রকাশ করতেও ভুলে যায়। মরু-প্রান্তরে মানোঁর শান্ত সুন্দর মরণের কথা শুনতে শুনতে, বুকে হাত রেখে পাথর হয়ে চেয়ে বসে রয় শুধু প্রদীপের দিকে। তারপর যখন পর পর দুই দিন ধরে দ্য গ্রীউ হতভম্ব হয়ে ঠায় বসে রইল তার প্রেয়সীর প্রাণহীন দেহের পাশে, শেষে যখন তার তরোয়ালের ডগা দিয়ে মানোঁর জন্যে কবর খুঁড়তে বসল, সে সব কথা শুনে এমন করে ডুকরে কেঁদে ওঠে লিউবৃকা যে সোলোবিয়েব তো দস্তুরমতো ভয় পেয়ে ছুটে যায় জল আনতে। কান্না থামার পরও অনেকক্ষণ অবধি বসে বসে ফোঁপাতে থাকে বেচারা, আর তারই মধ্যে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে টানতে বলে চলে, "আহা! কী দুঃখী ওরা! কী অদেষ্ট ওদের! সোলোবিয়েব, লক্ষ্মীটি, এই কি সংসারের নিয়ম? যে-ই একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মধ্যে হলো ভালোবাসা অম্নিই কি ভগবান তাদের এম্নি করে দিলেন শাস্তি? কেন এমনটি হয়, লক্ষ্মীটি? কেনো হয় গো?"

—সাতেরো—

কিন্তু সিমানোব্স্কীর মুরুব্বিয়ানা আর নীরস শিক্ষাপদ্ধতি অসহ্য অত্যাচারের সামিল হয়ে ওঠে লিউবৃকার কাছে। এরই জোরে কিন্তু সে নিজের এতখানি পসার জমিয়ে ফেলেছিল ছাত্রদের মধ্যে, এরই জোরে নবাগতদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করত সে, ছাত্রদের সকল রকমের কাজের ছিল সে একজন পাণ্ডা, তাদের অর্থভাণ্ডারের একজন প্রধান পুরোহিত।

লিউবৃকার হৃদয়-মন যেন ওর নখদর্পণে। স্থির করলে, প্রথমেই সুরু করবে রসায়ন আর পদার্থতত্ত্ব দিয়ে। "ওর কাঁচা মেয়েলী মন থ মেরে যাবে তা' হ'লে,"—মনে মনে গবেষণা করলে সে: "তখন আমারই প্রতি অর্পণ করবে সমস্ত মনোযোগ; তারপর সমস্ত কুসংস্কার,

সব বাধাবন্ধ পার করে নিয়ে যাব ওকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রহস্যজাল উদ্‌ঘাটন করবার দিকে।"

শিক্ষাপদ্ধতিতে তার কোনও সামঞ্জস্য ছিল না,—হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে খালি লিউব্‌কাকে চমক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করত। একবার ও নিয়ে এল বারুদভর্তি একটা নকল সাপ। তাতে আগুন লাগিয়ে দিতেই সাপটা পট পট করতে করতে ঘরময় কিলবিল করে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। মোটেই অবাক হলো না লিউবকা, বল্লে—"এ তো আতশবাজী!" তারপর একদিন মস্ত বড়ো একটা বোতল, খানিকটা রাঙতা, আর একটু রজন আর একটা বেড়ালের লেজ দিয়ে তৈরি করলে সিমানোবৃস্কী একটা 'লীডেন জার'; যৎসামান্য হলেও, বিদ্যুৎস্ফুরণ হতে লাগল তা থেকে। শক্‌ খেয়ে চটে গেল লিউব্‌কা: "এ সব কী শয়তানী!"

তারপর একদিন অক্সিজেন তৈরি করে দেখালে সিমানোবৃস্কী। খুশী হয়ে হাততালি দিতে লাগল লিউব্‌কা: "আর একটু, প্রোফেসর মশাই, তারও একটুখানি!" তারপর অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে লিউব্‌কাকে বল্লে বোতলটার মুখ মোমবাতির আগুনে ধরতে। দুম্‌ করে প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল ঘরখানা, ছাত থেকে খানিকটা চুণবালি পড়ল খসে। ভয়ে আধমরা হয়ে গেল লিউব্‌কা, কিন্তু সামলে উঠেই গম্ভীর-ভাবে বল্লে: "ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার নিজের ফ্ল্যাট এখানা। আমিও বেশ্যামাগী নই, মানমর্যাদা আছে। আমার বাড়ীতে এ রকম নষ্টামি করতে দেব না আমি।"

ফলিত বিজ্ঞানে সুবিধা করে উঠতে পারলে না সিমানোবৃস্কী—পড়ল এবার দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। একদিন খুব ভারিক্কী চালে, যার পর আর কথাই উঠতে পারে না এমন ভাবখানা দেখিয়ে, বল্লে সে—ভগবান বলে কিছু নেই, এক্ষুণি প্রমাণ করে দেবে সে। দপ্‌ করে জ্বলে উঠল লিউব্‌কা, সোজা দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বল্লে—এই কিছুদিন আগেও সে যদিও ছিল এক বেশ্যা তবুও এমন অধর্মের কথা মুখ বুঁজে সইবে না সে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলে দেবে সব বাসিল বাসিলিচকে। "তা ছাড়া এও বলে দেব,"—কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগল সে: "যে আমায়

লেখাপড়া শেখাবার বদলে আপান খালি যা তা নিয়ে বক বক করেন বসে বসে, আর সারাক্ষণ আমার হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে থাকেন। ভদ্র ব্যাভার নয় এসব।" বলেই সাঁ করে সরে এল লিউব্‌কা গুরুমশাইয়ের পাশ থেকে—সেদিনের সেই মূক ভীরু লিউব্‌কা!

তবুও হাল ছাড়ে না সিমানোবস্কী—লিউব্‌কার চিত্তবৃত্তি আর কল্পনাশক্তি উস্কে চলবার চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র এমিবা থেকে আরম্ভ করে নাপোলেয়ঁ অবধি জীবনের ক্রমবিকাশ-ধারা ব্যাখ্যা করে বোঝায় তাকে। মন দিয়ে শোনে সব লিউব্‌কা, কিন্তু সারাক্ষণ চোখদু'টিতে তার করুণ মিনতি ফুটে রয়: "থামুন গো দয়া করে!" মার্কস্‌-এর ব্যাখ্যায়ও সুবিধে হয় না কিছুই—অনর্থক বাগাড়ম্বর বলে মনে হয় সব লিউব্‌কার কাছে।

তাই বলে সিমানোব্‌স্কী যে মেয়েছেলে পটাতে পারে না তা নয়। তার মুরুব্বিয়ানার ভাব, ভারিক্কী কথাবার্তা, সরল বিশ্বাসপ্রবণ মনের 'পরে ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দীর্ঘদিনের বন্ধনের মধ্যেও অনায়াসে নাক গলাতে পারে সে। তাই লিউব্‌কার শান্ত সুদৃঢ় প্রত্যাখ্যান তাকে ক্রমেই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করে তুলতে থাকে। বিশেষ করে যা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে সে হচ্ছে এই মেয়েটির—দু'দিন আগেও যে ছিল সর্বভোগ্যা, মাত্র দু'টি রুবলের বিনিময়ে একই রাত্রে পর পর বহু লোককে করে এয়েছে যে প্রেম বিতরণ, তারই আজ যৌন লালসার প্রতি হঠাৎ যেন এই লোকদেখানো নিরাসক্তি। "তাই আর কী!" —মনে মনে ভাবে সিমানোব্‌স্কী: "এ হতেই পারে না কিছুতেই। ভড়ং করছে আমার সামনে, বোধহয় আমিও ঠিক জায়গাটিতে ঘা দিতে পারছি নে ওর।"

আর দিনকে দিন ক্রমেই আরও খুঁৎখুতে আর কড়া হয়ে উঠতে থাকে সিমানোব্‌স্কী। লিউব্‌কা একবার নালিশও করলে লিখোনিনের কাছে: "বড্ড কড়াক্কড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন উনি, বাসিল বাসিলিচ। কী যে সব বলেন একটি বর্ণও বুঝতে পারিনে তার; ওঁর কাছে পড়ব না আর।"

কোনো রকমে শান্ত করে তাকে লিখোনিন; কিন্তু সিমানোব্‌স্কীর সঙ্গে কথাও হয় তার; অত্যন্ত শান্ত সংযত ভাবে জবাব দেয়

সিমানেব্স্কী : "বেশ তো হে ভায়া, আমার শিক্ষাপ্রণালী যদি তোমার কি লিউব্‌কার অপছন্দ হয় তবে না হয় বাদই দাও আমায়। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর শিক্ষার মধ্যে সত্যিকারের নিয়মনিষ্ঠা আনা। কোনও বিষয় ও বুঝতে না পারলে আমি জোর করে বসিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিই, চেঁচিয়ে পড়তে বলি। পরে অবশ্য এর দরকার থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এ ছাড়া আর পথ নেই। একবার মনে করে দেখো; লিখোনিন, অঙ্ক থেকে বীজগণিতে প্রবেশ করতে কী বেগই না পেতে হয়েছিল আমাদের। আর আমাদেরই বা কেন তবে ব্যাকরণ পড়ালে ওরা, সোজাসুজি গল্প আর পদ্য লিখতে বল্লেই তো হতো!"

আর ঠিক তার পরের দিনই, দেয়ালে টাঙানো বাতিটার ছায়ার নীচে, লিউব্‌কার শরীরের 'পরে ঝুঁকে পড়ে, তার বুক আর বগলের কাছে মুখ এনে দেহসৌরভের ঘ্রাণ নিতে নিতে বলে চলে সে : "আঁকো একটা ত্রিকোণ···এই তো, হ্যাঁ, এমনি করে, এম্নি ভাবে। ওপরে লেখো 'প্রেম।' শুধু প লিখলেই চলবে, তলায় লেখো ন আর নী'। মানে হলো 'নরনারীর প্রেম'।"

তারপর সিদ্ধপুরুষের মতো অবিচল কঠোর ভাবখানা ধারণ করে যত সব কদর্য কথা উদ্গার করে চলতে থাকে সিমানোব্স্কী; শেষে হঠাৎ বলে ওঠে: "দেখো, লিউবা! কাম-লালসা হলো ঠিক এই পানাহার আর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছার মতো।" সঙ্গে সঙ্গে লিউব্‌কার উরুতে জোর একটা টিপুনি দিয়ে বসে সে; থতমত খেয়ে, পাছে ও চটে যায় সেই ভয়ে, আস্তে আস্তে পা সরিয়ে নেয় লিউব্‌কা।

—"ধরো, দৈবাৎ একদিন বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার সময় হলো না তোমার, কোনও খাবারের দোকানে গিয়ে খুন্নিবৃত্তি করে এলে তুমি; তাতে কি দোষ ধরবেন তোমার মা-বোন, কি তোমার স্বামী? প্রেমের ব্যাপারেও ঠিক তাই। একটা দৈহিক আনন্দ উপভোগ মাত্র। হয়তো অন্যান্য দৈহিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তীব্রতর, এ আনন্দ, তা ছাড়া আর কিছু নয়। এই যেমন ধরো এখন : তোমায় পেতে চাই আমি নারী রূপে! আর তুমিও·········"

—"আঃ, থামুন মশাই,"—বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিতে যায় লিউব্‌কা: "সারাক্ষণ ধরে সেই একই কথা নিয়ে এত মাতামাতি করে চলেছেন কিসের জন্যে? অন্য কথা পাড়ুন এখন। কতবারই তো বলা হয়েছে আপনাকে: না, না, না। ভাবছেন, আপনি কী চান তা বুঝিনে আমি? কিন্তু কিছুতেই আমি বিশ্বাস ভাঙতে পারব না; বাসিল বাসিলিচ আমার অশেষ উপকার করেছে, তাকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, পুজো করি…আর আপনি? আপনার বুকনিতে গায়ে জ্বালা ধরে যায় আমার।"

আর একবার সিমানোব্‌স্কী এক কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে লিউব্‌কাকে লজ্জায় অপমানে ক্ষেপিয়ে তুলে একেবারে। লিখোনিন যে একটি এই রকমের মেয়েকে কুড়িয়ে এনে তার চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছে—এ কথা য়ুনিভার্সিটির ছাত্রীদেরও কানে গিয়ে উঠেছিল। সিমানোব্‌স্কী একদিন তাদের কয়েকজনকে নিয়ে এল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল লিউব্‌কা পরিচয়ের বেলায়: ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে তাদের চারজনকে; সবাইকে চা আর জ্যাম খাইয়ে পরিতুষ্ট করলে, এমন কি ছাত্রী চারজনের মুখের সিগ্রেটে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিতেও ভুল হলো না তার; কিন্তু তাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বসল না তাদের সামনে। একটি মেয়ের হাত থেকে রুমালখানা খসে মাটিতে পড়তেই ছুটে তা তুলে দিতে এগিয়ে গেল সে। আর ছাত্রীরা বেশ করুণার চোখে দেখতে লাগল তাকে।

একটি ছাত্রী অনবরত তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিল—পরম অবহেলা তার চোখে। "কৈ, আমি তো কখনো ওর পাকা ধানে মই দিইনি,"—অস্বস্তিভরে মনে মনে ভাবলে লিউব্‌কা। আর একজন নির্বোধের মতো এসে জিজ্ঞেস করলে ওকে: "আচ্ছা, বলো দেখি, বাছা, কে সে পাপিষ্ঠ যে, এই…প্রথম তোমায়…এই, তা বুঝতেই তো পারছ?…"

চট করে লিউব্‌কার চোখের সুমুখ দিয়ে তার পূর্বতন সাথী জেন্‌কা আর তামারার ছবি ভেসে গেল; কেমন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে জানে ওরা, কী সাহস আর কত বুদ্ধি ওদের! এদের চেয়ে ঢের ঢের বুদ্ধিমতী

ওরা! হঠাৎ কিছু না ভেবে চিন্তে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল লিউব্‌কা: "তা, অনেকেই ছিল, একসঙ্গেই। মনেও নেই সব। কোল্‌কা, মিৎকা, বোলোদ্‌কা, সেরেজ্‌কা, জোর্জিক, ত্রোস্কা, পেৎকা, তা ছাড়া ওই কুজ্‌কা আর গুস্‌কা, একদল শুদ্ধু। কিন্তু এ-কথা জানতে এত আগ্রহ কেন আপনাদের?"

—"কেন…না…মানে, তোমার 'পরে দরদ বশেই জিজ্ঞেস করছি!"

—"তা আপনার কোনও প্রণয়ী আছে?"

—"মাপ করো, কী বলছ বুঝতে পারছিনে।…কৈ, যাবে না সব?"

—"তার মানে? কী বুঝতে পারছেন না? কখনো কোনো ব্যাটাছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছেন কি?"

—"কমরেড সিমানোব্‌স্কী!"—তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল কুঁচুলে মেয়েটি: "আগে বুঝতে পারিনি যে এমন একজনের কাছে নিয়ে আসবেন আপনি আমাদের। ধন্যবাদ! চমৎকার হয়েছে!"

লিউব্‌কা ছিল সেই প্রকৃতির মেয়ে যারা মুখটি বুঁজে সয়ে থাকে ঢের, কিন্তু তারপর মুহূর্তেই লজ্জাভয়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিতে পারে, সদাসর্বদা এমন ভীতভীতে স্বভাবের সেই লিউব্‌কাকে চেনাই যায় না তখন আর।

—"কিন্তু আমি জানি!"—ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে লিউব্‌কা: "আমি জানি, আমিও যা আপনারাও তাই! তবে আপনাদের বাপ আছে, মা আছে, আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে, আর যদি দরকার হয় আপনারা পেট খসাতেও পারেন—অনেকেই তা করে থাকেন। কিন্তু আপনারা যদি পড়তেন আমার জায়গায়, পেট ভরবার উপায় যদি না থাকত, আর ছোট একটা ছুঁড়ী তখনো সংসারের কিছুই বোঝে না সে, লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানে না, আর চারধারে তার পুরুষ মানুষের ভিড়—হ্যাংলা মদ্দা-কুকুরের পাল সব—তা হলে আপনাদেরও শেষে গিয়ে উঠতে হতো এই রকম কোনো একটা খেলা-ঘরে! আমার মতো এক হতভাগীর সুমুখে এসে এ রকম চাল দেখানো লজ্জার কথা—হ্যাঁ, তাই!"

সিমানোব্‌স্কী পড়ল মহাবিপদে। কোনো রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে

তাদের নিয়ে তো তখনকার মতো বিদায় হয়ে গেল সে। তবুও লীলাখেলার তার শেষ হয়নি তখনও।

ইতিমধ্যে অনেকদিন থেকেই লিউব্‌কা নালিশ করে আসছে লিখোনিনের কাছে যে, সিমানোব্‌স্কীকে তার ভারী অসহ্য লাগে; লিখোনিন এসব মেয়েলী খুঁটিনাটির কথায় কানও দেয় না; সিমানোবস্কীর অন্তঃসারশূন্য, মিথ্যে কথার চাতুরী তাকে বেশ করেই পেয়ে বসেছিল। এদিকে আবার, লিউবকার সঙ্গে সহবাসের বোঝা তার কাছে অনেকদিন থেকেই হয়ে উঠছিল ভারী পাপের পসরার মতো। প্রায়ই মনে মনে ভাবত সে: মেয়েটা আমার জীবনটাই মাটি করে দিচ্ছে; অপদার্থ বনে যাচ্ছি আমি দিনকে দিন: শুধু মান অভিমান হাসিকান্নাতেই ডুবে আছি। এর পরিণতি হলো লিউবকাকে বিয়ে করা, আর তারপর যা হোক একটা চাকরীবাকরী জুটিয়ে নিয়ে কোন্ এঁদো মফস্বলে গিয়ে পড়ে পড়ে পচা। কোথায় গেল আমার জীবনস্বপ্ন, আমার উচ্চাশা, মানবের কল্যাণে আত্মবিনিয়োগ?" সময় সময় বেশ বিড় বিড় করেই বকে বসে বসে ও এই সব কথা, চুলও ছেঁড়ে বসে বসে। আর তাই লিউব্‌কার নালিশের কথায় মন না দিয়েই হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে সে, চেঁচায়, পা ঠোকে মেজেয়, আর বেচারী লিউবকা তখন চুপটি করে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে এসে কেঁদে কেঁদে মনের জ্বালা জুড়োয় একা একা।

আজকাল এই রকম ঝগড়াঝাঁটির পর আবার যখন মিল হয় তখন প্রায়ই লিউব্‌কাকে বলে লিখোনিন: "দেখো, লিউবা লক্ষ্মীটি, আমরা দু'জনে ঠিক খাপ খাচ্ছিনে। শোনো: এই একশো রুবল দিচ্ছি তোমায়, সিধে বাড়ী চলে যাও। তোমার আত্মীয়স্বজনরা তোমায় ঠাঁই দেবে'খন। সেখানে থাকো গে এখন মাস ছয়েক; তারপর আমি গিয়ে দেখা করব'খন। সেখানে গেলে বিশ্রামও লাভ করতে পারবে তুমি, আর শহরের এই যে পাঁক জড়িয়ে গেছে তোমার দেহে মনে, তা-ও নিঃশেষে ধুয়ে পুঁছে যাবে ততদিনে। তখন তুমি কারো সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে—একাই পারবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।"

কিন্তু যে-মেয়ে জীবনে ভালোবেসেছে এই প্রথম আর মনে মনে

ঠিক দিয়েছে এই তার একমাত্র ভালোবাসা, এই শেষ, তাকে কি আর কিছুতে বোঝানো যায়? সে কি বিচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা মানতে পারে? যুক্তিতর্কের ধার ধারে কিছু?

সিমানোবস্কীর প্রতি একটা শ্রদ্ধাবনত ভাব সত্ত্বেও কেমন করে শেষে আন্দাজ করে ফেল্লে লিখোনিন—লিউবকার সঙ্গে তার সম্পর্কটা আসলে কী; আর নিজে ছাড়া পাবার আগ্রহে, অথচ বোঝাটা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলবার অক্ষমতার দরুণ, সময় সময় কুশ্রী একটা চিন্তাকে মনে মনে আঁকড়ে ধরতে চায় সে: "সিমানোবস্কী তো ওকে পেলে খুশীই হয়। আর ওর পক্ষে সিমানোবস্কীই হোক, আমিই হই, কি আর কেউই হোক, সবই তো সমান। আচ্ছা, সব কথা সিমানোবস্কীকে বেশ করে বুঝিয়ে বলে ওকে ভিড়িয়ে দিই না কেন বন্ধুর সঙ্গে? কিন্তু তা যেন হলো, কিন্তু বেহদ্দ মেয়েটা যে যাবে না কিছুতেই, বরং একটা কাণ্ডকারখানা না বাধিয়ে বসে শেষটায়! আরও একটা উপায় আছে। ওরা দু'জন যখন একত্র থাকবে এমন সময় হঠাৎ একদিন এসে পড়ে হৈ চৈ করে উঠলে কেমন হয়···খুব খানিকটে উদারতা দেখিয়ে···গোটা কয়েক টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, তারপর···সটান প'য় আকার?"

প্রায়ই আজকাল বাড়ী ফেরে না লিখোনিন—একাদিক্রমে দিন-কয়েক বাইরে বাইরেই কাটায়। তারপর ফিরে এলেই হয় নানা রকমের মেয়েলী প্রশ্ন, কান্নাকাটি, কত কী! তারপর ফের ক্ষমাভিক্ষা, আদর সোহাগ; শেষে নতুন করে ব্রহ্মচর্যের সঙ্কল্প গ্রহণ করে লিখোনিন, নতুন করে পাপে ডোবে ফের। আর প্রত্যেকবার পতনের পরই তিক্তকণ্ঠে বলে সে: "শপথ কেটে বলছি তোকে—পাশবিকতার আমার এখানেই ইতি।"

লিখোনিন যখন বাইরে যায়, লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করে লিউবকা; যে-দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সে, তার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ওর প্রতীক্ষায়। লিখোনিনের চিঠিপত্র খুলে দেখে, পড়তে পারে না, শুধু লুকিয়ে রেখে দেয় রান্নাঘরের টুকিটাকি জিনিস-পত্রের মধ্যে। এখন এমন অবস্থায় এসে পৌচেছে বেচারা যে রাগা-রাগির সময় সালফিউরিক এসিডের ভয়ও দেখায় সে লিখোনিনকে।

—"গোল্লায় যাক ও,"—মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে ভাবে লিখোনিন : "শুধু একবার কাছাকাছি হ'লেই হয় দু'জন। তাই নিয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসব যে দু'জনই ভয় খেয়ে যাবে একদম।"

তারপর কী কী বলবে, মনে মনেই তালিম দেয় সে বসে বসে : "ও: এই !···বুকে করে রেখেছিলাম তোমায়, তার এই প্রতিদান ?···আর তুমি, আমার প্রাণের দোসর, আমার একটিমাত্র সুখ তা-ও সইল না তোমার !···আহা, না, না ; থাকো, থাকো, এ ভাবেই থাকো দু'জন ; কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হই আমি। দেখছি, আমিই তোমাদের সুখের কাঁটা ! তোমাদের ভালোবাসায় বিঘ্ন ঘটাতে চাইনে আর !"

আর অবিকল এই স্বপ্নই কি না সফল হলো শেষটায় !

সেদিন ছিল সোলোবিয়েবের পড়াবার দিন। ভারী খুশী হয়ে উঠেছে সোলোবিয়েব—কোথাও না ঠেকে লিউবকা পড়া দিতে পেরেছে সেদিন : "মিখীর একটি সুন্দর লাঙ্গল আছে, সিসোইরও একটি সুন্দর লাঙ্গল আছে···একটি পাখী···একটি দোলনা···শিশুরা ঈশ্বরকে ভালবাসে।"···আর এর পুরস্কারস্বরূপ সোলোবিয়েব পড়ে শোনালে তাকে 'বণিক কালাশ্নিকোব ও কিরিবেইয়েবিচ' আর 'সম্রাট ৪র্থ ইবানের দেহরক্ষী' নামে দুটো গল্প। খুশীতে হাততালি দিয়ে আর্মচেয়ারটার মধ্যে গা দুলিয়ে ওঠে লিউব্কা ছোট্ট মেয়েটির মতন। কিন্তু সোলোবিয়েবের সেদিন ছিল কী-একটা কাজের তাড়া। তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে লিউব্কা দেখে—দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সিমানোবস্কী। মুহূর্তেই মুখ শুকিয়ে গেল ওর। আজকাল কিছুতেই ও যেন সইতে পারে না তাকে আর।

সিমানোবস্কী এসেই বক্তৃতা সুরু করে দিলে—মানুষ স্বয়ংসিদ্ধ, স্বাধীন, মুক্ত ; তার কাছে নেই কোনো বিধিনিষেধ, নেই পাপপুণ্য,—ন্যায়-অন্যায়, নীচতা, কিছুই নেই। "ইচ্ছে করলে সে স্বয়ং ভগবান হয়ে উঠতে পারে, ইচ্ছে করলে নরকের কীটও হতে পারে—সবই সমান তার কাছে।"

আজ ঠিক করে এসেছিল সিমানোব্স্কী যে এর পর কামশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে বসবে, কিন্তু অধৈর্য হয়ে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় সে

লিউব্‌কাকে বুকের মধ্যে, তারপর বর্বরের মতো নিপীড়ন করতে থাকে তাকে। "আদরে সোহাগে মত্ত হয়ে উঠবে লিউব্‌কা,"—মনে মনে ভাবে সে: "আর স্বেচ্ছায়ই ধরা দেবে তখন।" চুমো খাবার জন্যে ওর মুখখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দেয় সিমানোব্‌স্কী, আর লিউব্‌কা চেঁচামেচি করতে করতে কেবল থুথু ছিটোতে থাকে ওর মুখে। চক্ষু-লজ্জার বাঁধ ভেঙে যায় লিউবকার।

—"বেরিয়ে যা, নচ্ছার, শয়তান, হতচ্ছাড়া, শূয়ার, নোঙরামুখো! খেঁাতা মুখ ভোঁতা করে দেব তোর।..."

গণিকালয়ের ভুলে-যাওয়া চোখা চোখা বুলি সব বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে ফের। সিমানোব্‌স্কীর চোখ থেকে পাঁশনেটা পড়েছে খসে, মুখে যা আসছে তাই বলে চলেছে সে: "প্রেয়সী আমার...কী দোষ এতে...এক মুহূর্তের একটু সুখ বৈ তো নয়!...তুমি আর আমি পরমানন্দে এক হয়ে মিশে যাব!...কেউ জানতে পারবে না!...আমার হাও!..."

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ঘরে এসে ঢোকে লিখোনিন!

—"বটে!"—নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অভিনেতার মতো হাত দু'খানা অবশ ভাবে পাশে এলিয়ে দেয় সে, থুৎনিটা প্রায় বুকের সঙ্গে নেতিয়ে পড়ে কাঁপতে থাকে তার, মর্মস্পর্শী ভাষায় বলতে সুরু করে দেয়: "সব কিছুই আশা করতে পারতাম, শুধু এইটি কখনো আশা করিনি। তোমায় ক্ষমা করতে পারি, লিউবা—তুমি হলে নরকের কীট; কিন্তু তুমি, সিমানোব্‌স্কী...শ্রদ্ধা করতাম তোমায়...যাক গে, এখনো মনে মনে জানি তোমায় সৎলোক বলে। কিন্তু নিজেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি আমি যে, বিবেকের নির্দেশের চেয়ে রিপুর উত্তেজনা সময় সময় কত প্রবল হয়ে ওঠে। যাক, এই পঞ্চাশটা রুবল রেখে যাচ্ছি—লিউবার জন্যে; তুমি যে একদিন তা শোধ করে দেবে তাতে সন্দেহ নেই আমার। ওর একটা বিধিব্যবস্থা করে দিয়ো!... তুমি বিজ্ঞ, হৃদয়বান, সৎলোক, আর আমি...("একটি পশু"—কে যেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলে ওঠে তার কানে কানে) আমি চলে যাচ্ছি, এ অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি নেই আমার। সুখী হও!"

টান মেরে পকেট থেকে টাকার থলিটা বার করে ধপ করে টেবিলের 'পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় লিখোনিন; তারপর দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। দোরগোড়ায় এসে চেঁচিয়ে বলে ওঠে: "পাশপোর্টখানা তোমার রয়েছে আমার ডেস্কের মধ্যে।"

তবুও, ওর পক্ষে কেটে পড়ার এই হলো প্রশস্ত পথ। আর এতদিন ধরে যে-স্বপ্ন ও দেখে এসেছে মনে মনে, ঘটনার পরিণতিও হলো কি না অবিকল সেই ভাবেই!

তৃতীয় ভাগ

—এক—

জেন্‌কার কাঁধে মাথা রেখে কেঁদে কেঁদে সব কথা খুলে বলে লিউব্‌কা।

লিউব্‌কার বিশ্বাস, লিখোনিন ওকে ফুসলে বার করে নিয়ে গিয়েছিল ; তারপর বোকা পেয়ে যতটা পেরেছে রস নিঙড়ে নিয়ে, ছোবড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এখন। সত্যি, লিখোনিনকে ভালোবেসে ফেলেছে লিউব্‌কা। অথচ লিখোনিনটা এমন—করলে কী, ওদের ওই সব এলোখোঁপা মেয়েদের 'পরে লিউব্‌কার বেজায় হিংসে দেখে, একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে ষড় করে দিলে তাকে পাঠিয়ে : আর যেই না সেই বদমাইস ছোঁড়াটা এসে জড়িয়ে ধরেছে ওকে, অম্নি আচমকা বাস্‌কা এসে ঢুকে বাধিয়ে দিলে খুব একচোট হৈ চৈ, তারপর তেড়ে বার করে দিলে ওকে রাস্তায়।

তারপর কী করেই যে দিন কেটেছে লিউব্‌কার! সঙ্গী নেই, সাথী নেই, একা, অসহায়, নির্জন এক রাস্তার 'পরে ছোট্ট বাজেমার্কা এক হোটেলের চিলেকুঠিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইল বেচারা। তা' সেখানেই কি নিস্তার আছে না কি! সবে যেদিন পা দিয়েছে সেখানে, সেদিনই কোত্থেকে এক ঘুঘু, পুরোনো ঘোড়েল মিনষে এসে, বলা নেই কওয়া নেই, জিজ্ঞেসাটি পর্যন্ত না করে, ওকে দিয়ে ব্যবসা চালাবার ফন্দি আঁটলে ; তাই সেখান থেকেও সরতে হলো তখন ; তারপর এসে পড়লে কিনা এক কুটনী মাগীর পাল্লায়।

তবুও যে লিউব্‌কা দ্বিতীয় বারের পতন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলবার জোর পেয়েছিল সে শুধু তার ওই আন্তরিক ভালোবাসার গুণে। সাহস করে খবরের কাগজগুলোতে গোটাকয়েক বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিলে ও—কোনও ভদ্রপরিবারে পেটভাতায় কাজ করতে রাজি আছে বলে।

তা' একে তো নেই ওর কোনো পরিচয়-পত্র ; তায় শুধু মেয়েদেরই সঙ্গে দেখা করে করে কাজ খুঁজে বেড়ানো ছাড়া গতি ছিল না ওর। এক আঁচড়েই বুঝে নিলে তারা—এ হলো তাদের সেই চিরকেলে শত্রু, তাদের স্বামী, ভাই, বাপ, ছেলেদের মনভুলানী মেয়ে। তাই তেমন সুবিধে হলো না কোথাও।

দেশে ফেরারও পথ নেই। সবাই জেনে ফেলেছে এতদিনে কোন্ পথে পা বাড়িয়েছে বেচারা। কেন, এই তো তার নিজের গ্রাম থেকেই তো কত লোক এসে চাক্ষুষ দেখে গেছে ওকে আনা মারকোবনার ওখানে। নাঃ, তার চেয়ে বরং গলায় দড়ি দেওয়া ভালো।

এদিকে আবার টাকাকড়ির বিষয়ে লিউব্কা হলো বড্ড বেহিসাবী—পাঁচ বছরের মেয়েটি যেন। দু'দিনেই ট্যাঁক হয়ে গেল গড়ের মাঠ, অথচ বেশ্যালয়ে ফিরে যেতে ভয়ও করে, ঘেন্নাও হয়। কিন্তু পথে পথে ঘুরে খদ্দের যোগাড় করা হলো একেবারে হাতের পাঁচ, পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় সব। শেষে সেই পথই ধরলে লিউব্কা।

সন্ধ্যেবেলায় বড়ো রাস্তার ধারে ওকে চলতে ফিরতে দেখে, পুরোনো ঘাগী বেশ্যারা এক আঁচড়েই চিনে নিলে ওকে ; যখন-তখনই কেউ-না-কেউ একেবারে ওর পাশটিতে এসে ঘেঁসে দাঁড়ায়, মন-ভোলানো মিঠে গলায় জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দেয় : "কী গো, মেয়ে, একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছ যে বড়ো? এসো, সই পাতাবে এসো। একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো যাবে'খন।"

—"হ্যাঁ, আর তা ছাড়া আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোয় লাভ আছে, বাছা! ইনেসপেক্টারদের সব চিনি আমি।"

—"কিসের ইনেস্পেক্টার?—জিজ্ঞেস করে লিউব্কা।

—"কেন, ওই যে সব মাছিধরা পুলিশ, বিনি টিকিটের ছুঁড়ীদের সব ধরে ধরে চালান দেয়! চিনবে কী করে গো ওদের? থানায় নিয়ে গিয়ে তোমার ছাড়পত্তরখানা নেবে কেড়ে, তার বদলি দেবে ওই বেউশ্যে মাগীর টিকিট, আর নাও, সামলাও ঠেলা এখন, হপ্তায় হপ্তায় ছোটো থানায় হাজরে দিতে। ...তা হলদে টিকিট থাকলেই কি নিস্তার আছে না কি না? খুসি হলেই ধরে নিয়ে যাবে। তারপর দু'হপ্তার জেল। বলবে

—মাতলামো করছিলে, নয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক ডাকছিলে। মানে দু'হপ্তার রোজগারের দফা গয়া।" এবার আসল কথা পাড়ে মেয়েটি : "তাই বলছিলাম কী, তুমি বরঞ্চ আমাদের সঙ্গে এসো। আমাদের যে বাড়ীউলী আছে সে লোক ভালো। আর আমরা তো মোটে তিনজন আছি, আর একজনের জায়গা কি হবে নি, বাছা ?"

তা, মেয়েটি মেয়ে ফুসলাতে জানে বটে। আরম্ভ করে বাড়ীউলীর প্রশংসা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাখ্যান, খুশীমতো চলাফেরার সুবিধের কথা। বলে, "তা বাড়ীউলীকে লুকিয়ে খদ্দেরের কাছ থেকে বাড়্তি আদায়ও হয়, বাছা!" তারপর বসে নিন্দা করতে ঐ সব বাড়ীর মেয়েদের : "ও তো সরকারী খোঁয়াড় : কচী-খুকীদের পাঠশাল !" লিউবৃকা জানে এসব নিন্দার দাম কত। ঐ সব জায়গার মেয়েরাও আবার এই সব পথচারিণীদের লক্ষ্য করে নাক সিঁটকে বলে . "ঘেয়ো কুত্তী !"

তা' শেষ অবধি যা হবার তাই হয়। অন্ধকার, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে, লিউবৃকা আবার নেবে পড়ে সেই দেহের বেসাতি করতে। এবারকার ব্যবসায় তার প্রথম খদ্দের হলেন দিব্য সুবেশধারী এক বুড়ো ভদ্রলোক—দেখে বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই মনে হয় তাঁকে, কিন্তু পয়লা নম্বরের অসভ্য বাঁদর একটি। যথারীতি তাঁর মনোরঞ্জন করে, পাবার বেলায় পেলে বেচারী একটি রুবল মোটে—আপত্তি করতে সাহসে কুলোল না। তার পরের বার এসে দিব্যি সুখটি আদায় করে নিয়ে, "টাকা ভাঙিয়ে আন্‌ছি" বলে সেই যে তিনি কেটে পড়লেন—আর দেখা মিলল না তাঁর।

আর এক ছোকরাও তারপর একদিন ঠিক ঐ কাণ্ডই করেছিল। খুব সাজগোজ করে এসে নিয়ে গেল ওকে এক হোটেলে। সেখানে বসে লম্বাচওড়া গুলগাল ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে, সে হচ্ছে কোন্-এক আর্লের ছেলে—মানে, ঐ যাকে বলে অবৈধ সন্তান আর কী, আর নিজেরও তার শহরময় নামডাক রয়েছে সেরা বিলিয়ার্ড-খেলোয়াড় বলে ; তা, লিউবৃকাকে কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না, তাকে ও কায়দাদুরস্ত 'লেডী' বানিয়ে দেবেখ'ন।···তারপর আসল কাজটি সেরে নিয়ে সেও ধরলে ঐ বুড়োর পথ।···মাঝের থেকে লিউবৃকার কপালে জুটল ওদের

ওখানকার সেই ট্যারাচোখো দরোয়ানটার হাতে বেদম প্রহার, বেচারার মুখখানি টিপে ধরে চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে মনের সাধে পিটিয়ে চলল সে ; শেষে যখন বুঝলে, দোষটা ঠিক লিউব্‌কার নয়, ছোকরাটাই একটি কানা কড়িও না ঠেকিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, তখন বেচারার মনিব্যাগটা টেনে বার করে তা থেকে ওর শেষ সম্বল এক রুবল আর খুচরো যে ক'টা পয়সা ছিল সব ঢেলে উপুড় করে নিলে, আর বন্ধকী বলে কেড়ে রেখে দিলে ওর টুপীটা আর জামা একটা।

আর একটি বাবু—বয়স প্রায় বছর পঁয়তাল্লিশ হবে, সাজগোজের তত বালাই নেই—এসে লিউব্‌বার দেহখানা নিয়ে—তা প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক হবে—নানা রকমে ডলাইমলাই করে, যাবার সময় দিলেন মোটে আশী কোপেক দক্ষিণা। আপত্তি করলে লিউব্‌কা ; ক্ষেপে গেলেন প্রেমিকবর, সিধে নাকের ডগায় ঘুঁসি বাগিয়ে তেড়ে এলেন তিনি : "ফের যদি ট্যাঁক ট্যাঁক করবি তো দেব থোঁতামুখ ভোঁতা করে।...পুলিশ ডাকব ; বলব, যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখন পকেট মেরেছিস। কী? করব তাই? অনেকদিন থানায়-টানায় যাওয়া হয়নি—না? তাই এত তেল!"

এ রকম প্রায়ই ঘটে।

শেষে যখন লিউব্‌কার নতুন বাড়ীওয়ালারা—এক মাঝি আর তার বৌ—ঘর থেকে বার করে দিলে ওকে, এমন কি ওর ছেঁড়া কম্বলখানা পর্যন্ত টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাস্তায়, তখন কোনো গতিকে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বেচারা সারারাত না ঘুমিয়ে পথে পথে কাটালে ; ভোর হলে লজ্জার মাথা খেয়ে গেল লিখোনিনের কাছে, কিন্তু গিয়ে দেখে লিখোনিন নেই সেখানে, বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে কোথায়। "আর নয়!"—হতাশ হয়ে ভাবলে সে এবার : "নাকে খৎ দিয়ে আবার সেই পুরোনো খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকি গে যাই।"

—"জেনী, জেন্নেচ্‌কা, লক্ষীটি আমার! তোর বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, প্রাণে দয়ামায়া আছে। তুই, ভাই, আমার হয়ে বল্ একবার এম্মা এডোয়ার্ডোব্‌নাকে! তোর কথা শুন্‌বে সে!"—অনুনয় করতে থাকে লিউব্‌কা, চোখের জলে ভিজিয়ে দেয় ওর আদুড় গা, বার বার চুমো দেয় ওর কাঁধের 'পরে।

—"কারো কথা শুনবে না সে।"—ম্লানমুখে উত্তর দেয় জেন্‌কা: "কেনই যে মরতে গেলি পোড়ারমুখোর সঙ্গে!"

—"কেন, জেন্নেচকা, তুই-ই তো বলেছিলি যেতে!"—ভয়ে ভয়ে বলে লিউব্‌কা!

—"আমি বলেছিলাম—আমি বলেছিলাম যেতে! আমি কি মরে গেছি যে দিব্যি মিছে কথা বলে যাচ্ছিস্ আমার নামে!...থাক্‌গে! চল্ দেখি!"

লিউব্‌কার ফেরবার খবর এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না আগেই পেয়েছিল। যখন এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে লিউব্‌কা বাড়ীর উঠোন পার হচ্ছিল তখন তাকে দেখতেও পেয়েছিল সে। তা' লিউব্‌কাকে আবার ফিরে নিতে আপত্তি নেই তার! তবে, হ্যাঁ, ফিরে নেবার আগে কিছুটা উচিত শিক্ষা হওয়া চাই তো মাগীর!

—"কী-ঈ,"—গর্জে ওঠে এম্‌মা। থতমত খেয়ে তো তো করতে থাকে লিউব্‌কা।

—"তোমায় আবার ফিরে নিতে হবে এখানে! কোথায় কোন্ ঘাটের মড়ার সঙ্গে পথে ঘাটে রঙ্গরস করে এসে, এখন চাইছ ফের একটি নামকরা জায়গায় ঢুক্‌তে! বেরো, বেরো এখান থেকে, কুশ্রী কুত্তী!"

এম্‌মার হাতখানা ধরে চুমো দিতে যায় লিউব্‌কা; এক হ্যাঁচকা টানে হাত ছিনিয়ে নেয় এম্‌মা, তারপর বিকৃত মুখে নীচের ঠোঁট কামড়ে, বেশ তাগ কষে সটাং প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয় তার গালে। উল্টে পড়ে লিউব্‌কা তার পায়ের কাছে। তক্ষুণি আবার উঠে বসে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে গোঙাতে গোঙাতে বলে: "দোহাই তোমার! দু'টি পায়ে পড়ি, মেরো না গো, মেরো না আর!" বলতে বলতেই আবার সটান মেজেয় গড়িয়ে পড়ে যায় বেচারা। রীতিমতো প্রহার সুরু হয় তখন। ক্রমাগত প্রায় দু'মিনিট ধরে, কায়দা করে, বেছে বেছে ব্যথার জায়গাগুলো ঠিক করে নিয়ে পটাপট মারতে থাকে এম্‌মা। দাঁতে দাঁত চেপে মুখটি বুঁজে এতক্ষণ সব সহ্য করছিল জেন্‌কা, শেষে আর পারে না—হঠাৎ ছুটে এসে এম্‌মার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, চুল ধরে

টানতে টানতে পাগলের মতো চেঁচাতে থাকে সে: "হতচ্ছাড়ী!... খুনী! · কুটনী মাগী! চোর..."

একসঙ্গে তিন-তিন জন মেয়েছেলের গলাবাজি চেঁচামিচির শব্দে ঘরদোর সব থন্ থন্ ঝম্ ঝম্ করতে থাকে; বাড়ীর যে যেখানে ছিল, ছুটে আসে সবাই হন্তদন্ত হয়ে। বেধে যায় তুর্কিনাচন ঘরখানার মধ্যে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড! কয়েদখানা, না, পাগলা-গারদ!

সাইমন আর পাশের বাড়ীর দু'জন দরোয়ান মিলে এলোপাথাড়ি মারধোর চালাতে থাকে মেয়েদের ওপর; ঘণ্টাখানেক বাদে হল্লা শান্ত হয়ে আসে। মেয়েদের কারোর 'পরেই ঝাল ঝাড়তে কসুর করা হয় না, তবে জেন্‌কার ভাগেই পড়ে সব চেয়ে বেশি। এত মার খেয়েও' তাকে ফিরে না-নেয়া অবধি, লিউব্‌কা কিন্তু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেবলই কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। আর মার খেয়ে সেই যে জেন্‌কা তার ঘরে গিয়ে, পায়ের ওপর পা দিয়ে, গুম হয়ে বসে রইল তারপর আর নড়নচড়নটি নেই; জলটি পর্যন্ত মুখে দেয় না; যে কাছে আসে, তাকেই তেড়ে যায়। চোখে তার কালশিরা পড়ে গেছে, ছেঁড়া জামার তলায় ঘাড়ের ওপর দগদগে চাবুকের দাগ—চামড়াও ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। অন্ধকারে চোখদু'টো তার হিংস্র পশুর মতন জলতে থাকে, নিজের মনে মনে কেবলই বলে চলে সে. "এক্ষুণি হয়েছে কী? ·· রোসো, দেখিয়ে দিচ্ছি মজাখানা! ঢের দেখতে বাকি এখনো...উ—উঃ, মানুষখেকো..."

কিন্তু আবার যখন ঘরে ঘরে আলো জলে ওঠে, ছোট খবরগিরনী হাঁক দিয়ে যায় দোরগোড়ায়: 'সাজগোজ করে নাও, মিস!...বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসো গে!' তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে জেন্‌কা, হাতমুখ ধুয়ে সাজগোজ করে নেয়, চোখের কালশিরায় লাগায় পাউডার, ছড়ে-যাওয়া জায়গাটায় লাগায় ক্রীম, তারপর ম্লানমুখে, তবুও গরবিনীর মতো, বাইরের ঘরের এসে বসে সে—জর্জরিত দেহ, অলৌকিক বহ্নিজ্বালা চোখে!

লোকে বলে, যারা আত্মহত্যা করে, শেষের কয়দিন তারা মন কেড়ে নেয় সবার—হয়ে ওঠে পরম আকর্ষণীয়! জেন্‌কাকেও দেখায় এখন ঠিক

তেমি—যারই চোখ পড়ে তার ওপর সে-ই আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না বুঝি!

আর, সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে জেন্‌কার মরণের জন্যে প্রকারান্তে দায়ী হয়ে রইল কিন্তু তার পরম স্নেহের পাত্র সেই মিলিটারী ইস্কুলের ছেলেটি—কোলিয়া গ্লাদিশেব।

—দুই—

ফুটফুটে লাজুক হাসিখুসি ছেলেটি এই কোলিয়া গ্লাদিশেব—সবে গোঁফের রেখাটি দেখা দিয়েছে মোটে। তারই সঙ্গে গত বছর সারা শীতকালটা বাৎসল্য রসের চর্চা করে এয়েছে জেন্‌কা, পুতুলখেলাও দিয়েছে কত ওকে। মনে মনে লজ্জায় মরে গিয়ে ও যখন বেরিয়ে যেত এই নরককুণ্ড থেকে, তখন জেন্‌কা কোনোদিন ওর হাতে গুঁজে দিত একটা আপেল, কোনোদিন হয়তো একজোড়া বন্‌-বন্‌—এই রকম।

এবার যখন সে ফিরে এল, বেশ বড়োসড়োটি হয়ে উঠেছে তখন; কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা বাড়িয়েছে সে—ঢেঙা হয়ে উঠেছে বেশ, বুক-পিঠের গড়নও শক্ত হয়ে উঠেছে। মিলিটারী ইস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে তার। বাড়ীতেও কদর বেড়ে গেছে। বড়োদের সামনে সিগ্রেট খাবার অনুমতি পর্যন্ত পেয়েছে সে। বাড়ী থেকে মাসে মাসে পনেরো রুবল করে হাত-খরচাও বরাদ্দ হয়ে গেছে তার জন্যে।

আর এইখানে—এই আনা মারকোব্‌নার এখানেই—প্রথম পেয়েছিল সে নারীদেহের স্বাদ—পেয়েছিল ঐ জেন্‌কাকে।

অকলঙ্ক নিষ্পাপ ছেলেদের অধঃপতন এই সব গণিকালয়ে অথবা পথচারিণীদের দিয়ে যতটা ঘটে থাকে, এমন আর কিছুতেই নয়। তবুও, শুধু ছেলেছোকরারাই নয়, বুড়োরা পর্যন্ত তাঁদের প্রথম পতনের জন্যে প্রায়ই দায়ী করে থাকেন বাড়ীর ঝী কি দাইকে—বলেন, ওদেরই কেউ-না-কেউ নাকি পেতেছিল প্রথম মায়াজাল। হায় রে, বিসদৃশ সুদীর্ঘ মিথ্যাভাষণ!

দেখা যায়, ছেলেবেলায় যে-মিথ্যা কথা বলে বাহবা পেয়ে এসেছি আমরা, বারবার তার পুনরাবৃত্তি করতে করতে শেষে নিজেরাই ভুলে যাই যে ওটা বানানো কথা—আমাদের জীবনের একটা ইতিহাস হয়ে ওঠে সেটা। কোলিয়ার বেলায়ও ঠিক এইটিই ঘটেছিল—বন্ধুদের কাছে কালক্রমে সে ফলাও করে বর্ণনা করতে আরম্ভ করে, কী করে তার কে-এক কাকী না মামী কে-একজন তাকে নাকি প্রথম নষ্ট করে। অবশ্য একথা ঠিক যে তার বর্ণনা অনুযায়ী এইরূপ এক মোহিনী আত্মীয়ার সান্নিধ্য তার জীবনে ঘটেছিল—তবে সে সান্নিধ্য আগাগোড়াই ছিল তার কল্পনার জগতে, নিঃসঙ্গ একক যৌন আবেশের সকরুণ, ভীরু, কুফলপ্রসূ মুহূর্তগুলিতে—যা এ সংসারের যাবতীয় পুরুষই যদি না হয়, তবে অন্ততঃ শতকরা নিরানব্বই জনই অনুভব করে এসেছেন অন্তরে অন্তরে।

এই ভাবে ন,' কি সাড়ে-ন' বছর বয়স থেকে যৌন উত্তেজনা অনুভব ক'রে এসেছে কোলিয়া; বোঝেনি—এর পরিণাম কী ভয়াবহ। আর, তার দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন এমন কোনো শিক্ষিতা মহিলা তার পাশে ছিলেন না যিনি বাজে সংস্কার না মেনে তাকে সহজবোধ্য উদাহরণ দিয়ে, উপমা দিয়ে, বুঝিয়ে দিতে পারতেন ভালোবাসা কী, জন্মরহস্যই বা কী। আর তখনকার দিনের শিক্ষককুল বা শিক্ষায়তন থেকে এমনটি আশা করাও ছিল দুরাশা।

বাড়ীর আদরযত্নের প্রতি টান, মা বোন দাইমা'র স্নেহমমতার প্রতি আকর্ষণ, সব যেন হঠাৎ রূঢ় ভাবে ছিন্ন হয়ে গেল বোর্ডিংএ এসে; তার বদলে দেখা দিল ফুটফুটে ছেলেদের সঙ্গে ভাব ক'রে (যেমন হয়ে থাকে মেয়েদের প্রতিষ্ঠানে 'সখীদের' নিয়ে) আনাচে-কানাচে ফিস্‌ফাস্‌ করা, অন্ধকারে গলাগলি করে মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখির যত সব অসম্ভব ইতিহাস নিয়ে কানাকানি করা। এ সব হলো অংশতঃ বালকবয়সের রূপকথার নেশা আর অংশতঃ যৌন-জাগরণের সূচনা। তার ওপর যত সব বাজে বই পড়ার নেশা—ঠিক মদেরই নেশার মতো, নিষিদ্ধ বস্তুর সম্মোহন।

আসলে কিন্তু এই সব গল্প কি অশ্লীল ছবি এদের মনে ঠিক রসের

খোরাক যোগায় না—এসব নিয়ে ওরা শুধু পায় খুব খানিকটা মজা, ভারী একটা খেলা, চোরাই মালের খবরদারি করার মতো। ওদের লাইব্রেরীতে পুশ্‌কিন আর লেরমোন্‌তোব্‌-এর অনেক ভালো ভালো বই· ছিল; ওস্ত্রোব্‌স্কীর সমস্ত কৌতুক-রচনাও ছিল; আর ছিল তুর্গেনেব্‌-এর প্রায় সব বই-ই; এইগুলোই কোলিয়ার জীবনে সব চেয়ে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করলে। সকলেই জানেন, অপরাজেয় কথাশিল্পী তুর্গেনেব্‌-এর হাতে প্রেম হয়ে উঠেছে হতাশার স্বচ্ছ আবরণে ঘেরা এক অপার্থিব লোভনীয় বস্তু—ধরাছোঁয়ার বাইরে, নিষিদ্ধ অথচ লোভনীয়: তাঁর কুমারী নায়িকারা পূর্বরাগের আবেশে বেপথু, অনুরাগের আবির্ভাবে চঞ্চল—অপরিসীম লজ্জায় ম্রিয়মান; থেকে থেকে শিউরে ওঠে তারা, রাঙিয়ে উঠে ক্ষণে ক্ষণে। বিবাহিতা আর বিধবারা আবার সে ক্ষুরধার দুর্গম পথে চলেছে আর এক ভাবে: বহুদিন সংগ্রাম করতে থাকে তারা কর্তব্যের সঙ্গে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে, অথবা জনমতের বিরুদ্ধে। তারপর, আহা! সহসা পদস্খলন, চোখের জলে ভেসে যায় সব। নয়তো, বরণ করে নেয় তারা সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম; কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মুহূর্তটিতে সহসা দৈবের বশে নায়ক বা নায়িকার জীবনাবসান—বুঝি জীবনদেবতার শুধু একটি করুণ নিশ্বাসের অভাবে সুপক্ক জীবনফলটি পড়ি পড়ি করেও বৃন্তচ্যুত হতে পারে না আর! তবুও তাঁর নায়ক-নায়িকারা সকলেই পিয়াসী হিয়ায় ছুটে চলেছে এই কলঙ্কময় প্রেমের দিকে—হাসছে কাঁদছে তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে, হারিয়ে ফেলেছে নিখিল-বিশ্ব। আমরা বড়োরা যে ভাবে নিয়ে থাকি এসব জিনিসকে, ছোটরা তা পারে না। তাই নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহের বশে মনে করে তারা—বড়োর বুঝি কী-একটা পরম লোভনীয় সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছে তাদের কাছ থেকে।

তা' কোলিয়ার চোখে প'ড়েও গেল একদিন এক লুকোচুরির খেলা! কী-একটা কাজে যেন ছুটে এসে বাবার ঘরে ঢুকতে যাবে সে, এমন সময় চোখে পড়ল তার—ঘরের ভিতর থেকে অ্যাপ্রন্‌-এ মুখ ঢেকে বেরিয়ে আসছে তাদের বাড়ীর ঝী ফ্রোসিয়া—লাল টুকটুকে সদাই হাসিখুসি মেয়েটি, আর কী বাঁধুনী তার শরীরের। বিস্মিত

কোলিয়া ঘরে ঢুকে দেখে—তার বাবার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে! খাঁড়ার মতো লম্বা নাকটা উঁচিয়ে রয়েছে তার ওপর। "বাঃ রে, বাবাকে দেখাচ্ছে যেন তুর্কি-মোরগ"—মনে মনে ভাবলে সে। আর এই তো সেদিন বাবার দেরাজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ বার করে ফেললে সে একগোছা অশ্লীল ছবি!

শুধু তাই বা কেন! ওই যে পল এডোয়ার্ডোবিচ নামে নবকার্তিকটি আসেন মাকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় নীপার নদী থেকে নৌকো করে বেড়িয়ে আনবার জন্যে, মায়ের আমার তখন সাজগোজের কী ঘটা! ঝী-চাকরদের সঙ্গে কথা কইবার সময় কী খনখনে গলার আওয়াজ মায়ের, আর এখন তা কোন্ যাদুমন্ত্রে মিহি মোলায়েম করে আনে মা—ঐ তো যখন আসে ঐ পল এডোয়ার্ডোবিচ!

আর কোলিয়ার দাদাটিই বা কী কম? মিলিটারী ইস্কুলের পড়া শেষ করে ভালো কাজ পেয়েছে সে; ছুটিতে এসেছে বাড়ীতে, এমন সময় চোখ পড়ে যায় তার বাড়ীর ঝী নিউসার উপর। খাসা মেয়েটি, পোষাক বদলালে ভ্রম হয় অভিনেত্রী কি রাজকুমারী, নয়তো রাজনৈতিক কর্মী বলে। আদর করে সবাই তাকে ডাকে শ্রীমতী অনীতা ব'লে! শ্রীমতীরও মন গেল গলে। মা কিন্তু বুঝলেন সবই; নিজের মনকে বোঝালেন: তা' মন্দ কী! বোরেন্‌কা যে কোনো বেশ্যা বা পথে-পথে-ঘোরা মাগীর পাল্লায় পড়েনি সেইটাই তো বাঁচোয়া। ওর চেয়ে নিউসার মতো নিষ্পাপ, সরল শান্ত মেয়ের সঙ্গে···তা' মন্দ নয়।

কোলিয়া তখন রাতদিন থাকত পাহাড়পর্বত ডিঙোনোর কল্পনায় মেতে, 'কৃষ্ণশার্দূল' নামে এক জঙ্গলী সর্দারের মতন যত সব অসম্ভব কাণ্ড করতে পারাটাই ছিল তার সে বয়সের একমাত্র কাম্য বস্তু। তবুও মনোযোগ দিয়ে দাদার প্রণয়ের বিচিত্র গতি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল সে। শেষে, মাস ছয়েক পরে একদিন সে দরজার আড়াল থেকে শুনতে পেলে—শ্রীমতী অনীতাকে মা কী অসভ্য ছোটলোকের মতো গালাগাল করছে! মেয়েটা তখন মাস-পাঁচেকের পোয়াতী। নির্বিঘ্নেই মিটে যায় সব—ছুঁড়িটা যদি টাকা নিয়েই চলে যেতে রাজি হয়। তা' সে যাবে না, বলে—"চাইনে টাকা; বড়ো দাদাবাবুকে

ছেড়ে থাকব কী করে গো?" তা' কি কখনো থাকতে দেওয়া যায় না কি? তাইতো পুলিশ ডাকিয়ে ঘাড় ধ'রে বার করে দেওয়া হলো তাকে। যা ভাগ।

ইস্কুলের পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়বার সময়ই কোলিয়ার অনেক বন্ধু 'বিষবৃক্ষের ফল' খেয়েছিল। এটাকে তারা মস্ত একটা বাহাদুরি বলেই মনে করত। আর এসব গল্প বেশ প্রাণ খুলেই বলাবলি করত তারা নিজেদের মধ্যে—কোথায় লাগে তার কাছে দেনিস দাদিদোবের আমলের পল্টনদের কেচ্ছাকেলেঙ্কারীর কাহিনী।*

তারপর কোলিয়াও একদিন গিয়ে উঠল আনা মারকোভ্নার বাড়ীতে। উঃ! আজও মনে পড়ে তার সেদিনকার সে কথা—সেই অজানা আশঙ্কা, দুরু দুরু বুক, তারপর সাহস সঞ্চয়ের জন্যে পেট ভরে ঢক ঢক করে মদ গেলা! তারপর বড়ো হল-ঘরটায় আলোর বন্যায় ভেসে চলেছে গোলাপী, নীল, বেগ্‌নী, রঙবেরঙের সাজে ফুল-পরীদের দল, আহা! কোলিয়ার এক বন্ধু একটি মেয়েকে কানে কানে কী যেন গিয়ে বলে; ছুটে আসে মেয়েটি কোলিয়ার কাছে: "হ্যাঁ গা, কোলের কাত্তিকটি আমার, এখনও স্থায়না হওনি তুমি?…এসো, যাই…সব শিখিয়ে পড়িয়ে স্থায়না বানিয়ে দিই তোমায়।"

এ ধরণের সোহাগ নতুন নয় এখানে, বাড়ীর দেয়ালগুলোরও বুঝি তা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তারপর আর কী! সে কথা মনে করতেও আজ ভয় করে কোলিয়ার, আবছামতো মনে পড়ে শুধু—প্রদীপটা থেকে আলোর রেখাটা কেবলি বুঝি গোল হয়ে হয়ে ঠিকরে পড়ছিল; আর চুমোর পর চুমো—দীর্ঘ, বিলম্বিত! বিহ্বল স্পর্শসুখ—তারপর অকস্মাৎ তীরের মতো কী-একটা ব্যথা, যাতে করে মানুষ যুগপৎ আনন্দে মরে যেতে চায়, আর চেঁচিয়েও উঠতে যায় আতঙ্কে! তারপর? অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কোলিয়া—বিবর্ণ হাতখানা তার

* দেনিস দাদিদোব (১৭৮১—১৮৩৯) একজন কবি। তাঁর অধিকাংশ গীতিকবিতারই বিষয়বস্তু হলো সৈন্যসামন্তদের যুদ্ধবিগ্রহ আর কেচ্ছাকেলেঙ্কারীর কাহিনী।

থরো থরো করে কাঁপছে তখন, পোষাকের বোতামটাও আঁটতে চাইছে না যে!

অবশ্য সবাই অনুভব করে থাকে রতিক্রিয়ার পর এ অবসাদ; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত, আত্যন্তিক, সুগভীর মর্মার্থ অনতিকালেই মন থেকে মুছে গিয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুকাল অবধি—সময় সময় আজীবনও—তা পর্যবসিত হয়ে থাকে বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের পর একটা ক্লান্তিবোধ ও গ্লানিবোধের আকারে। কেলিয়াও তাই অল্পকালের মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এ অবসাদে; সাহসও বেড়ে চলে তার, নারী-রহস্যের দ্বার খুলে যায় শেষে। আর তাই ভারী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে সে এখন যখন তার আগমনে মেয়েরা সব, বিশেষ করে ভেরকা, হাঁক দিয়ে ওঠে: "ওরে তোর ভাবের মানুষ এয়েছে রে, জেন্নেচ্‌কা!"

কাল্পনিক একজোড়া গোঁফের ডগায় মাতব্বরের ভঙ্গিতে তা দিয়ে এ কথা সঙ্গীসাথীদের কাছে গল্প করতে ভারী ভালোবাসে ছোকরা।

—তিন—

আগস্টের এক সজল সন্ধ্যা। রাত ন'টা বাজে। আনা মারকোব্‌নার বৈঠকখানা ঘর প্রায় খালি। দরজার পাশে টেলিগ্রাফ-আপিসের এক কেরানী মুটকী কিটীর সঙ্গে একটু রসালাপের চেষ্টা করছে। আর আছে বুড়ো রলি-পলি—লম্বা লম্বা ঠ্যাং মেলে এর-ওর কাছে গিয়ে রসের গল্প শুনিয়ে বেড়াচ্ছে।

কোলিয়া গ্লাদিশেব এসে ঘরে ঢোকে। দোরগোড়ায় দেখেই চিনতে পারে ভেরকা, হাততালি দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে চেঁচিয়ে ওঠে: "জেন্‌কা, জেন্নেচ্‌কা, দ্যাখ সে এসে, ভাবের মানুষ এয়েছে রে তোর....সেই খোকা জাঁদরেল···মাইরি, নব কাত্তিকটি যেন!"

বৈঠকখানায় ছিল না জেন্‌কা, পড়েছিল সে তখন রেল কোম্পানীর এক হেড-গার্ডের পাল্লায়।

কোলিয়া গ্লাদিশেব কিন্তু একা আসেনি আজ, সঙ্গে আছে ওই

ইস্কুলেরই আর একটি ছেলে—পেত্রোব, এই প্রথম বেশ্যাবাড়ীর সিঁড়ি মাড়ালে সে আজ।

বৈঠকখানায় গিয়ে ঢোকে দু'জন। বুকে সাহস আনবার জন্যে ঠেসে মদ খেয়েছে পেত্রোব, পা টলছে, মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে একদম। ভেরকা আর তামারা এসে আগলে বসে তাদের।

—"কৈ? একটু ধোঁয়াটোঁয়া হোক, কেলেসোনা আমার!"—পেত্রোবকে বলে ভেরকা, আর সঙ্গে সঙ্গেই—যেন এম্নি হঠাৎ—ছেলেটির পায়ের সঙ্গে নিজের তপ্ত উরুখানা দেয় ঠেকিয়ে আর বলে ওঠে: "মাইরি, কী সুন্দর তোমায় দেখতে!"

—"কিন্তু জেনী কোথায়? আর কাউকে নিয়ে ব্যস্ত না কি?"—তামারাকে জিজ্ঞেস করে কোলিয়া।

গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে রয় তামারা তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ; অস্বস্তি বোধ করে কোলিয়া, চোখ নেয় ফিরিয়ে।

—"বালাই, ষাট! তা হতে যাবে কেন? আজ সারাটা দিন বেচারার মাথা ধরে রয়েছে; বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় গিন্নীদি' ভেতর থেকে দরজা খুলেছে আর হঠাৎ বেচারা কপালে চোট পেয়েছে, তাইতে মাথা ধরে গেছে তার। আহা, সারাটা দিন মাথায় জলপটি দিয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কেন? সবুর সইছে না বুঝি? আর একটু বসো, এক্ষুণি এসে পড়বে। ভারী খুশী হবে আজ ওকে পেয়ে।"

ততক্ষণে পেত্রোবকে নিয়ে পড়েছে ভের্কা: "যাদুমণি, মাণিক আমার, ওরে আমার মনচোরা! বড্ড ভালোবাসি আমি এই সব কেলে-সোনাদের; কী যে ভালোবাসতে পারে তারা!" বলতে বলতে মিহি-গলায় হঠাৎ গান জুড়ে দেয় সে:

ওরে আমার কেলেসোনা
আমার নয়নতারা,
বেচতে কি তুই পারিস আমায়,
—করতে পাগলপারা!

না, না, না,

থুড়ি বেচতে যে মানা!

কত সইলি যাতনা,

কত করলি ভাবনা;

জানি আমায় দিবি কিনে

শাড়ী গহনা।

—"হ্যাঁ গা, তোমার নামটি কী, ভাই?"

—"জর্জ,"—ভারী গলায় উত্তর দেয় পেত্রোব।

—"জোর্জিক! জোরোচ্‌কা! আহা, বেশ নামটি তো!"

তারপর হঠাৎ তার কানের কাছে মুখটি নিয়ে এসে দুষ্টু হাসি হেসে বলে ওঠে ভেরকা, "জোরোচ্‌কা, কাছে এসো মাইরি!"

লজ্জা পেয়ে যায় পোত্রাব, অসহায়ের মতো বলে বসে: "জানিনে যাও···ও যদি বলে তবে···"

হো হো করে হেসে ওঠে ভেরকা: "এই ছাখো! কচি খোকাটি আমার গো! বলে কি না 'ও যদি বলে তবে!' তার চাইতে বরং যাও, দাই-মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো গে!—দুধুলী দাই-মাকে, বুঝলে? শুনলি, ভাই তামারা: আমি ডাকছি ওকে 'চলো শুতে যাবে খন' আর ও বলে কি না 'বন্ধু যদি বলে তবে।' তা বেশ, বেশ! ওগো বন্ধুবর, তুমি বুঝি মানুষ করেছ ওকে?"

—"বিরক্ত করো না, খবরদার বলছি!"—ইস্কুলের ছেলেদের মতো ভারী গলায় শাসিয়ে ওঠে পেত্রোব।

এমন সময় এসে হাজির হয় রলি-পলি, অরে সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয় বকবকানি: "হে বালসেনা-যুগল, হে বিদগ্ধজনকুসুম, আপনারা শষ্প-ভূমিতে বিচরণশীল এই অকিঞ্চিৎকর বৃদ্ধটিকে একটি সুপেয় ধূমযষ্টি দান করবেন কি? দরিদ্র আমি। অহো ভাগ্যম্! তথাপি শষ্পম্ পরমোপাদেয়ম্!"

তারপর সিগ্রেটটা হাতে পেয়েই কোমরে হাত দিয়ে ডান পা বেঁকিয়ে গান জুড়ে দেয় রলি-পলি:

এমন দিনও গেছে আমার
ভোজ দিয়েছি যখন-তখন!
মদের নদী বইয়ে দিতাম ;
আর রুটীর কণাও পাইনে এখন
'সারাতোব্'-এ যেতেম যখন
সেলাম পেতেম দরজাতে।
আর আজ যদি হায়, সেখানে যাই—
গলাধাক্কা হবে খেতে॥

তারপর আবার হঠাৎ গান থামিয়ে বুকে করাঘাত করতে করতে ফের বক্তৃতা সুরু করে দেয় রলি-পলি : "হে ভদ্রমহোদয়দ্বয়! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আপনারা হচ্ছেন ভাবীকালের সৈন্যাধ্যক্ষ স্কোবেলেব আর গুরকো। আমার মৃদু করাঘাতে আপনাদের হৃদয়ের রত্ন-খচিত স্বর্ণ-কপাট উন্মুক্ত হোক—কিছু অর্থসাহায্য করুন পরমাত্মার নামে।"

—"তার আগে এঁদের সেই 'ঝিকিমিকি' খেলাটা দেখাতে হবে কিন্তু,"—বলে ওঠে কিটী ঘরের ও-পাশ থেকে : "এম্নি ফাঁকি দিয়ে পয়সা মিলবে না, হুঁ! বুঝলে গো হাঁদা উঁট?"

—"যো হুকুম!"—উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রলি-পলি, তারপর ছোট্ট একটা ভণিতা করেই জুড়ে দেয় খেলা : জুনমাসের আকাশে আধিপত্য করছেন আমাদের সূয্যিমামা। মাঠঘাট সব ফুটিফাটা।"...মিষ্টি হাসিতে কুঁচকে ওঠে রলি-পলির সঙের মতো মুখখানা, চোখদুটো তার অর্ধচন্দ্রাকৃতি : "দিগ্বলয়রেখার কাছে দেখা দেয় এক টুকরো কালো মেঘ; দেখতে দেখতে মেঘের পরে মেঘ জমে আসে আকাশে ; নীল আকাশের মুখে কে যেন দেয় কালি ঢেলে।"...রলি-পলির হাসি হাসি মুখখানা আস্তে আস্তে আসে গম্ভীর হয়ে : "অন্ধকারে মুখ লুকোন সূয্যিমামা ; ঘনঘটা আকাশে।"...মুখখানাকে কঠোর করে তোলে রলি-পলি, ভয়াবহ তার চেহারা : "ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে চড়্‌বড়্‌ করে।"...একখানা খালি চেয়ারের পিঠে আঙুল দিয়ে বাজাতে থাকে সে চড়্‌বড়্‌ করে : "দূরে দেখা যায় ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ...।" বাঁ গাল

আর চোখের পাতা নাচিয়ে ঝিকিমিকি খেলা দেখায় রলি-পলি : "ঝমাঝম বৃষ্টি হয় সুরু ; তারপর আকাশ চিরে চোখ ধাঁধিয়ে খেলে যায় মস্ত বড়ো একটা ঝিলিক।"···অদ্ভুত কৌশলে এক সঙ্গে ভ্রূ, চোখ, নাক, আর ঠোঁটের নাচনে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা খেল দেখিয়ে দেয় রলি-পলি।··· "কড়-কড়-কড়-কড়াৎ! শত বচ্ছরের বুড়ো এক ওকগাছের মাথার 'পরে ভেঙে পড়ে বাজ।"···সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে রলি-পলি, তড়াক করে তক্ষুণি আবার দাঁড়ায় উঠে : "ক্রমে ঝড়বৃষ্টি আসছে কমে, বিদ্যুতের ঝিলিক পড়ছে থেমে, মেঘ যাচ্ছে সরে—গুড়-গুড়-গুড়-গুড় ; মেঘের ফাঁকে সূয্যিমামা মারছে উঁকি।"···মুখ বানিয়ে হাসে রলি-পলি : "এই যে, ফের দিনের আলো উঠেছে ফুটে।"··· রলি-পলির মুখেও ফুটে ওঠে কৌতুকময় মোহন মৃদুহাসি।

গ্রাদিশেব আর পেত্রোব প্রত্যেকে দেয় তাকে বিশ কোপেক করে পুরস্কার। হাত পেতে নেয় রলি-পলি, সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে হাত দুলিয়ে বলে ওঠে, "ফুসমন্তর ফুঃ!" কোথায় পয়সা!

—"ভারী অন্যায় তোমার তামারোচকা",—রাগের ভাণ করে বলে সে : "গরীব বুড়োর পয়সাক'টা চুরি করতে লজ্জা হলো না তোমার? এখানে লুকিয়ে রেখেছ কেন বলতো ?" একটা হ্যাঁচকা টান মেরে পয়সা কয়টা যেন তামারার কানের ভেতর থেকেই বার করে নিয়ে আসে সে, তারপর ছোকরাদের বলে, "এক্ষুণি আসছি ; আমা বিহনে চারিদিক অন্ধকার দেখবেন না যেন। নমস্কার!···"

—"রলি-পলি, এই পনেরো কোপেক দিয়ে আমায় মিষ্টি কিনে এনে দাও না! এই যে ধরো।" —পয়সা ছুঁড়ে দেয় ছোট ফর্সা মান্‌কা ; লুফে নেয় তা রলি-পলি, তারপর টুপীটা কায়দা করে মাথায় চাপিয়ে সঙের মতো একটা সেলাম ঠুকে একদম অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

ধামড়ী হেনরিয়েটা কেলিয়াদের কাছে আসে, একটা সিগ্রেট চেয়ে নিয়ে বলে, "বসে বসে ছুঁড়ীদের সঙ্গে গজালি না ক'রে এসো না, ভাই, নাচি একটু!"

"বেশ তো!"—উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কোলিয়া।

বাজনা বেজে ওঠে। দল বেঁধে নাচ সুরু করে দেয় মেয়েরা।

সেবারে শীতকালেই কোলিয়া দেখে গেছে সব চেয়ে ভালো নাচতে পারে তামারা; তাই ও গিয়ে তামারার সঙ্গে নাচতে থাকে। নাচের ফাঁকে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান গার্ড সাহেব।

ভেরকা কিন্তু পেত্রোবকে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মদের নেশা তার কেটে গিয়ে এখন মনমরা হয়ে পড়েছে সে।

নাচ থামলে পর কোলিয়া আর তামারা পাশাপাশি এসে বসে এক টেরে। "কৈ জেন্নেচ্‌কা তো এলো না এখনো?"—কোলিয়া জিজ্ঞেস করে ফের। ভেরকার দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় তামারা। চোখ নীচু করে ইসারায় জানিয়ে দেয় ভেরকা: চলে গেছে লোকটা।

—"দেখি, নিজেই গিয়ে ডেকে আনি ওকে,"—জবাব দেয় তামারা।

—"কেন? জেন্‌কার জন্যে এত হামলে মরছ কেন? আমায় নিলেই তো পার!"—বলে ওঠে ধাম্‌ড়ী হেনরিয়েটা।

—"আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে!"—উত্তর দেয় কোলিয়া।

তখনও পোষাক পরেনি জেন্‌কা। আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে পাউডার ঘসছে মুখে।

—"কী গো তামারোচ্‌কা?"—জিজ্ঞেস করে সে।

—"তোর সেই খোকা জাঁদরেলটি এয়েছে। বিরহে হাঁপিয়ে মরছে যে।"

—"ও, গত বছরের সেই পুঁচকে ছোঁড়াটা?...মরুক গে যাক!"

—"আর সে কচি-খোকাটি নেই রে। দিব্যি বড়ো-সড়োটি হয়েছে এখন। আর যেমন স্বাস্থ্য তেম্নি রূপ, আর ঢেঙাও হয়ে উঠেছে কতখানি! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।...কী, রাজি নাকি? না, আমিই—"

আরশীর মধ্যে কুঁচকে ওঠে জেন্‌কার ভ্রূ: "না, পাঠিয়ে দে তাকে। বল্‌গে, আমার মাথা ধরেছে বড্ড!"

—"তাই বলেছি। বলেছি, দরজার পাল্লা হঠাৎ মাথায় লেগে চোট পেয়েছে! তবে কথা কী জানিস—মজুরী পোষায় কী এতে, জেন্নেচ্‌কা?"

—"সে ভাবনা তোর নয়—বুঝ্লি, তামারা ?"

—"এও কি সম্ভব যে তুই একটুও দুঃখিত ন'স—এই এতটুকুও নয় ?"

—"তবে আমার জন্যেও তুই দুঃখিত ন'স ?"—ঘাড় গর্দান জোড়া ক্ষত-চিহ্নটার 'পরে হাত বুলিয়ে নেয় জেন্‌কা : "তোর নিজের জন্যেও তোর দুঃখ নেই ? নেই কোনো দুঃখ হতভাগী লিউব্‌কার জন্যে ? নেই পাস্‌কার জন্যে ? তোর দেখছি রক্তমাংসের শরীর নয়, একতাল মাংসপিণ্ড শুধু !"

শুধু হাসে তামারা—চতুর রাগের হাসি : "না রে জেন্‌কা, আসল কাজের বেলায় তা নই আমি। যাক, সে তুই পরে বুঝতে পারবি। এখন এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। আচ্ছা, গিয়ে বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

নীল বাতিটা নামিয়ে রেখে, রাতের কোর্তা পরে শুয়ে রয় জেনকা। একটু পরে ঘরে এসে ঢোকে কোলিয়া। তার পেছনে পেছনে পেত্রোবকে টানতে টানতে নিয়ে আসে তামারা। যোসিয়াও আসে, ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বলে : "বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো! দু'টি যুবতী আর দু'টি সুপুরুষ। বোতল-টোতল হবে নাকি গো ?"

কোলিয়ার পকেটে রয়েছে প্রায় পঁচিশ রুবল ; দিলদরিয়া মেজাজে জিজ্ঞেস করে : "ভালো মাল আছে তো ?"

—"কী যে বলেন !"—যোসিয়া জবাব দেয় : "সেরা মাল সব পাবেন এখানে।···ফরাসী লাফিৎ পর্যন্ত। মেয়েরা আবার লেমোনেড দিয়ে লাফিৎ খেতে ভারী ভালোবাসে।"

—"দাম কত ?"

—"পয়সা দিয়ে বুঝি দর যাচাই! এসব ভালো ভালো বাড়ীতে সব বাঁধা দর। এক বোতল লাফিতের দাম পাঁচ রুবল আর চার বোতল লেমনেডের দাম দু'রুবল। মোট সাত রুবল।"

—"ঢের হয়েছে, যোসিয়া !"—জেনকা থামিয়ে দেয় তাকে : "এদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেন যা-তা ঠকিয়ে নিচ্ছ ? মোট পাঁচ রুবলই যথেষ্ট ! এরা আজেবাজে লোক নয়—বুঝেছ ?"

তা' কোলিয়াই যেন লজ্জা পেয়ে যায় বেশি। একখানা দশ-রুবলের

নোট টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে : "যাকগে, এ নিয়ে এত দরবার কেন ? যা বললে—আনো গে যাও !"

—"তা এই নিয়েই যখন এয়েছি বাপু, বসবার দরুণ দামটাও তো কেটে নিতে হবে আমায় ! তা আপনারা মশাইরা কি ঠিকে বসতে এয়েছেন, না রাত কাবার করে যাবেন এখানে ? জানেন তো দর : ঠিকে বসতে দু'রুবল ; রাতকাবারী দশ।"

—"বেশ, বেশ : ঠিকেই বসবেন ওঁরা, ঠিকেই বসবেন,"—জ্বলে ওঠে জেন্‌কা : "এটুকুতে বিশ্বাস করতে পার গো আমাদের।"

· মদ আসে। কী জানি কী খেয়ালের মাথায় খাবারও আনিয়ে ফেলে তামারা। ছোট্ট মান্‌কাকে ডাকিয়ে আনায় জেন্‌কা। নিজে কিন্তু সে দাঁত দিয়েও কাটে না কিছু, ওঠেও না বিছানা থেকে, সারাক্ষণ একখানা শাল চাপা দিয়ে, শুধু মুখটি বার করে পড়ে রয় ; চোখদুটো তার কোলিয়ার ওই সুন্দর রোদে-পোড়া মুখখানার 'পরে—কী চমৎকার পৌরুষের ভাব ফুটে উঠেছে মুখখানায় ! চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না জেন্‌কার !

জেন্‌কার বিছানার 'পরে বসে এসে কোলিয়া, ওর হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে আমার লক্ষীটির ?"

—"এমন কিছু নয়···মাথায় গুঁতো লেগে ধরেছে মাথাটা একটু।"

—"ওদিক থেকে মন ফেরাতে চেষ্টা করো, কমে যাবে এক্ষুণি।"

—"গেছেও কমে ; এই যে তোমায় দেখতে পেয়েছি, অনেকটা ভালো বোধ করছি এখন। এদিক মাড়াও নি কেন গো এতদিন ?"

—"সময় পাই নি মোটে। ক্যাম্পের যা খাটুনি !···সন্ধ্যেবেলা মনে হতো পা দু'খানা আর নেই !"

—"আহা বেচারা !"—হঠাৎ বলে ওঠে ছোট্ট ফর্সা মান্‌কা : "এই সব কচি কচি সোনামণিদের কোন্ প্রাণে খাটায় ওরা এমন করে ? তোমার মতো যদি একটি ভাই কি ছেলে থাকত আমার, বুক ফেটে যেত তবে। এই যে, এসো, ভাই, কল্যাণ হোক !"—গেলাস ঠোকাঠুকি করে নেয় ওরা !

জেন্‌কা খালি একদৃষ্টে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে কোলিয়াকে।

—"তুমি জেন্‌কা ?"—একটা গেলাস এগিয়ে দেয় কোলিয়া।

—"ইচ্ছে করছে না,"—মনমরার মতো উত্তর দেয় জেন্‌কা ; তারপর সবার দিকে ফিরে বলে : "নাও গো, মেয়েরা সব, গেলাকোটা, গালগল্প তো হয়েছে এখন, বসে বসে আর হেদিয়ে যেয়ো না।" উঠে পড়ে সবাই।

—"রাত কাটাবে আজ আমার সঙ্গে ?"—সবাই চলে গেলে জিজ্ঞেস করে জেন্‌কা : "ভয় নেই, বাছা ; পকেটে কম থাকে তো বাকিটা আমিই দিয়ে দেব'খন। কী চমৎকার দেখতে তোমায় যে! বেউশ্যে মাগীও খরচা পোয়াতে গায়ে মাখে না তোমার তরে—না ?" হেসে ওঠে জেন্‌কা।

চমকে ফিরে চায় প্লাদিশেব ; ওর অনভ্যস্ত শ্রবণেও জেন্‌কার গলার আওয়াজ কেমন যেন শোনায় আজ—তাতে না আছে বিষাদ, না আছে মায়া, না আছে বিদ্রূপ।

—"না, গো পিয়ারী, মন চাইছে থাকতে ; কিন্তু দশটার মধ্যে বাড়ী ফিরতে হবে যে।"

—"সে জন্যে কেউ ভাববে না। বেশ তো বড়োসড়োটি হয়ে উঠেছ এখন গো! এখনো কি কথা শুনে চলতে হবে নাকি সবার ? তা, বেশ, যা ভালো বোঝো করো।...আলোটা নিবিয়ে দেব ? না, এ রকমই জ্বলবে ? শোবে কোন্‌দিকে—দেয়ালের দিকে, না, ধারের দিকে ?"

—"হ'লেই হলো একটা দিক!"—কাঁপা গলায় জবাব দেয় কোলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে জেন্‌কার বিশুষ্ক তপ্ত দেহখানা ধরে জড়িয়ে, ঠোঁট বাড়িয়ে মুখখানা এগিয়ে নিয়ে আসে ওর মুখের দিকে। আস্তে করে সরিয়ে দেয় জেন্‌কা।

—"থাক! পরে হবে! একটু ধৈর্য ধরো ; প্রাণ ভরে চুমু খাবার ঢের সময় পাব'খন দু'জনে। এই শুদ্ধু এক লহমা একটুখানি চুপটি করে শোও দিকিনি! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে...চুপচাপ...নড়োচড়ো না...।"

জেন্‌কার আদেশ মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে, যন্ত্রচালিতের মতো চুপটি করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে কোলিয়া—হাতদু'খানা রাখে মাথার

নীচে। পাশ ফেরে জেন্‌কা, কনুই বেঁকিয়ে হাতের 'পরে মাথা রাখে উঁচু ক'রে, তারপর সেই আধো-আলোয় প্রাণ ভরে দেখতে থাকে সে কোলিয়ার দেহখানাকে—সুশুভ্র, বলিষ্ঠ, পেশীবহুল দেহখানা তার; কত স্পষ্ট শরীরের ভাঁজগুলো! কী চমৎকার গড়ন বুকের মাঝখানটির, কী সুন্দর সুবিন্যস্ত পঞ্জরাস্থি সব! উরুদু'খানি যেমন মাংসল তেমি কঠিন! ক্ষীণ কটিতট! মুখ আর ঘাড়ের অর্ধেকটা এয়েছে তামাটে হয়ে, ঘাড়ের মাঝখানটিতে স্পষ্ট তামাটে দাগ—ক্রমে কাঁধ আর বুকের শুভ্রতায় গেছে বিলীন হয়ে।

চোখ মিটমিট করে চায় গ্লাদিশেব; জেন্‌কার এই অপলক স্থিরদৃষ্টি তার মুখে, বুকে, সারা অঙ্গে, মাকড়সার জাল বুনে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে যেন।

শিউরে ওঠে সে। চোখ চেয়ে মনে হয়—কোন্ এক অপরিচিতার একজোড়া ডাগর ডাগর কালো চোখ প্রেতের মতো নিমেষহারা চেয়ে আছে তার দিকে, কত কাছে!

—"কী দেখছ তুমি, জেনী? ভাবছই বা কী?"

—"বাছা আমার গো!…কী যেন তোমার নাম—কোলিয়া, না?"

—"হ্যাঁ?"

—"রাগ কোরো না, কোলিয়া—শুধু একটা খেয়াল: লক্ষীটি, ফের চোখ বোজো দিকিনি…না, ভালো করে বন্ধ করো, আরও ভালো করে …হয়েছে। আলোটা বাড়িয়ে দিই। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তোমায়।…যদি জানতে কত সুন্দর তুমি…এই যে ঠিক এখন…এই মুহূর্তটিতে! এর পর হয়ে উঠবে তুমি বর্বর, আর গা দিয়ে বেরুতে থাকবে তোমার বোটকা গন্ধ। এখন কিন্তু পাচ্ছি তোমার গায়ে পশমী আর দুধে গন্ধ…আর বনফুলের গন্ধও বুঝি মিশে আছে তারই সঙ্গে।… বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো।"

আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে এসে বসে জেন্‌কা—তার সেই আধো-শোয়া আধো-বসা ভঙ্গিতে। দু'জনই নীরব। খানকয়েক কামরা পেরিয়ে ভেসে আসে পিয়ানোর টুংটাং সুর; শোনা যায় কার যেন কাটা কাটা হাসির আওয়াজ; আরেক দিক থেকে আসে কী-একটা হাল্কা গান, আর

গাল-গল্পের টুকরো টুকরো কথা। দূরে রাস্তা দিয়ে গড় গড় করতে করতে চলেছে একখানা গাড়ী…।

—"এইবার ওর শরীরে ঢুকিয়ে দেব রতিজ রোগ!"—মনে মনে ভাবে জেন্‌কা: "যেমন দিয়ে আসছি আর পাঁচজনকে।" আর একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয় সে—কোলিয়ার আপাদমস্তকে। আহা! ভাঁজ করা হাতদু'খানার মাংসপেশীগুলো সত্যিই কেমন ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে। "কিন্তু মায়া হচ্ছে কেন ওর 'পরে? বড্ড সুন্দর বলে?"—মনে মনে তোলাপাড়া করতে থাকে জেন্‌কা: "নাঃ, মায়ামমতা সব বিসর্জন দিয়েছি তো কবে! তবে? ছেলেমানুষ বলে? তাই তো, এই সেদিন ফিরে যাবার বেলা আদর ক'রে পকেটে গুঁজে দিয়েছি ওর আপেল।"

—"কোলিয়া!"—শান্তকণ্ঠে ডাক দেয় জেন্‌কা: "চোখ চাও এবারটি!"

চোখ চায় কোলিয়া, জেন্‌কার দিকে পাশ ফেরে, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে টেনে এনে শেমিজের ফাঁক দিয়ে চুমো খেতে যায় ওর বুকে। ফের তাকে নিরস্ত করে জেন্‌কা।

—"না, না; রসো একটু,—কথাটা শেষ করতে দাও আমায়…এই এক মিনিট শুধু। বলো তো, বাছা, আমাদের কাছে আস কেন তোমরা?"

—"কী বোকা মেয়ে!"—হাসতে থাকে কোলিয়া: "কেন আবার? আমি কি পুরুষ নই? তা মনে তো হয়, সে বয়েস হয়েছে আমার যখন পুরুষ মাত্রেরই মধ্যে জেগে ওঠে…কী বলব…একটা প্রয়োজন…এই, নারীর জন্যে।"

—"প্রয়োজন! শুধুই প্রয়োজন? তার মানে যেমন প্রয়োজন আমার বিছানার তলায় ঐ প্রস্রাবপাত্রের?"

—"না, তা কেন? তোমায় ভারী ভালো লাগে আমার…সেই প্রথম দিন থেকেই…তা হ্যাঁ, বলতে কী, ভালোবেসেও ফেলেছি যেন একটু…অন্ততঃ, আর কাউকে নিয়ে তো থাকি নি কখনো।"

—"বেশ! কিন্তু প্রথমবার? সে-ও কি ছিল প্রয়োজন?"

—"না, তা নয় বোধহয়; তবে কেন কী জানি, ঠিক বুঝতে পারতাম না, কিন্তু নারীসঙ্গের কামনা হয়েছিল—বন্ধুরা সব মাথা বিগড়ে দিয়েছিল …অনেকে আসতও এখানে…তাই আমিও এলাম শেষে…"

—"তা যেন হলো। কিন্তু সেদিন লজ্জা করেনি তোমার?"

এ আবার কী কথা! ধাঁধায় পড়ে যায় সে, বিরক্তও হয় বুঝি, বুঝতেও পারে—একেবারে আজেবাজে বকুনি নয় এ, গভীর অর্থ আছে এর মধ্যে।

—"লজ্জা…না, লজ্জা ঠিক করে নি, তবে এই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মনটাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে মদ খেয়েছিলাম সেদিন।"

ফের এক কাতে শুয়ে পড়ে জেনী, কনুইয়ের 'পরে মাথা রেখে এক-একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চায় ওর দিকে।

—"আচ্ছা, বলো দিকিনি, প্রাণ,"—কোলিয়ার কানের কাছে মুখটি এনে ফিস ফিস করে বলে জেনী: "আর একটি কথার জবাব দাও আমায়। এই যে পয়সা দিয়ে গেলে সেদিন, ওই দুটো পাপ-রুবল—বুঝলে—দিলে প্রেম কেনার জন্যে, যাতে করে আমায় করতে হয়েছে তোমায় আদর, খেতে হয়েছে চুমো, দিতে হয়েছে সারা দেহটি তোমায় সঁপে—তার জন্যে পয়সা দিতে লজ্জা হলো না তোমার? হয়নি কোনদিন?"

—"হা ভগবান! এ সব কী বলছ তুমি আজ! তা সবাই তো পয়সা দিয়ে থাকে! আমি না দিলে আর কেউ দিত—সে একই কথা নয় কি?"

—"আচ্ছা, কোলিয়া, কারও প্রেমে পড়েছ কখনো? সত্যি কথা বলো! বেশ তো, আন্তরিক ভালোবাসা না হয় না-ই হলো, এম্নিই হলো না হয়…মনে প্রাণে…প্রেম করেছ কখনো? তুলে দিয়েছ ফুল,… হাত ধরাধরি করে বেড়িয়েছ চাঁদের আলোয়? হয় নি এ সব কিছু?"

—"তা, হ্যাঁ"—অচঞ্চল ভারী গলায় জবাব দেয় কোলিয়া: "তা কৈশোরে কে-ই বা না করেছে এমন চ্যাংড়ামো! সবাই করে থাকে ওসব…"

—"কে সে? নিকট সম্পর্কের বোন নিশ্চয়ই? লেখাপড়া জানা মেয়ে? বোর্ডিং ইস্কুলের ছাত্রী?...আছে তো এমন মেয়ে? নেই কি?"

—"তা, হ্যাঁ, তাই তো—সবারই থাকে এমন আত্মীয়।"

"বেশ, তাকে তুমি স্পর্শও করতে না, করতে কি?...ছেড়েই দিতে তাকে, কেমন? আচ্ছা, সে যদি বলত: 'নাও আমায়, কিন্তু দুই রুবল চাই আমার'—কী বলতে তুমি তাকে?"

—"সত্যি, জেন্‌কা",—কোলিয়া রাগ করে এবার: "আমি মোটেই তোমার এই মাথা-মুণ্ডু কথাগুলোর মানে খুঁজে পাচ্ছি নে। কী বলতে চাও তুমি? বলো তো, চলে যাই; যাই পোষাক পরি গে যাই।"

—"না না। যেও না, কোলিয়া, যেও না! আর একটি কথার জবাব দিয়ে যাও,—শেষপ্রশ্ন আমার, সত্যিই শেষপ্রশ্ন!"

—"হায় রে!"

—"আচ্ছা, মনে করো তোমাদের পরিবার অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছে। লেখা-টেখা নকল ক'রে, কি ছুতোর-কামারের কাজ করে, কোনোরকমে তোমাকে সংসার চালাতে হচ্ছে। আর তোমার বোন বিপথে পা দিয়েছে—এই আমাদের সবাকার মতো...হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বোন, তোমার আপন বোন...এক বদমাইসের পাল্লায় পড়েছে সে, ফিরছে...হাতবদলাবদলি হতে হতে...কেমন লাগবে তখন তোমার?"

—"যত সব-বাজে কথা!...এ হতেই পারে না।"—কোলিয়া থামিয়ে দেয় ওকে: "থাকগে—ঢের হয়েছে; চললাম আমি।"

—"তাই, তাই বরং যাও! অন্তত এটুকু দয়াও করো আমায়! ঐখানে ঐ বাক্সের মধ্যে আছে দশটা রুবল। নিয়ে যাও তুমি—ঐ দিয়ে তোমার মায়ের জন্যে কিনে দিয়ো একটা সোনাবসানো পাউডারের বাক্স আর তোমার ছোটবোন যদি কেউ থেকে থাকে তো তার জন্যে একটা পুতুল! বোলো, এক খানকী মাগী চিরজন্মের মতো এ সংসার ছেড়ে চলে গেছে—তারই স্মৃতিচিহ্ন এ সব। যাও বাছা!"

তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে কোলিয়া, মেজের 'পরে সিধে হয়ে দাঁড়ায়—নগ্ন, সুঠাম, অপরূপ তরুণ যৌবনের প্রতিমূর্তিটি যেন!

—"কোলিয়া!"—স্নিগ্ধ আকুল সোহাগ-সজল স্বরে কূজন করে ওঠে জেন্‌কা: "কোলেচ্‌কা!"

ফিরে চায় কোলিয়া, আচমকা ছোট্ট একটু দম্‌কা শ্বাস টেনে নেয়——হাঁপিয়ে উঠেছে বুঝি। এ কী! সজল চোখে উঠে দাঁড়িয়েছে জেন্‌কা—মমতাভরা বিষাদময়ী নারীর নীরব ভর্ৎসনার প্রতিমূর্তিটি যেন! সুন্দর, অপরূপ! জীবনে এমনটি দেখেনি সে কোনোদিন—ছবিতেও নয়। বিছানার পাশে বসে পড়ে সে, আবেগভরে জড়িয়ে ধরে জেন্‌কাকে, মমতাভরে বলে: "আর ঝগড়া করে না জেন্‌কা!"

লতিয়ে পড়ে জেন্‌কা ওর বুকে, দু'হাত মেলে কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওর, মাথা এলিয়ে দেয় ওর বুকের 'পরে। নীরবে কেটে যায় কতক্ষণ।

—"কোলিয়া"—হঠাৎ বিরস বদনে জিজ্ঞেস করে জেনী: "ব্যামোর ভয় করে না তোমার?"

শিউরে ওঠে কোলিয়া। হিম হয়ে যায় সব বুকের ভেতরটায়। তক্ষুণি কোনো উত্তর জোগায় না তার মুখে।

—"ভয়! তা' ভয়ের কথাই তো বটে।"—আমতা আমতা ক'রে বলে শেষে - "ভগবান রক্ষা করুন আমায়! তা' আমি তো শুধু তোমার কাছেই আসি, শুদ্ধু তোমারই কাছে! তেমন তেমন হ'লে বলতে বটে তুমি!"

—"তা' বলতাম বটে!"—চিন্তিতভাবে কথার জের টেনে বলে জেনী: "আচ্ছা, সিফিলিস রোগটা কেমন—শুনেছ কখনো!"

—"শুনেছি বৈকি!···নাক খসে পড়ে···।"

—"না, কোলিয়া, শুধু নাকই নয়। সারা শরীরটাই পচতে থাকে,—হাড় পর্যন্ত! কোন কোন ডাক্তার অনর্থক বলে এ রোগ সারে। সারে, না ঘোড়ার ডিম! দশ, বিশ, ত্রিশ বছর ধরেও কোন কোন লোক পচ্‌তে থাকে। যে-কোন মুহূর্তে পক্ষাঘাত হতে পারে! কারোর বা ঘটে মস্তিষ্ক-বিকৃতি! যাদের হয়েছে এ রোগ তারা সবাই জানে যে পানাহার, চুম্বন, এমন কি নিঃশ্বাসটিতে পর্যন্ত এ বিষ ছড়ায় তারা, আর যারা তার নিকটতম তাদেরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এ-বিষ—বোন, বৌ, ছেলে···যাদের হয়েছে এ ব্যামো তাদের সন্তানরা হয়ে

থাকে বিকৃতাঙ্গ, ক্ষয়রোগী, হাবা।…কোলিয়া, কোলিয়া—এই হচ্ছে ঐ রোগের আসল পরিচয়। আর কোলিয়া."—সটান সিধে হয়ে দাঁড়ায় জেনকা, শক্ত ক'রে চেপে ধরে তার কাঁধ দু'খানা, মুখখানা নিয়ে আসে নিজের মুখ-বরাবর ; গভীর বিষাদ-পরিপ্লুত, আলোকসামান্য চোখ-দুটির চাউনিতে ধাঁধা লেগে যায় কোলিয়ার চোখে ; "এই যে, কোলিয়া, শোনো তবে! আজ মাসাধিক কাল আমারও হয়েছে ঐ সর্বনাশা রোগ। তাই, তাই তোমাকে আমি চুমু খেতে দিই নি, বন্ধু!"

"যাঃ, ঠাট্টা করছ তুমি!‥খালি খালি ক্ষেপাচ্ছ আমায়, জেনী।"

—"ঠাট্টা!…এসো তবে—ছাখো!"

সোজাসুজি কোলিয়াকে দাঁড় করিয়ে দেয় জেনী, তারপর একটা দেশলাই জেলে বলে : "মন দিয়ে চেয়ে ছাখো, হাঁ করছি আমি।" দেখে শিউরে ওঠে কোলিয়া। "ঐ যে দেখলে শাদা শাদা দাগ আলজিবের মধ্যে, ঐ সেই কালব্যাধি"—মুখ বন্ধ ক'রে বলে জেনী : "বুঝলে…নাও, এবার পোবাক পরে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দাও।"

বাকরোধ হয়ে আসে কোলিয়ার। কোনোদিকে না চেয়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরতে যায় সে, উল্টোপাল্টা করে ফেলে সব, কাঁপে হী হী করে।

—"বড্ড বেঁচে গেলে আজ!"—মাথা নীচু করে বলতে থাকে জেনকা : "কপাল ভালো যে পড়েছিলে এসে ভালোমানুষের মেয়ের হাতে। আর কারো পাল্লায় পড়লে রক্ষে ছিল না আজ! জেনে রেখো —তোমরা যারা আমাদের সতীত্ব নষ্ট ক'রে শেষে তাড়িয়ে দিয়েছ সমাজ-সংসার থেকে, তারপর দু'টি রুবলের বিনিময়ে এসে এক-একবার যাও দর্শন দান করে, বুঝলে, তাদের 'পরে, ভেবো না, কিছুমাত্র দরদ আছে আমাদের।"—হঠাৎ সগর্বে মাথা উঁচিয়ে বলে জেনকা : "হ্যাঁ, কায়মনোবাক্যে ঘৃণা করি আমরা তোমাদের, বিন্দুমাত্র মায়ামমতা নেই তোমাদের প্রতি।"

মাঝপথেই পোষাক পরতে ভুলে যায় কোলিয়া, ধপ্ করে বসে পড়ে বিছানার 'পরে, দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে—কচি ছেলেটি যেন : "হা ভগবান!"—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে থাকে সে :

"কী কঠোর সত্য এ!···কী নিদারুণ!···কেন, আমাদের চোখের সুমুখেই তো ঘটেছে এমন কাণ্ড; আমাদের ছিল এক ঝী, মিউসা···ঝী শুধু ···সবাই ডাকত তাকে শ্রীমতী অনীতা ব'লে···চমৎকার মেয়েটি···আর আমার দাদা থাকত তাকে নিয়ে···আমারই দাদা···একজন মিলিটারী অফিসার···সে চলে গেলে দেখা গেল মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা, আর মা তাকে দিলেন তাড়িয়ে···হ্যাঁ, দূর করে দিলেন একেবারে···ছেঁড়া ন্যাতা যেন ···কোথায় এখন সে? আর বাবা···বাবা তিনিও যে একজন···ঝী ···ঝীকে নিয়ে···"

আর থাকতে পারে না জেন্‌কা, অর্ধনগ্ন অবস্থায়ই উঠে দাঁড়ায়। কোলিয়ার সামনে এসে জেন্‌কা—সেই মুখরা, কটুভাষিণী, নাস্তিক জেন্‌কা—ধীরে গম্ভীরে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে আঁকে ক্রুশচিহ্ন গভীর মমতা আর কৃতজ্ঞতাভরে। উচ্চারণ করে আশীর্বাদ: "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাছা আমার!"

তারপর ছুটে গিয়ে দোর খুলে হাঁক দেয় সে: "গিন্নীদি'!"

—"গিন্নীদি' ভাই, দেখো দিখিন, তামারা আর ছোট মান্‌কার মধ্যে যাকে পাও ডেকে দাও তো"—হুকুম করে জেন্‌কা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে কী যেন বলে কোলিয়া; শুনেও শোনে না জেন্‌কা।

—"যত শীগগির পার পাঠিয়ে দাও,—বুঝলে?"

—"এই যে দিচ্ছি পাঠিয়ে, মিস।"

—"ও সব আবার কেন, জেনী? ডাকছ কেন ওদের? বলবে না কি সব?"

—"দাঁড়াও একটু···ভয় নেই, লজ্জা দেব না তোমায়।"

একটু পরেই ইস্কুলের মেয়ের পোষাক পরে মানকা এসে দাঁড়ায়: "আমায় ডাকছিস জেনী? কেন? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

—"না, মান্নেচকা, ঝগড়া হয়নি। বড্ড ধরেছে মাথাটা। তুই বরং ওর সঙ্গে থাক আমার বদলি। কেমন?"

—"থাক, থাক, ঢের হয়েছে, জেনী লক্ষ্মীটি!"—আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলে ওঠে কোলিয়া: "বুঝতে পারছি সব। আর দরকার নেই কিচ্ছু।···মেরে ফেলো না আমায় আর!"

—"কী গো, ব্যাপার কী?"—কিছু বুঝতে না পেরে খেলাচ্ছলে হাত দুলিয়ে জিজ্ঞেস করে মান্‌কা।

—"না। কিছু নয়। যা এখন তুই। এমনি ঠাট্টা করছিলাম।" অগত্যা ভালোয় ভালোয় বিদায় করে দেয় ওকে জেন্‌কা।

দু'জনেই পোষাক পরে এসে দাঁড়ায় দরদালানের দোরের কাছে। মুখে কথা নেই। বিষণ্ণ চোখে চেয়ে থাকে শুধু এ ওর মুখের দিকে। কেটে যায় বহুক্ষণ। ঠিক বুঝতে পারে না কোলিয়া, প্রাণ দিয়ে অনুভব করে শুধু, জীবনে তার ঘনিয়ে এসেছে আজ মহাবিপর্যয়।

শেষে সে-ই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে, জেনীর হাতখানি ধরে বলে: "আমায় ক্ষমা করো! ক্ষমা করো, জেনী!"

—"হ্যাঁ, বাছা!...হ্যাঁ, আমার মাণিক!...হ্যাঁ... হ্যাঁ..."

মায়ের মতো সস্নেহে কোলিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে জেনী, তারপর আলগোছে ঠেলে দেয় ওকে বারান্দার দিকে; ঘরে ঢুকে দরজাটা একটু ফাঁক করে ডেকে জিজ্ঞেস করে ফের: "কোথায় চল্লে এখন?"

—"বন্ধুকে নিয়ে সোজাসুজি বাড়ী চলে যাব।"

—"যা ভালো বোঝ করো।...ভগবান মঙ্গল করুন তোমার, বাছা!"

—"ক্ষমা করো!...ক্ষমা করো!..." জেনীর দিকে হাত বাড়িয়ে ফের বলে ওঠে সে।

—"বলেইছি তো, ধন,করেছি ক্ষমা!...আর, আমায়ও ক্ষমা করো তুমি।...আর যে দেখা হবে না গো তোমায় আমায়!"

ঝনাৎ করে দোর বন্ধ করে দেয় জেনী।

একা—একা এখন সে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে কোলিয়া; পেত্রোব তামারাকে নিয়ে যে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, কী করে তা খুঁজে বার করে এখন? যাক ঐ যে ছোট গিন্নী যোসিয়া ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছে এদিকে। জিজ্ঞেস করতেই খ্যাঁক করে ওঠে সে: "আ, মোলো যা, তোমায় নিয়ে এখন

মাথা ঘামাবার ফুরসুৎ নেই, বাপু! ঐ যে, বাঁ ধারের তেসরা নম্বরী ঘর।"

দরজায় গিয়ে ঘা দেয় কোলিয়া। ভেতরে কেমন যেন একটা হুটোপাটি আর ফিসফাস কথার শব্দ। ফের ধাক্কা দেয় সে: "দোর খোলো কেরকোবিয়ুস। আমি সোলিতেরোব।"

ছদ্মনাম দুটো—ঠিক আত্মগোপনের জন্যে ততটা নয়, যতটা হলো রোমাঞ্চকর গুপ্তচর-কাহিনীর অনুকরণে রহস্যপ্রিয়তার জন্যে।

—"এখন আসতে পাবে না তুমি!"—দোরের পেছনে শুনতে পাওয়া যায় তামারার গলা: "কাজে ব্যস্ত আমরা।"

—"মিছে কথা!"—প্রতিবাদ করে ওঠে পেত্রোব। "এসো তুমি।"

দোর খুলে ফেলে কোলিয়া। ভেতরে ঢুকে দেখে, পোষাক পরে চেয়ারের 'পরে বসে আছে পেত্রোব, চোখমুখ লাল, মনমরা হয়ে পড়েছে একেবারে, ছোট্ট ছেলেটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ নীচু করে বসে আছে বেচারা।

—"বেশ বেছে বেছে বন্ধু একটি জোগাড় করে এনেছ বটে!"—ক্রোধভরে শ্লেষ করে বলতে থাকে তামারা। "ভেবেছিলাম দরদী পুরুষ, এখন দেখছি একেবারে একটি কচি খুকী! ধর্ম নষ্ট হতে দুঃখে মরে যাচ্ছেন একেবারে। আহা, কী রত্নই কুড়িয়ে পেয়েছো গো! তা নিয়ে যাও, ফেরৎ নিয়ে যাও রুবল দুটো!"—হঠাৎ পেত্রোবের 'পরে হম্বিতম্বি সুরু করে দেয় সে: "যাও, বরং কোনো গরীবদুঃখী ঝী-টীকে দান কোরো! ছুঁচো কোথাকার!"

—"কেন গালমন্দ করছ আমায়?"—চোখ না তুলেই বলে পেত্রোব: "আমি তো গালমন্দ করিনি তোমায়! তুমিই দেখছি শাপশাপান্ত সুরু করলে! এই তো তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি এতক্ষণ, তুমি নাও ও দুটো রুবল। আর তুই-ই বা কেমন প্লাদিশেব—থুড়ি, সোলিতেরোব? আমি ভেবেছিলাম ভাল মেয়ে, কিন্তু সারাক্ষণ খালি চুমো খেতে চেষ্টা করছে আর কী যে সব করছে তা ভগবানই জানেন…"

রাগের মধ্যেও হেসে ফেলে তামারা: "ও, আমার বোকা ছেলে! আহা, রাগ কোরো না—নিচ্ছি তোমার টাকা। কিন্তু দেখো: আজই

সন্ধ্যেবেলায় এর জন্যে অনুতাপ হবে তোমার। থাক, নাও, এসো ভাব করি এখন। দাও, হাতখানা এগিয়ে দাও গো—এই আমি যেমন দিয়েছি।"

—"চলো যাই, কেরকোবিউস,"—বলে গ্রাদিশেব. "আসি, তামারা!" তামারা ছেলেহু'টিকে এগিয়ে দিতে যায়।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে আঁৎকে ওঠে কোলিয়া—বৈঠকখানা ঘরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের স্তব্ধ, ছমছমে! মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ আর চাপা গলায় দ্রুত কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসে।

প্রথমে এসে যে ছবিটার নীচের তারা বসেছিল, সেখানে বাড়ীর প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে আর নীচের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে। ভীড়ের মধ্যে কোনো রকমে মাথা গলিয়ে কোলিয়া দেখে, মেঝের কাৎ হয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ে আছে রলি-পলি! মুখখানা নীল—একেবারে যেন কালিবর্ণ—হয়ে গেছে।

—"কী হলো হঠাৎ?"—আতঙ্কে শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করে কোলিয়া।

জবাব দেয় নিউরকা—ফিসফিস করে ত্রস্তস্বরে বলে: "কী জানি! মানকার জন্য মিষ্টি কিনে এনে, আমাদের আরমেনিয়ান ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে লাগল,…হঠাৎ হাসতে হাসতে এল জোর একটা কাশির টান, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে—একেবারে চুপ।…বাব্বা, আমি আবার মড়া দেখতে পারিনে গো!"

—"দাঁড়াও! দেখি কপালে হাত দিয়ে। হয়তো বেঁচে আছে।"

এগোতে যায় কোলিয়া; কিন্তু সাইমনের আঙুলগুলো একেবারে লোহার সাঁড়াসীর মতো বেধে এসে ওর কনুইয়ের ওপরটায়, হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে ওকে পেছনে।

—"নেই, নেই, দেখবার কিস্সুটি নেই আর,"—ধমক দিয়ে ওঠে সাইমন: "যান এখন, চলে যান মশাইরা এখান থেকে! এখুনি পুলিশ আসবে, সাক্ষী মানবে সব আপনাদের। যত রাজ্যের খিটকেল তখন! ভূতের বাপের ছেরাদ্ধ এই মিলিটারী ছোঁড়াদের নিয়ে!"

ঠেলতে ঠেলতে পোষাক-কুঠুরীতে নিয়ে যায় ওদের সাইমন, ওভারকোট দুটো গায়ে চাপিয়ে দিয়ে বলে: "যান, দৌড়ে পালান! টিকিটি যেন দেখতে না পাই ফের। এর পর এলে আর ঢুকতে দিচ্ছিনি! বুড়ো কুত্তাটাকে মদের পয়সা খয়রাৎ করেছিলেন আপনারা —আর তাই কোঁক কোঁক করতে করতে একদম পটল তুললে সে চোখের সামনে।"

—"বটে! বড্ড ওস্তাদি ফলাচ্ছ যে দেখি।" —হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গ্রাদিশেব।

—"মানে? ওস্তাদি ফলাচ্ছি তার মানে?"—গর্জে ওঠে সাইমন; "এক ঘুঁষিতে নাকখানা এমনি থেঁৎলে দেব যে বাপমায়ের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব। এক্ষুণি পালা! নইলে ঘাড়গর্দান এক হয়ে যাবে!" ভ্রূহীন চোখের পৈশাচিক দৃষ্টির সামনে মিইয়ে পড়ে মিলিটারী ছাত্রদু'টি।

দুটো লোক এসে ঘরে ঢোকে—সাইমনের পেশাদার সাঙাৎ দু'জন।

—"কী? রলি-পলির ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে বলে?"—বেশ স্ফূর্তির ঝোঁকে জিজ্ঞেস করে এসে তাদের একজন।

—"হ্যাঁ, একদম কাবার,"—জবাব দেয় সাইমন: "এখন লাশ টেনে রাস্তায় ফেলতে হবে, নইলে ভূত হয়ে উৎপাত করবে। গোল্লায় যাক শালা! লোকে ভাববে মদ খেয়ে মাতলামো করতে করতে রাস্তায়ই অক্কা পেয়েছে।"

—"তবে তোর ··অ্যাঁ···তোর কম্ম নয় তা হ'লে?"

—"বুর্বাকের মতো কথা শোনো একবার! আরে, একটা অছিলে তো চাই রে! এমন নিপাট ভালোমানুষটা—ভেড়ার ছানা আর কী! সত্যি সত্যিই আয়ু ফুরিয়েছিল শালার।"

—"তা, শালা মরবার আর ঠাঁই খুঁজে পেলে না! এর চাইতে খারাপ আর কিছু মাথায় আসেনি বুঝি?"—জিজ্ঞেস করে দ্বিতীয় জন।

—"য্যা বলেছিস, সাঙাৎ!"—জবাব দেয় প্রথম জন, "বেড়ালি রে সঙটি সেজে, মজলি এসে পাপের হাটে! যাক, চল এখন, যাবি না?"

সামরিক ছাত্র দু'জন প্রাণপণে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে। গলি-গলির ভূত তাদের তাড়া করেছে বুঝি!

কোলিয়া গ্রাদিশেব! শোনো, শোনো! যখন তুমি বড়ো হবে, তোমার কি মনে থাকবে তখন আজকের এই আগস্ট-রাতের কথা? তোমার ছেলের কাছে এ কাহিনী বলতে পারবে তুমি?

—চার—

সকাল নেমেছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি; বড্ড একঘেয়ে; মন্দ লাগে না তবু। প্লাতোনোব এসে দিনমজুরের দলে ভিঁড়ে, একটা বন্দরে তরমুজের বজরা খালাসের কাজে গিয়ে লেগেছে। ভারী ভালোবাসে সে এই রকম নিশ্চিন্ত ভবঘুরের জীবন।

তা' কাজটা বেশ লাভজনকও বটে। দলের সর্দার জাবোরোৎনী লোকটা খুব ওস্তাদ, মনিবকে জপিয়ে-জাপিয়ে মজুরীর হার বেশ চড়িয়ে নিয়েছে—দৈনিক এক-একজন এখন উপায় করছে চার রুবল অবধি। জাবোরোৎনীর কিন্তু তাতেও মন ওঠে না, লোকজনদের কাজে খালি তাড়া দেয়—যাতে করে দিনে পাঁচ রুবল মজুরী আদায় হতে পারে।

খাবার ছুটি হয়েছে এখন। খেতে বসবে প্লাতোনোব। কে-এক ছোঁড়া, খালি পা, ময়লা চীরকুট গায়ে, ছুটে এসে বলে: "তোমাদের মধ্যে কার নাম গো প্লাতোনোব?"

—"আমার নাম। তা তোকে কী নাম ধরে সবাই ক্ষেপায় রে ছোঁড়া?"

—"হোই হোথা গির্জের পেছনে এক স্যায়না মেয়েছেলে ডাকতেছে তোমায় গো···এই যে চিঠি!"

—"হুঁ-উঁ-উঁ"!!!"—হ্রেষারব করে ওঠে দলশুদ্ধ সবাই।

—"কৈ, দেখি চিঠিখানা!"—হাত বাড়ায় প্লাতোনোব।

জেনকার চিঠি, কাঁচা হাতে লেখা, গণ্ডায় গণ্ডায় বানান ভুল:

"সেরেজেই ইবানিচ, বীরকৃত করছি ক্ষমা কর। জরুড়ি কতা আচে। মাত্তর দশ মিনিটের যন্নে এস। স্নানা মারকোবনার বারির 'জেনকা'।"

উঠে দাঁড়ায় প্লাতোনোব, আবোরোৎনীকে বলে, "এক্ষুণি আসছি, কাজ সুরু হবার আগেই ফিরে আসব।"

—"যাচ্ছ, যাও!"—আলস্যভরে বিদ্রূপের সুরে অনুমতি দেয় সর্দার: "তবে এসব কারবারের জন্যে রাতই তো রয়েছে হে।···যাও, যাও কে, আর ধরে রাখতেছে তোমায়! তবে কাজের বেলায় না এলে তোমার রোজ কিন্তু কাটা যাবে। যারে হাতের নাগালে পাব তারে নিয়েই কাজ চালাব; আর যতগুলি তরমুজ সে ফাটাবে, সব তোমার নামে উশুল যাবে, কয়ে দিলাম।....আরে, তুমিও যে এমন হুমদো মিনষে তা জানতাম না মাইরি!"

গির্জার পেছনে অপেক্ষা করছিল জেন্‌কা.—নেহাৎ সাদাসিধে পোষাক পরণে; তবুও দূর থেকে দেখেই একথা না ভেবে পারলে না প্লাতোনোব: "বাঃ, বেশ মানিয়েছে তো জেন্‌কাকে! একবার যার চোখ পড়বে, বারবার পিছু ফিরে না চেয়ে থাকতে পারবে না সে কিছুতেই!"

—"কেমন আছ জেন্‌কা?"—জেন্‌কার হাত ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করে প্লাতোনোব: "তা এমন সময় কী মনে করে?"

জেন্‌কার মুখখানা বিষণ্ণ, গম্ভীর। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে—দেখেই বুঝতে পারলে প্লাতোনোব।

—"আমার এখনো খাওয়া হয়নি, জেনী। চলো, কাছেই একটা সরাইখানা আছে; সেখানে বসে খেতে খেতে নিরিবিলি সব শুনব'খন। তুমিও দাঁত দিয়ে কেটো কিছু—কী বলো?"

—"না আমি কিছু খাব না।"—ধরাগলায় জবাব দেয় জেনী: "বেশিক্ষণ আটকাব না তোমায়। একটা পরামর্শ চাই শুধু—আর কার কাছে যাব বলো, কেউ তো নেই আমার!"

—"বেশ, বেশ! চলো তবে। যা বলবে তাই শুনব। তোমায় বড্ড ভালোবাসি, জেন্‌কা!"

বিষণ্ণ কৃতজ্ঞ চোখে চায় জেন্‌কা: "তা জানি, সেরজেই ইবানিচ। তাই তো এলাম তোমার কাছে।"

—"টাকার দরকার না কি? খুলেই বলো না। হাতে এখন বেশি কিছু নেই বটে, তবে দল থেকে চাইলেই আগাম পাব'খন।"

—"না, তা নয়। চলো, ওখানে গিয়েই সব বলছি।"

সরাইখানায় এসে নিরিবিলি বসে দু'জন। খাবার আনতে হুকুম দিয়ে জিজ্ঞেস করে প্লাতোনোব: "বলো, জেনী, কী বলবে। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি কী যেন হয়েছে তোমার।"

রুমাল বার করে খুঁটতে থাকে জেন্‌কা, মাথা নীচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে একমনে। ওর অসহায় অবস্থা দেখে প্লাতোনোবই ফের কথা পাড়ে: "অমন দোমনা হচ্ছ কেন, জেনী? আমি তো তোমাদের পর নই। সব শুনলে হয়তো সৎ পরামর্শই দিতে পারব'খন। নাও, আর গড়িমসি না করে সিধে দাও জলে ঝাঁপ।"

—"সত্যি! কিন্তু কী বলব ঠাওর করতে পারছিনে। মানে, আমার অসুখ করেছে, সেরজাই—কালব্যাধিতে ধরেছে আমায়! বুঝেছ কথাটা?"

—"তারপর?"—

—"ব্যামোটা অনেক দিনই হয়েছে; এক মাসের ওপর হবে। ত্রিনীতির দিন প্রথম টের পাই।"

কপালটা একবার রগড়ে নেয় প্লাতোনোব: "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিনই জনকয়েক ছাত্রের সঙ্গে আমি তোমাদের ওখানে গেছলাম —না?"

—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, সেরজাই।"

—"আহা, জেন্‌কা!"—বিষণ্ণ ভর্ৎসনার স্বরে বলে প্লাতোনোব: "তাই বুঝি দু'জন ছেলের হয়েছিল এই রোগ। তোমার কাছ থেকেই তা হলে..."

—"হতে পারে।...কী করে জানব?...সেদিন আমার সঙ্গে কে কে ছিল?...দাঁড়াও, মনে পড়েছে—লম্বাটে গোছের একটি ছেলে, চোখে পাঁশনে; তোমার সঙ্গে কেবলই লাগছিল তার..."

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে হলো সোবাসনিকোব। সে-ই বটে।…তা সেটা কিছু নয়, সৌখিন ফুলবাবু একটি। তবে আর একটি ছেলের জন্যে বাস্তবিকই দুঃখ হয়—ঐ রামেশিস। ডাক্তাররা সব যখন বল্লে, এ রোগ আর সারবে না, দেশে গিয়ে তখন আত্মহত্যা করলে। লিখে রেখে গেছল: আমি আর মানুষের মধ্যে গণ্য নই। ক্ষণিক মোহের বশে ভালো না বেসেও একটি নারীতে উপগত হয়ে যে পাপ করেছি, স্বহস্তে তার শাস্তি গ্রহণ করলাম।…সত্যি! দুঃখ হয় তার জন্যে, জেন্‌কা!"

নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে জেন্‌কার: "আমার কিন্তু এতটুকুও দুঃখ হয় না।"

বয় এসে সামনে দাঁড়ায়; প্লাতোনোব তাকে চলে যেতে বলে, তারপর জেন্‌কাকে বলে: "দুঃখ হয় না তোমার? কেন? অবশ্য আত্মহত্যা আমিও পছন্দ করিনে। তবুও তার এ মৃত্যুর সামনে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াই আমি। উদার, বিচক্ষণ, সহৃদয় ছেলে ছিল সে। নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না।"

—"অত শত বুঝিনে আমি!"—রূঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে জেন্‌কা: "সবাইকে ঘৃণা করি আমি! শুধু একবার ভেবে দেখো দিকিনি—আমি কী! সমাজের আস্তাকুঁড় বৈ তো নই? সত্যি, প্লাতোনোব, এই যে হাজার হাজার লোক আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এয়েছে এতদিন, যদি পারতাম, ওদের লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দিতাম…"

—"ভারী বিদ্বেষিণী আর গরবিনী তুমি, জেনী!"—শান্তকণ্ঠে জবাব দেয় প্লাতোনোব।

—"না, এমনটি ছিলাম না আমি। তবে হ্যাঁ, এখন হয়ে পড়েছি। দশ বছর বয়স হতে না হতে আমার নিজের মা আমায় বেচে দেয়; সেই থেকে খালি হাতফেরতা হয়ে হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিন্তু কৈ, কেউ তো আমায় মানুষ বলে মানলে না কেনোদিন? সবার কাছেই ঘৃণ্য জীব, জঞ্জাল আমি—ভিখিরী, চোর, খুনেডাকাতেরও নীচে। একটা জল্লাদও আমায় দেখে থাকে করুণার চোখে, তাচ্ছিল্যের ভাবে। আমি হলাম গিয়ে বাজারে বেউশ্যে! বুঝেছ, সেরজাই, কী ভয়ঙ্কর কথা—'বা-জা-রে!' তার মানে, আমার বাপ নেই, মা নেই, জাতজন্ম বলেও কিছু

নেই,—স্রেফ 'বা-জা-রে! আচ্ছা, কেউ, কি একবারও এসে ভেবেছে: না, এও একটা মানুষ, এরও দুঃখদরদ আছে, বোধশক্তি আছে। কাঠ-খড়ের পুতুলটি নয় এ!...তবুও এই সব মেয়েদের মধ্যে বোধহয় একা আমিই বুঝি আমাদের এই পঙ্কিল জীবনের ভয়াবহ দুরবস্থার কথা। সত্যি, প্লাতোনোব, আর কেউ কিচ্ছু বোঝে না; জ্যান্ত মাংসপিণ্ড সব! আমার এ বিদ্বেষের চেয়ে সে আরও খারাপ।..."

—"ঠিকই বলেছে, জেনী। কিন্তু এর তো কোনো জবাব নেই। কে..."

—"না, না, কেউ নয়, কেউ নয়!...মনে পড়ে তোমার সেই যে এক ছোকরা এসে লিউব্‌কাকে বার করে নিয়ে গিয়েছিল?"

—"মনে পড়ে বৈ কি! তা কী হয়েছে তার?"

—"কী আর হবে! এই তো সবে কাল বেচারী জলে ভিজে, চীরকূট গায়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির! দিয়েছে তাড়িয়ে..."

—"এও কি সম্ভব!"

—"তাই বোঝো একবার! সত্যি, প্লাতোনোভ, এ অবধি শুধু এক-জন পুরুষমানুষই চোখে পড়েছে আমার যে দুঃখদরদ বোঝে, যার প্রাণে মায়ামমতা আছে—মদ্দা কুকুরের মতো ছোঁক ছোঁক প্রবৃত্তি নেই যার,—সে হচ্ছ তুমি। কিন্তু তা হ'লে কী হবে? তুমি হচ্ছ আলাদা জাতের মানুষ। কেমন যেন! খালি টো টো করে বেড়াচ্ছ—কিসের খোঁজে...। দোষ নিয়ো না, সেরজাই, তুমি একটি কচিখোকা।...আর তাইতেই তো আসতে পেরেছি তোমার কাছে..."

"যাক, কী বলছিলে বলো, জেন্নেচ্‌কা..."

—"আর তাই, ব্যামোটা ধরতে পারলাম যখন, রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম।...ভাবলাম: এই তো শেষ, তবে আর দুঃখদরদ কিসের, আশাভরসা কেন, সবই তো ফুরিয়েছে। এতদিন যা সয়ে এসেছি তার বদলে আমারও কি কিছু দেবার নেই? এ সংসারে কি বিচার নেই? প্রতিশোধের জ্বালাও কি প্রাণ ভরে মেটাতে পারব না? স্নেহ, ভালবাসা কিছুই তো পেলাম না এ জীবনে...বাড়ীর যত্ন-আত্তি রূপকথা আমার কাছে; ওরা আসে, খেঁকী কুকুরের মতো তু তু ক'রে

কাছে ডাকে, আদর করে পিঠ চাপড়ায়, তারপর বুটশুদ্ধ মাথায় লাথি ...যাঃ, ভাগ! ওদেরই মতো মানুষ আমি, তাকে ওরা করে তুলেছে কি না ঘর পোঁছার ন্যাতা, ওদের পঙ্কিল লালসা নির্গমের নর্দমা! তবু ওদেরই দেওয়া এ রোগ মাথা পেতে নিতে হবে?.... উঃ!...কিন্তু কেন? আমি কি ক্রীতদাসী? বোবা? ভারবাহী জন্তু?...তাই, প্লাতোনোব, তখন আমি ঠিক করলাম...সবাইকে দেব এ রোগ...ছেলে, বুড়ো, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত...কাউকেই বাদ দেব না।"

প্লাতোনোব অনেকক্ষণ হলো খাওয়া বন্ধ করে বসে ছিল,...একদৃষ্টে চেয়ে ছিল জেন্‌কার মুখের দিকে; জীবনে কত দুঃখ, কত কদর্য বীভৎসতা, কী হিংস্রতাও, তো দেখে এসেছে সে, তবুও এমন পুঞ্জীভূত তীব্র ঘৃণা....এমন প্রচণ্ড বিদ্বেষ আর কখনো বুঝি দেখেনি; আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বসে ছিল সে। জেন্‌কার কথা শেষ হতে সামলে, নিয়ে বল্লে: "একজন নামকরা লেখক এ রকম একটা ব্যাপারের উল্লেখ করেছেন; প্রুশিয়ানরা একবার ফরাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে। তারপর পুরুষদের ধরে ধরে গুলি করে মারতে থাকে, আর মেয়েদের 'পরে চালায় বলাৎকার! ঘরবাড়ী লুঠপাট করে, মাঠ জ্বালিয়ে দিয়ে, দেশ ছারখার করে দিতে থাকে তারা। তখন একটি সুন্দরী ফরাসী রমণী স্বেচ্ছায় রতিজ রোগ গ্রহণ ক'রে, প্রতিশোধ নেবার জন্যে দলে দলে জার্মান সৈনিকদের অঙ্কশায়িনী হয়ে তাদের মধ্যে ছড়ায় ঐ কালব্যাধি। হাসপাতালে মরবার সময় মেয়েটি গর্বে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সব কথা খুলে বলে যায়।[১]...তা, তারা ছিল শত্রুপক্ষ, দেশকে করেছিল পদদলিত, হত্যা করেছিল ওর ভাইদের।...কিন্তু তুমি, তুমি জেন্নেচ্‌কা!..."

—"তার আগে জিজ্ঞেস করি, সেরজাই, ধর্ম সাক্ষী করে বলো দিকিন! যদি পথের 'পরে দেখতে পাও একটি শিশু ধুলোয় গড়াচ্ছে, কেউ হয়তো পাশবিক অত্যাচার করে গেছে তার 'পরে...ধরো না হয়, তার চোখদুটো উপড়ে নিয়েছে, কানদুটো কেটে নিয়ে গেছে, আর যদি জানতে পার লোকটা এই মুহূর্তে তোমারই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে,

১ গী দ্য মোপাসাঁর একটি গল্প।

আর ভগবান বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি ঠিক সেই মুহূর্ত-টিতে স্বর্গ থেকে চেয়ে রয়েছেন তোমার দিকে—তবে তুমি, তুমি তখন কী করবে, সেরজাই ?”

—“বলতে পারি নে ; হয়তো খুন করে ফেলি তাকে।”

—“আবার ‘হয়তো’ কেন ? নিশ্চয়ই। আমি জানি, বুঝতে পারছি তোমার মনের কথা। বেশ, এখন ভেবে দেখো : আমাদের প্রত্যেকের ’পরেই শিশুকালে হয়েছে এ অত্যাচার।...কেন, সেরজাই, তুমিই তো সেদিন বলেছিলে—আমরা সব শিশু।...আর এ কথা ভেবো না, সেরজাই, যে একা আমার ’পরে অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নিচ্ছি আমি। না, তা নয়। আমি আমাদের সবার ’পরে অত্যাচারেরই প্রতিশোধ নিই। বলো, ঠিক করছি কি না ?”

—“কী জানি, জেন্নেচ্‌কা ? কী করে বলি বলো ?”

—“কিন্তু তাও আসল কথা নয়। এতদিন মনে আমার দুঃখ ছিল না; নির্বিকার চিত্তে এ বিষ ছড়িয়ে চলেছিলাম। কিন্তু কাল একটি ছেলেকে দেখে হঠাৎ কেন যেন বড়ো মায়া হলো—মনে হলো এ তো এক হাবাকে ঠকিয়ে পয়সা নেওয়ার সামিল, অন্ধকে আঘাত করার মতো, ঘুমন্ত লোকের গলায় ছুরি বসানো। ছেড়ে দিলাম তাকে, কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল সে। সংসারময় যে এ রোগ ছড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখে আসছিলাম এতদিন, তা ভেঙে গেল। দিশেহারা হয়ে পড়েছি আমি। তুমি তো কত জান, দেখেছ শুনেছও কত ; আমায় ভবিষ্যতের সন্ধান বলে দাও, সেরজাই।”

—“বুঝতে পারছিনে, জেন্নেচকা। জানলে বলতুম বৈ কি ! কিন্তু এ আমার বুদ্ধির অতীত, বিবেকেরও নাগালের বাইরে।”

—“কিন্তু আমিও যে বুঝতে পারছিনে, সেরজাই।”—বিমূঢ় ভাবে আঙুল মটকায় জেনী : “তবে যা ভেবে এসেছি এতদিন—সব ভুল। এখন শুধু একটি পথই খোলা রয়েছে আমার জন্যে। আজই সকালে...”

—“না, না, জেনী ! দোহাই তোমার !...ও সব করতে যেও না,” —ব্যাকুল হয়ে ওঠে প্লাতোনোব : “পথের সন্ধান যদি জানা থাকত আমার, তা যত দুরূহই হোক না কেন, বলতে ভয় পেতাম না। কিন্তু

এতে কোনো লাভ নেই। তবে···হ্যাঁ···একটা পথ বাতলে দিতে পারি। তা এর চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়; বরং তাতে করে বোধকরি তোমার ক্রোধশান্তি হবে শতগুণ।"

—"কী?"—শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে জেনী; উত্তেজনার পর ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে এখন সে।

—"শোনো: এখনো তোমার রূপযৌবন আছে। সত্যি, তুমি বড়ো সুন্দরী, জেনী! ইচ্ছে করলে লোককে বিভ্রান্ত করে দিতে পার। কিন্তু জান না বোধহয় কী প্রচণ্ড শক্তি এর। অনায়াসেই তুমি পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পার; সৌভাগ্যক্রমে নিজে রোগমুক্তও হ'তে পার। তোমার একটি অঙ্গুলি-হেলনে শত শত লোক ছুটে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়বে—থাকবে তোমার ক্রীতদাস হয়ে, পোষাপ্রাণীটি হয়ে।···লাগাম কষে ধরবে তখন, হাতে তুলে নেবে চাবুক। ধ্বংস করো তাদের!···দেখো, জেনী, এ সংসারটা তো মেয়েদেরই হাতে। কাল যে ছিল ঝী, যাত্রাদলের সখী, আজ সে লক্ষপতিনী। প্রায় নিরক্ষর নারীও হয়েছে একটা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী। রাজপুত্রও বিয়ে করেছে পথচারিণীকে কিংবা তার পূর্বতন রক্ষিতাকে।··· জেন্নেচকা, তোমারও প্রতিহিংসা চরিতার্থের অপরিসীম ক্ষেত্র রয়েছে; আমি তখন দূর থেকে দেখে তোমায় তারিফ করব।···তুমি, তুমি হ'লে সেই ধাতুতে গড়া—শিকারী বাজপক্ষিণী, সর্বনাশী···"

—"না, সেরজাই,"—ম্লানহাসি হেসে বলে জেন্‌কা: "আমিও ভাবতাম তাই···কিন্তু আমার ভেতরটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একেবারে, আর কোনো শক্তি নেই, সাধ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই।··· ভেতরটা আমার আজ একদম ফাঁপা, পচা···। এক এই প্রতিহিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই আজ। তা সে প্রতিহিংসাও আজ আমারই মতো পঙ্গু, সেরজাই।···আবার একটি ছোট ছেলে চোখে পড়বে, আবার মায়া হবে, আবার দেব নিজেকে শাস্তি।···না, না, তার চেয়ে এই ভালো···এই ভালো!···"

নীরব হয়ে পড়ে জেনী। প্লাতোনোবও নির্বাক—কী বলবে সে? বলবার কী আছে! কেটে যায় কতক্ষণ।

হঠাৎ উঠে পড়ে জেনী ; প্লাতোনোবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে : "বিদায়, সেরজাই ইবানোবিচ ! ক্ষমা করো, সময় নষ্ট করলাম তোমার…।"

—"তাই ব'লে কিছু করে বসো না, জেন্নেচ্‌কা ! মিনতি রাখো…"

চকের বাইরে এসে বিদায় নেয় দু'জন। হঠাৎ পিছু ডাকে জেন্‌কা। ফিরে আসে প্লাতোনোব। "কাল আমাদের বৈঠকখানা ঘরে রলি-পলি হঠাৎ মারা গেছে ; লাফালাফি করছিল, হঠাৎ পড়ে যায়, আর ওঠে না…কোনো কষ্ট পায় নি। আচ্ছা, সেরজাই, আর একটা কথা…শেষপ্রশ্ন আমার…ভগবান আছেন, না, নেই ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্লাতোনোব : "কী বলব ? জানি নে তো। মনে হয় আছেন, তবে আমরা যে-ভাবে কল্পনা করে থাকি তেমনটি নন তিনি। আরও জ্ঞানবান, আরও ন্যায়বান তিনি…"

—"আর পরলোক ? মরণের পরপারে ? মানে, এই যেমন শুনতে পাই, এর পর স্বর্গ, না নরক ? না, সব ফাঁকা ? সুষুপ্তি ? চির অন্ধকার নিলয় ?"

চুপ করে থাকে প্লাতোনোব, চোখ তুলে চাইতে পারে না জেনীর দিকে। "কী জানি !"—শেষ অবধি কোনো রকমে বলে ওঠে সে : "তোমায় মিছে কথায় ভোলাতে চাই নে, জেনী।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে জেন্‌কা, করুণ বাঁকা হাসি হাসে : "ধন্যবাদ ! কল্যাণ হোক তোমার ! এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আচ্ছা, বিদায়…"

প্লাতোনোব একেবারে ঠিক সময়টিতেই ফিরে এল। "যাক, সময়-মতো এসে পড়েছ তা হলে,"—খেঁকিয়ে ওঠে জাবোরোৎনী : "আর একটু দেরি হলেই দিতাম ঘাড় ধরে বের ক'রে।…যাও, জায়গায় গিয়ে পড়ো গে, যাও !" পরে নরম হয়ে বলে : "তা, তুমি তো বেড়ে কাজের লোকই, সেরেজ্‌কা !…তবে যদি রাতের বেলা হতো ; তা নয়, দেখলে সব, ও কি না দিনদুপুরেই যায় ঘোমটার আড়ে খেমটা নাচ নাচতে…"

—পাঁচ—

শনিবারটা হচ্ছে ডাক্তারী পরীক্ষার দিন। বাড়ীময় সাজ সাজ রব; এসেন্স-সাবানের শ্রাদ্ধ; পরণে সব ধোপদুরস্ত সৌখিন আণ্ডারওয়ার। রাস্তার দিকের জানলা সব বন্ধ। মেয়েগুলো সব ভয়ে মরে: যদি কোনো রোগ বেরিয়ে পড়ে, অজান্তে। ও মা, কী ঘেন্না! কী লজ্জা! আর, ওরে বাবা, সেই হাসপাতাল! কেবল বড়ো মান্‌কা, জো, আর হেন্‌রিয়েটা—ঘাগী বুড়ো মেয়েরা সব—দিব্যি নিশ্চিন্দি। বড়ো মান্‌কা তো খোলাখুলিই বলে: "ও সব আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে, বাপু?"

জেন্‌কা আজ সকাল থেকেই কেমন মনমরা হয়ে আছে; ভাবছে কী যেন। ছোট মান্‌কাকে উপহার দিয়েছে একটা সোনার ব্রেসলেট, নিজের ফটো-বসানো লকেটওয়ালা হার একগাছা, আর কাঁধে ঝোলা-বার রূপোর ক্রুশ একটা। তামারাকে গছিয়ে দিয়েছে দুটো আঙটি—স্মারক হিসেবে।

—"আমার আণ্ডারওয়ারখানা আন্নুশ্‌কা ঝীকে দিয়ে দিস্, তামারা; যেন ভালো করে কেচে নিয়ে আমার কথা ভেবে পরে।"

তামারার ঘরেই বসে আছে দু'জন। সকালবেলায়ই মদ আনিয়েছে জেন্‌কা; আস্তে আস্তে তাই গেলাসের পর গেলাস খেয়ে চলেছে সে। অবাক হয়ে ভাবছে তামারা—যে-জেন্‌কা দু'চোখে মদ দেখতে পারে না, নেহাৎ উপরোধে ঢেঁকী গেলার মতো একটু-আধটু ঠোঁটে ছোঁয়ায় কালেভদ্রে, সে আজ মাতাল হবে নাকি!

—"তুই আজ কী আরম্ভ করেছিস, জেন্‌কা? মরবি, না বিবাগী হবি ঠিক করেছিস?"

—"হ্যাঁ রে, ছেড়েই যাব তোদের। বড়ো শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, তামারোচ্‌কা!"

—"তা, কে-ই বা আর সুখের মুখ দেখলে এখানে, বল?"

—"না, তা নয়। ঠিক যে শ্রান্তি তা নয়, কিন্তু কেন যেন সব কিছু

অর্থহীন হয়ে পড়েছে আমার কাছে।....এই যে তোকে দেখছি, এই যে টেবিলটা আমার হাত-পা, সবই সমান ঠেকছে, সবই যেন নিরর্থক···, এই পুরোনো ছবির মতো সব। ঐ যে সেপাইটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? কে যেন ওর কলে ·চাবি দিয়ে দিয়েছে, তাই ও পুতুলের মতো ঘুরছে ফিরছে। বৃষ্টিতে ভিজছে ও—ভিজুক! একদিন তো মরতেই হবে। ও মরবে, আমি মরব, তুই মরবি, তামারা। তা এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভয়ই বা কী?"

চুপ করে জেন্‌কা, এক চুমুক মদ খেয়ে নেয়; তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে: "আচ্ছা, তামারা, তোকে কক্ষনো জিজ্ঞেস করিনি, কিন্তু তুই এখানে এলি কী করে? তুই তো আমাদের কারুর মতো ন'স। এত জানিস শুনিস···ফ্রেঞ্চ অবধি—সেই যে! অথচ তোর কথা আমরা কিচ্ছুই জানিনে। তুই কে, বল তো!"

—"জেনী, লক্ষ্মীটি, এমন কিছুই নয় সে···আর পাঁচজনেরই মতো জীবন···বোর্ডিং স্কুলে পড়েছি; গুরুমা ছিলাম; উপাসিকার দলে গাইতাম; চাঁদমারি চালিয়ে এয়েছি; এক ঠগের সঙ্গে মিশে বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছিলাম, সার্কাসের দলের সঙ্গে ঘুরেছি—মেয়েমদ্দ সেজে খেলা দেখাতাম। চমৎকার বন্দুক ছুঁড়তে পারতাম আমি।···তারপর এসে ঢুকি এক মঠে। দু'বছর ছিলাম সেখানে।···অনেক কাণ্ড-কারখানার মধ্যে দিয়ে এসেছি···সব মনেও পড়ে না। আর হ্যাঁ,··· চুরিও করেছি···"

—"অনেক কিছুই করেছিস তা হ'লে—দাবার বোড়ের মতো!"

—"হ্যাঁ। তা মেঘে মেঘে বেলাও তো কম হলো না। আচ্ছা, বল তো কত বয়েস হবে আমার?"

—"কত আর? বাইশ···চব্বিশ!···"

—"না, আমার মাণিক! গত হপ্তায় বত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছি। এখানে সব চেয়ে বুড়ী মেয়ে হচ্ছি আমি। তবে কোনো কিছুই গায় মাখি নে···মদও খাইনে, আর শরীরের খুব যত্ন নিই আমি। আর সব চাইতে বড়ো কথা—কাউকে নিয়েই মেতে উঠিনে কখনো···"

—"কেন, সেন্‌কা?"

—"সেন্‌কা—ও আলাদা জিনিস। আর জানিসই তো, মেয়েমানুষের প্রাণ বড্ড আড়বুঝো, বোকা···ভালোবাসা নইলে কি বাঁচে রে! তবুও ঠিক যে ভালোবাসি ওকে তা নয়···এম্নিই, মানে, মনকে চোখঠারা আর কী! তা, সেন্‌কাকে শীগ্‌গিরই আমার দরকারও হবে।"

হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে ওঠে জেন্‌কা: "কিন্তু, এখানে এলি কী করে? এই নরকে? এত বুদ্ধিশুদ্ধি, এমন চেহারা, এমন বলিয়ে-কইয়ে···"

—"সে বলতে গেলে আজ আর ফুরোবে না···আর জানিসই তো বড্ড কুঁড়ে আমি।···তা, ভাই, এখানে এয়েছি মানের দায়ে: একটি ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি বিপ্লবে। জানিসই তো মেয়েমানুষের প্রাণ: ভাবের মানুষ যেথায় যাবে, সেও পিছু নেবে ছায়ার মতন···। বিপ্লবে বিশ্বাস ছিল না আমার, তবু না গিয়ে পারলাম না। চমৎকার দেখতে-শুনতে ছিল সে, বলিয়ে-কইয়েও বেশ।···শেষ অবধি বিশ্বাসঘাতকতা করলে সে, সঙ্গীদের নাম ফাঁস করে দিলে পুলিশের কাছে। আসলে ছিল সে গোয়েন্দা। তাকে তখন ওরা খুন করে ওর জারিজুরি সব্ বার করে দিলে, আমারও ভুল ভাঙল। কিন্তু আমার তখন লুকিয়ে থাকা দরকার···পাশপোর্ট বদলালাম। ওরা সব পরামর্শ দিলে—হলদে টিকিটের আড়ালে লুকোনো সব চেয়ে সোজা···সেই থেকে সুরু হয়েছে এখানকার পালা।···তা, এখানেও চরে বেড়াতে এয়েছি শুধু, সময় হলেই কেটে পড়ব।"

—"কোথায়?"

—"কেন, পৃথিবীতে কি জায়গার অভাব!···ভালোবাসি আমি জীবনকে···তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই।···কিন্তু জানিস, জেন্নেচ্‌কা, চুরি-বিদ্যেতে বড্ড টান আমার···সাহসের কাজ, ভয়ের কাজ, কঠিন, আর কেমন যেন নেশা আছে ওতে···। এই খেলাতেই প্রাণ টানছে আমার। আমি বেশ সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, আর শিক্ষিতা মহিলার মতো ভাব ধরতে পারি, ভুলে যা সে সব। একেবারে আলাদা রে আমি, একদম আলাদা জাতের।"—হঠাৎ চোখদুটো জলজ্বল করে ওঠে তামারার: "আমার মধ্যে শয়তানী বাসা বেঁধে আছে রে!"

—"তবুও তোর প্রাণে আশা আছে, কিন্তু আমার ভেতরটা পুড়ে

ছাই হয়ে গেছে।…পঁচিশ বছর বয়স হলো আমার, কিন্তু বুড়ী হয়ে গেছি, এক পা কবরে। যদি হিসেব করে চলতাম…উঃ!…"

—"কী যে বলিস, জেনী! তোর মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্য : তোর আছে সেই অদ্ভুত শক্তি যার সামনে পুরুষরা স্বেচ্ছায় এসে নতশির হয়। তুই-ও বেরিয়ে পড় এখান থেকে। আমার সঙ্গে নয়—সর্বদাই একাকিনী আমি—নিজেই বেরিয়ে পড় তুই।"

নীরবে দু'হাতে মুখ ঢাকে জেনকা।

—"নাঃ, সব গেছে,"—অনেকক্ষণ পরে বলে ওঠে সে : "ফতুর হয়ে গেছি আমি : কপাল পুড়েছে আমার, আমি আর আমাতে নেই! অ্যাঁ!"…হতাশার ভঙ্গি করে জেনকা, নিজেকেই ডেকে বলে : "নে জেন্নেচকা, আর একটু মদ খা! আর, একটু লেবুর রস চুষবি আয়! থুঃ, কী বিশ্রী! আন্নুশ্‌কাটা যত সব বাজে মাল আনে কোত্থেকে রে বাবা! খালি পয়সা জমাচ্ছে ছুঁড়ী! বললে বলে : 'জমাচ্ছি বিয়ের জন্যে। আমার বর আমায় যখন নিখুঁৎ মেয়েটি পাবে কী সুখীই হবে সে! তার ওপর আবার কয়েকশো টাকা!' মেয়েটা সুখী!… আমার বাক্সে কয়টা টাকা আছে, তা ওকে দিয়ে দিস, ভাই তামারা!"

—"তোর মতলবখানা কী বল তো?"—তীক্ষ্ণ উৎ'সনার সুরে জিজ্ঞেস করে তামারা : "মরতে যাচ্ছিস নাকি, না আর কিছু?"

—"না, এম্নি বলছি, ভালোমন্দ যদি একটা কিছু ঘটে…হাস-পাতালেও তো নিয়ে যেতে পারে!…আর, হ্যাঁ, সত্যিই যদি একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে রোখ চাপে আমার তবে তুই কি তাতে বাধা দিবি, তামারোচকা?"

স্থির, গম্ভীর, শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয় তামারা তার দিকে। জেনীর চোখদুটো বিষণ্ণ—শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে যেন। প্রাণের আগুন নিবে গেছে সে চোখ থেকে।

—"না,"—ধীরে ধীরে দৃঢ়কণ্ঠে বলে তামারা : "যদি ভালোবাসার জন্যে হতো বাধা দিতাম ; টাকার জন্যে হলে, বলে-কয়ে বুঝিয়ে প্রতি-নিবৃত্ত করতাম : কিন্তু এমনও বিষয় আছে যাতে বাধা দেওয়া উচিত নয় কারো। অবিশ্যি, সাহায্য আমি করব না ; কিন্তু ধরেও রাখব না।"

যোসিয়ার গলা শোনা যায়: "ডাক্তার এয়েছে গো! তৈরি হয়ে নাও।"

—"তুই যা, তামারা। আমি কাপড় ছেড়ে আসি গে, ভাই। এর মধ্যে যদি ডাক পড়ে—ডাকিস আমায়।"

তারপর চলে যেতে যেতে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে তামারাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর আদর করে চলে যায় জেনী।

সরকারী ডাক্তার ক্লিমেনকো একটা ছোট টেবিলের 'পরে যন্ত্রপাতি আর ঔষধপত্র সব গুছিয়ে রাখছেন। পাশে টিকিটগুলো সব জমা হয়েছে। মেয়েদের পরণে শুধু সেমিজ। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আনা মারকোব্না নিজে, তার পেছনে এম্না এডোয়ার্ডোব্না আর যোসিয়া।

বয়স হয়েছে ডাক্তারবাবুর। চোখে পাঁশ-নে লাগিয়ে নামের ফর্দ দেখে হাঁক দেন: "আলেকজান্দ্রা বুদ্জিনস্কায়া!"

এগিয়ে আসে নীনা—লজ্জায় রাগে কোঁচকানো ভ্রূ; টেবিলের 'পরে উঠে শোয়। পাঁশ-নের ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে দেখেন ডাক্তারবাবু: "ঠিক আছে, যাও।" তারপর ওর টিকিটের উল্টো পিঠে লেখেন তিনি: "২৮শে আগষ্ট, সুস্থ।"

—"বোশচেন্‌কোবা আইরীন!"

এবার লিউব্‌কার পালা। এই দেড় মাস বাইরে কাটিয়ে এসে অভ্যাস বদলে গেছে তার। ডাক্তারবাবু হাত দিয়ে তার সেমিজখানা তুলে দেন বুক অবধি; আনকোরা মেয়েটির মতো মরমে মরে যায় সে, লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে একেবারে।

তার পর জো-এর পালা। তারপরে ছোট মানকার। তামারারও হয়ে যায়। পরে নিউর্‌কা—গনোরিয়া হয়েছে তার, তক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাবার হুকুম হয়।

একের পর এক পরীক্ষা চলতে থাকে। আজ বিশ বছর ধরে হপ্তায় হপ্তায় এ কাজ চালিয়ে আসছেন ডাক্তারবাবু, হাত পেকে গেছে, কোনো রকম চাঞ্চল্য নেই, কৌতূহল নেই, কিছুই নেই: রয়েছে শুধু খোলা তলপেট, খালি পিঠ, আর হাঁ-করা মুখ। পরে এদের কাউকে রাস্তায় দেখলে চিনতেও পারবেন না তিনি।

—"মুসায়া রেইৎজিনা!"

কেউ এগিয়ে আসে না টেবিলের ধারে।...মেয়েরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি আর ফিসভাস সুরু করে দেয়।

—"জেন্‌কা...কোথায় জেন্‌কা! ..." মেয়েদের মধ্যে সে তো নেই। তামারা এগিয়ে আসে: "এখানে নেই সে। এখনো তৈরি হয়ে নিতে পারেনি। আমি গিয়ে ডেকে আনছি, ডাক্তারবাবু।"

দৌড়ে যায় তামারা। কিন্তু কৈ, ফেরার নামটিও তো করে না! এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না চল্ল তখন; তারপর যোসিয়া; তারপর অন্য ক'জন মেয়ে; শেষে আনা মারকোব্‌না নিজে।

—"ছোঃ! এ কী কেলেঙ্কারী!"—দরদালান দিয়ে যেতে যেতে বলে এম্‌মা: "সব সময়ই এই জেন্‌কা আর জেন্‌কা!...আর পেরে উঠিনে, বাপু..."।

কিন্তু জেন্‌কা কোথাও নেই—তার নিজের ঘরেও নয়, তামারার ঘরেও নয়। আর সব ঘরও খুঁজে দেখা হলো, আনাচে কানাচে সব। কিন্তু কৈ সে!

—"পায়খানায় গিয়ে বসে নেই তো?"—আন্দাজ করে জো।

তা হবে! ভেতর থেকে দোর বন্ধ। এম্‌মা গিয়ে দোরে ঘুঁসি মারে: "জেনী, বেরিয়ে এসো শীগগির! এ কী পাগলামো?" উত্তর নেই। গলা চড়ায় তখন: "কী রে শূয়ারণী, শুনতে পেলি? আয়, এক্ষুণি বেরিয়ে আয়—ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে।"

তবুও কোন উত্তর নেই। সবাই এ ওর মুখের দিকে চায়—সবার মনে একই ভয়। দরজার হাতল ধরে টানে এম্‌মা, দরজা খোলে না।

—"সাইমনকে ডাক দে!"—আনা মারকোব্‌না হুকুম করে।

সাইমনকে ডাকা হলো। একটা কিছু ঘটেছে—সবার মুখ দেখেই বুঝলে সে। তাই তার বিদ্যে ফলাবার জন্যে ডাক পড়েছে। সব কথা শুনলে সে। তারপর দরজার হাতল ধরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দিলে এক চাড়। হাতলখানা হাতেই রয়ে গেল। "দেখি, একখানা রুটিকাটা ছুরি।"—তারপর দরজার ফাটল দিয়ে ছুরিখানা গলিয়ে দিয়ে হুড়কো খুলে ফেল্লে সে।

ভেতরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে জেন্‌কা!

মুখখানায় কে যেন লালনীল কালি ঢেলে দিয়েছে। জিব বেরিয়ে পড়েছে, আর জিবের 'পরে কেটে বসেছে দু'পাটি দাঁত। যে আলোটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তা মেজেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কে যেন কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের পাল কাঁদতে কাঁদতে দরদালান দিয়ে পড়িমরি করে এল ছুটে।

হৈ চৈ শুনে ডাক্তারবাবুও এলেন—ধীরে সুস্থে। তাঁর এত দিনকার ডাক্তারী জীবনে এ সব কাণ্ড দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে তাঁর; মানুষের দুঃখকষ্ট, যাতনাবেদনা, মৃত্যু—কিছুই আর বিচলিত করতে পারে না তাঁকে।

জেন্‌কার প্রাণহীন দেহ নামিয়ে এনে তারই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারবাবু কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সুরু করলেন। খানিকক্ষণ বাদেই সে চেষ্টা ত্যাগ করতে হলো: "নাঃ! পুলিশকে খবর দাও।"

আবার আসে বারকেশ। নির্জনে বসে বাড়ীউলীর সঙ্গে অনেকক্ষণ অবধি কী সব ফিসফাস হয়; তারপর আবার তার পকেটে গিয়ে ঢোকে একশো রুবলের একখানা নোট। পাঁচ মিনিটেই জবানবন্দী তৈরি হয়ে যায়। গাড়ী ডেকে মাদুর চাপা দিয়ে লাস চালান দেওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্যে।

এম্মা এডোয়ার্ডোব্‌নাই সর্বপ্রথম কুড়িয়ে পায় টেবিলের ওপর থেকে জেন্‌কার লেখা চিঠি। কাঁচা হাতের গোল গোল লেখা, কিন্তু দেখে বেশ বোঝা যায়—শেষমুহূর্তেও লিখতে গিয়ে হাত কাঁপেনি তার: "আমার ম্রিত্তুর যন্নে কেউ দায়ী নয়। আমি মরছি, কেন না আমায় রোগে ধরেছে, আর লোকেরা সব সয়তান, আর বেঁচে থাকা কষ্টকর। আমার জিনিসপত্তর কাকে কী দেয়া হবে তামারা সব জানে খুঁটিয়ে বলে গেছি তাকে।"

তামারা আরও ক'জন মেয়ের সঙ্গে সেখানেই ছিল। এম্মা ঘুরে দাঁড়ায় তার দিকে, চোখে তার ক্রূর ঘৃণা, ফিসফিস করে চিবিয়ে চিবিয়ে

বলে : "তবে রে হতচ্ছাড়ী, সবই জানতিস তুই!...জানতিস, তবে বলিস নি কেন রে মাগী?..."

অভ্যাস মতো পিছু হেলে তাগ কষে এম্‌মা—তামারাকে মারবে ব'লে। হঠাৎ হাঁ হয়ে চোখ গোল গোল ক'রে সেই ভাবেই থমকে যায়। মেজে থেকে আস্তে আস্তে চকচকে লোহার কী-একটা তুলে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে তার নাকের ডগায় তুলে ধরে তামারা—গুলি করবে নাকি?

—ছয়—

সে দিনই সন্ধ্যায় আনা মারকোব্‌নার গণিকালয়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটল: সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি চলে এল এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌নার হাতে।

অবশ্য এ নিয়ে অনেকদিন থেকেই কানাঘুসো চলছিল। কিন্তু তা' বলে জেন্‌কার ঐ অপমৃত্যুর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই! হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েরা সব। এম্‌মাকে চেনে তারা। তা ছাড়া এও জানে যে-পনেরো হাজার রুবলে এম্‌মা কিনে নিলে সব, তার তিন ভাগের এক ভাগ হলো বারকেশের; সেও এখন হয়ে দাঁড়াল একজন ভাগীদার; অনেক দিন থেকেই এম্‌মার সঙ্গে মন কাড়াকাড়ির কারবার চলে আসছে তার।

সত্যি, একেবারে জলের দরে বেচে দিলে সব আনা মারকোব্‌না। তা সে শুধু ঐ বারকেশের ভয়েই নয়; আনা নিজেও আর পেরে উঠছিল না—বুড়ো হয়ে পড়েছে সে, প্রথম যৌবনের সে দেহবিলাসিনীর শক্তি আর নেই।...যাক্! এ ভালোই হলো। ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কে জমা ১,২০,০০০ রুবল। আর ঐ তো একটিমাত্র মেয়ে বাড়ি; দু'দিন বাদে বেশ বড়ো ঘরেই বিয়ে হয়ে যাবে। শেষ জীবনটা নির্ঝঞ্ঝাটে আরামেই কাটবে আনার।

তা ছাড়া এই যে রলিপলির আকস্মিক মৃত্যু, তারপর জেন্‌কার এই অপমৃত্যু—নাঃ, এ তো ভালো লক্ষণ নয়! সরে দাঁড়ানোই ভালো

এখন। কেন, এ তো অনেকেই জানে কোনো বাড়ীতে আগুন লাগবার আগে, কি কোনো জাহাজডুবি হবার আগে সেখানকার ইঁদুরগুলো সময় থাকতেই পালিয়ে যায়। আনাও করলে তাই। ভালোই করেছিল। কারণ জেন্‌কার ঐ অপমৃত্যুর পর থেকেই পর পর নানারকমের দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল সারা ইয়ামকায়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমেই মারা গেল আনা নিজে। তাই হয়। ত্রিশ বছরের একটানা কাজের পর শান্তিতে কাটানো অনেকেরই ভাগ্যে জোটে না। তারপর এক মাসের মধ্যেই গেল ইসাইয়া সাবিচ।

একমাত্র উত্তরাধিকারী হলো বার্ডি। বাড়ী আর শহরতলীর জমি বিক্রী করে নগদ টাকা করে নিলে সে; তারপর মনের মতো দেখে বিয়েও করলে একটি। তার ধারণা তার বাবার ছিল মস্ত বড়ো এক পমের কারবার। হায় রে!

সেদিনই জেনীর মৃতদেহ মর্গে চালান হয়ে গেছে। তবুও সন্ধ্যাবেলায় এম্‌মার আদেশে মেয়েদের সেই নিয়মিত সাজগোজ করে বসতে হলো। খানিক বাদে এম্‌মা স্বয়ং এসে ঢুকলেন বৈঠকখানা ঘরে—যেন রাজরাণী এয়েছেন দরবারে। বক্তৃতা সুরু হলো: "শোনো সব। আমি চাই···উঠে দাঁড়াও সব! আমি যখন কথা কইব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে সব বুঝলে?"

এ আবার কী! সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নতুন রাজ্যের নতুন নিয়ম। উঠে দাঁড়ায় সবাই; কী করবে বুঝতে পারে না কেউ।

—"হ্যাঁ, শোনো! আজ থেকে তোমরা আমায় কর্ত্রী ঠাকরুণের মতো মান্য করে চলবে। বুঝলে?—এই প্রতিষ্ঠান এখন আমার, এম্‌মা এডওয়ার্ডোব্‌না টিচ্‌জ্‌নার। আশা করি আমার বাধ্য থাকবে তোমরা। আর আমিও তোমাদের মায়ের মতোই দেখব। তবে হ্যাঁ কুঁড়েমি, মাতলামো, এসব আমি সহ্য করব না। আর অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতা এ সবও আমার দু'চক্ষের বিষ।···আমার ইচ্ছে ত্রেপেলকে হার মানানো। আমি চাই শুধু গণ্যমান্য অতিথিরাই এখানে আসুন। আমাদের মেয়েরা সব হবে সুন্দরী, মধুরভাষিণী, বিনয়ী, স্বাস্থ্যবতী, আনন্দময়ী। আসবাবপত্র আরো বাড়াতে হবে।···মনে রেখো,

পয়সাওয়ালা প্রবীণ লোকেরা পেশাদারী প্রেম পছন্দ করেন না। তাঁরা চান প্রেমকলা। সে বিদ্যে তোমরা শিখবে। 'ত্রেপেল'-এ প্রতিবারের দক্ষিণা হচ্ছে তিন রুবল আর সারা রাত্রের জন্যে দশ। আমি এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তোমরা প্রতিবারের জন্যে পাবে পাঁচ রুবল আর সারারাতের জন্যে পঁচিশ। তোমাদের রোজগার থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে তোমাদেরই ভবিষ্যতের জন্যে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে; টাকা সুদে বাড়বে। তারপর যদি কোন মেয়ে কোনো ভদ্রলোককে বিয়ে করতে চায় সে তখন অনায়াসে তার সে টাকা নিয়ে নিজের ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবে।···তবে ঐ যে বললাম, কুঁড়েমি, অবাধ্যতা, ঢলাঢলির জন্যে হবে কঠোর শাস্তি।··· আমার যা বলবার বল্‌লাম।—নীনা, শোনো এদিকে। তোমরাও সব পর পর এসো।"

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে নীন্‌কা; তার ঠোঁটের কাছে হাতের আঙুল এগিয়ে দেয় এম্‌মা; রাজরাণীর মতো হুকুম করে: "চুমু দাও!"

থতমত খেয়ে যায় নীন্‌কা; কিন্তু চট করে সাম্‌লে নিয়ে চুমু দিয়ে সরে যায়। তারপর জো, হেনরিয়েটা, ভান্দা—একে একে আসে সবাই; চুমু দেয়, সরে যায়। একা শুধু তামারাই আর্শীর দিকে পেছন ফিরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই আর্শী—জেন্‌কা প্রায়ই যেটায় মুখ দেখত।

কটমট করে চায় এম্‌মা তার চোখে চোখে। তামারা তবুও অবিচল। হাত নামিয়ে দিয়ে বলে এম্‌মা: "আর তামারা, তোমার সঙ্গে আলাদা দু'একটা কথা বল্‌তে চাই আমি; এসো!"

দু'জনে আলাদা একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে। হাত বাড়িয়ে সামনে বসবার একটা জায়গা দেখিয়ে দেয় এম্‌মা। দু'জনেই চুপচাপ। কেউই যেন কাউকে ঠিক ভরসা পায় না—দু'জনেই দু'জনকে চোখে চোখে রাখে।

শেষে এম্‌মাই কথা বলে: "তুমি ঠিকই করেছ, তামারা। তুমিও যে ঐ সব ভেড়ীর পালের মতো এসে হাতে চুমু দাওনি তাতে তুমি

সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। আর আমিও তোমায় চুমু দিতে দিতাম না। যদি তুমি কাছে আসতে আমি তোমার হাত ধরে সকলের সামনে তোমায় আমার প্রধান-পরিচালিকা বলে ঘোষণা করতাম—"

—"ধন্যবাদ…!"

—"না। বাধা দিয়ো না। আগে আমি বলি—পরে তোমার যা বলবার বোলো। আচ্ছা, কাল কেন হঠাৎ তুমি একটা রিভলবার আমার দিকে উঁচিয়ে ধরেছিলে? সত্যিই কি গুলি করতে?"

—"বরং তার উল্টো, এম্‌মা এডোয়ার্ডোব্‌না,"—সসম্মানে জবাব দেয় তামারা: "উল্টে আমারই বরং মনে হয়েছিল আপনিই আমায় মারবার জন্যে হাত উঁচিয়েছিলেন।"

—"আচ্ছা, তামারোচ্‌কা! তুমি কি বলতে পার, তোমার গায়ে হাত তোলা তো দূরের কথা, কোনদিন তোমাকে একটা শক্ত কথা বলেছি আমি? আমি জানি তুমি এই সব রুশিয়ান মাগীদের মতো ফোতো মেয়েমানুষ নও। তুমি বিদুষী, বুদ্ধিমতী; আদব-কায়দায় রীতিমতো দুরস্ত; লেখাপড়া আমার চাইতেও বেশি জান; গান-বাজনাতেও মন্দ নও।…সত্যি, তামারোচ্‌কা—সত্যি কথা বলতে কী—হ্যাঁ, সত্যি বলব তাতে কী হয়েছে—আমি তোমাকে ঐ যাকে বলে ভালোই বেসে ফেলেছি। আর, আর তুমিই চাও কিনা আমাকে খুন করতে। হায়রে!"

—"আপনি ভুল বুঝেছেন, এম্‌মা এডওয়ার্ডোব্‌না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে: জেন্‌কার বালিশের তলা থেকে আমি ঐ রিভলবারটা কুড়িয়ে পাই। পেয়ে আপনার কাছে নিয়ে আসি। আপনি তখন তার সেই চিঠিখানা পড়ছিলেন, তাই কোন কথা বলিনি। তারপর চিঠির থেকে আপনি মুখ তুলতেই রিভলবারটা আপনার দিকে এগিয়ে ধরি—আপনাকেই দেবার জন্যে। বলতে চেয়েছিলাম—'দেখুন, কী পেয়েছি।' সত্যি, এখনও আশ্চর্য লাগছে জেন্‌কার কাছে রিভলবার থাকতে ও গলায় দড়ি দিয়ে মরলে কেন?"

এম্‌মার মুখচোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল: ও, তাই বুঝি! হা ঈশ্বর! আমার কী ভুলটাই না হয়েছিল! তামারা, লক্ষ্মী আমার,

তোমার ছোট্ট, সুন্দর হাতদু'খানা রাখো আমার বুকে! এসো, বুকে এসো, চুমু দিই!" দু'হাত বাড়িয়ে দেয় এম্‌মা, তামাকে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকে কতক্ষণ! বেচারার প্রাণ যায় আর কী! আস্তে আস্তে ঘৃণাভরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তামারা।

—"হ্যাঁ, এখন কাজের কথা হোক!" এম্‌মা আরম্ভ করলো: "তুমি আমার প্রধান পরিচালিকা হবে। আমার লভ্যাংশের শতকরা ১৫ ভাগ তোমার। তা'ছাড়া সামান্য কিছু মাইনেও; ত্রিশ, চল্লিশ—আচ্ছা যাক্, পঞ্চাশ রুবলই মাসে। ঠিক তো? আমার স্থির-বিশ্বাস—আমার অন্তরের আশাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে তুমি ছাড়া আর কেউই সত্যিকারের সাহায্য করতে পারবে না আমায়। এ ছাড়া, তুমি—যখন খুসী—উঁচুদরের খদ্দেরদের ঘরে বসাতে পারবে। ইচ্ছে করলে, রুই-কাৎলাও খেলাতে পারবে। এই যেমন আমরা জার্মানে বলে থাকি…তা জার্মান জানো তো, অ্যাঁ?"

. দু'জনে তখন জর্মান ভাষায় কথাবার্তা সুরু করে; ভারী খুশী হয় এম্‌মা, চমৎকার জার্মান বলে তামারা। "বেশ, আপনার কথামতোই চলব।"—সায় দেয় সে।

—"আর একটা কথা।…ঐ ভাবের মানুষের কথা বলছি। তোমায় তার সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হতে বলছি নে; তবে সে এখানে যত না আসে ততই ভালো। তুমি তার সঙ্গে বাইরে বেরুতে চাও তো ছুটি দেবে; তবে যত তাকে এড়িয়ে চলতে পারবে ততই মঙ্গল। তোমারই ভালোর জন্যে বল্‌ছি। আর কিছুদিন অপেক্ষা করো—তিন-চার বছর। তখন এই ব্যবসা আরো ফেঁপে উঠ্‌বে। তোমারও দু'পয়সা হবে। তখন তোমাকে আমার পুরো অংশীদার করে নেব। তখনও তোমার যৌবন থাক্‌বে; আর তখন তোমার যত ইচ্ছে পুরুষমানুষ চাও—কিনো। সে বয়সে আর প্রেম-পাগলামি থাকে না। তখন তোমায় পছন্দ করার বদলে তুমিই বরং পুরুষমানুষ পছন্দ করতে পারবে। বুঝলে কিছু?"

চোখ নামিয়ে মুচ্‌কে হাসে তামারা: "খাঁটি কথা বলেছেন, এম্‌মা এডওয়ার্ডোব্‌না। বেশ, আমি তাকে এখানে আসতে দেব না।"

—"বেশ! বেশ! এসো তবে, চুমু দিয়ে কথা পাকা করে নিই।"

আবার সেই কঠিন চুম্বন, সুদৃঢ় আলিঙ্গন। তামারার নত চোখ, কোমল ভালোমানুষের মতো মুখখানা দেখে ছোট্ট খুকীটি বলে ভ্রম হয়।

"আপনার সব কথাই তো রাখলাম,"—শেষে মুক্তি পেয়ে বলে তামারা: "আমারও একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে। অবশ্য তাতে কিছু ক্ষতি নেই আপনার। আমাদের সবাইকে জেন্‌কার সঙ্গে গোরস্থানে যেতে অনুমতি দেবেন কিন্তু।"

মুখখানা যেন কেমন হয়ে যায় এম্‌মার।—"বেশ তো! তোমার যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে যেয়ো। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু গিয়ে কী লাভ হবে? গেলে সে কি ফিরে আস্‌বে? শুধু শুধু মন খারাপ করা। তার ওপর জান তো, যারা অপমৃত্যুতে মরে তাদের কবর হয় না, গোরস্থানের কাছেই একটা নোঙরা খাদের মধ্যে ফেলে দেয় বুঝি।"

—"তা হোক্। তবু যাব। আপনি রাগ করবেন না কিন্তু। তবে কথা দিচ্ছি এই আমার একটিমাত্র ভিক্ষা। এর পর থেকে একান্ত আপনারই অনুগত হয়ে চলব—কথা দিলুম।"

—"যাক। তোমায় 'না' বলতে পারিনে, বাছা।"

ঘরের দরজা খুলে হাঁক দেয় এম্‌মা: "সাইমন!"

সাইমন আসে। "শ্যাম্পেন আনো—বেশ ঠাণ্ডা দেখে। শীগ্‌গীর।"

—সাইমন চলে গেলে বলে: "এসো তামারা, নতুন ব্যবসার প্রারম্ভে একটু মদ খাওয়া যাক্।"

—"বেশ! সত্যি, এম্‌মা এডওয়ার্ডোব্‌না, আপনি আমার জীবন-পথে নতুন আলোক-পাত করলেন। আজ আমায় নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, দেবী!"

শ্যাম্পেন খাওয়া হলো। "দেবী! আর একটি অনুরোধ…!"

—"বলো।"

—"আমাকে অনেকটা খবরগিন্নীর মতো থাকতে হবে বোধকরি?"

—"না, খবরগিন্নীর মতো নয়, আমার সহকারিণী হয়ে থাকবে তুমি।"

—"কিন্তু আপনি তো বললেন দরকার হ'লে রুই-কাৎলাও খেলাতে হবে।"

—"কেন? পারবে না?"

—"পারব না কেন! দিব্যি বড়োলোকের বাড়ীর যুবতী সুন্দরী পরিচারিকা সেজে লোক মজাব। তা' পারব।"

—"সত্যি, তামারা, তুমি এত বুদ্ধিমতী!"

—"তা' তো হলো! কিন্তু সে ভাবের সাজপোষাক দরকার তো।"

—"সে জন্যে কত লাগবে?"

—"ধরুন দু'শো রুবল।"

—"দু'শো কেন—তিনশো নাও।"

আনন্দে ঢলে পড়ার ভাণ ক'রে এম্মার গালে চুমু দেয় তামারা।

—"যাক্! প্রিয়সখীর মৃতদেহ কবর দেওয়ার একটা হিল্লে হলো।" —ফিরে যেতে যেতে মনে মনে ভাবে তামারা।

লোকে বলে মানুষ নাকি মরেই আশীর্বাদ করে যায়। তা বুঝি সে রাতে খদ্দেরের ভিড় সামলানো দায় হয়ে উঠল শেষে—এমনটি সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

তামারার পদোন্নতিতে মেয়েরা সব কেমন যেন ভড়কে গেল। শেষে একদিন সময় বুঝে তামারা ছোট মানকাকে আলাদা ডেকে চুপি চুপি বল্লে, "ছাখ মানকা, আমি খবরগিন্নী হয়েছি বলে তোরা যেন সব ঘাবড়ে যাস্‌নে। নেহাৎ বাধ্য হয়েই ভেক নিতে হয়েছে। কিন্তু আসলে আমি তোদের যে তামারা সেই তামারাই আছি। বুঝলি?"

—সাত—

পরদিন রবিবার। মরবার ফুরসৎ নেই তামারার। আনুষ্ঠানিক ভাবে যথারীতি প্রিয়বান্ধবী জেনকার শেষকৃত্য সম্পাদন করতে হবে—যেমন আর পাঁচজনের হয়ে থাকে। কোনও বাধাই মানবে না সে।

সে ছিল সেই অদ্ভুত ধাতের-মানুষ যারা বাইরে খুব নির্বিরোধী, কিন্তু ভেতরে যাদের ধিকিধিকি জলছে উৎসাহ-উদ্যমের ছাই-চাপা আগুন, —অনাবশ্যক উৎসাহের আতিশয্যে অনর্থক শক্তিক্ষয় করতে রাজি নয় যারা, কিন্তু সদাসর্বদাই যেন রয়েছে একচোখ মেলে ঘুমিয়ে, কাজের বেলায় নিমেষের মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে সব বাধাবন্ধ অবহেলে দু'পায়ে মাড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে জানে যারা দুস্তর কর্মসমুদ্রে।

বেলা বারোটা নাগাদ তামারা একটা গাড়ীতে করে পুরোনো-পাড়ায় এল। একটা বাজেমার্কা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে সেখানে গিয়ে ঢুকল সে। ভেতরে এসে এক ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলে সেন্‌কা কি আসেনি তখনো।—"না, মাদাম! সারা রাত কোথায় আড্ডা মেরে এখন বোধহয় পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে! ডেকে আনব?"

তামারা কাগজ-পেন্সিল চেয়ে নিয়ে কী যেন লিখে আধ-রুবল বকশিস দিয়ে ছেলেটাকে সেনকার কাছে পাঠিয়ে দিলে। তারপর সে এল শহরের সব চাইতে সেরা হোটেল 'ইয়োরোপ'-এ রোবিন্‌স্কায়ার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করা বড়ো চারটিখানি কথা নয়। নীচের দরোয়ান বললে: "মনে হচ্ছে এলেনা বিক্টোরভ্না এখন বাড়ী নেই।" কিন্তু তামারার জোর ধাক্কাধাক্কিতে তাঁর খাস-দাসী এসে বললে: "আছেন বটে। কিন্তু মাদামের মাথা ধরেছে; এখন দেখা হবে না।"

অগত্যা তামারা একখানা চিঠি লিখে দাসীর হাতে দিলে: "আশা করি মনে আছে একদিন কোনো একটি বাড়ীতে—নাম করছি নেই—

আপনি যখন দারগোমাইঝস্কির ব্যালাড গানটা শেষ করলেন, একটি মেয়ে আপনার সামনে নতজানু হয়ে কেঁদেছিল। আমি আসছি তারই কাছ থেকে। আপনি সেদিন তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলেন। কিন্তু হায়! আজ সে সব বন্ধনের বাইরে—সে মৃত। ইচ্ছে করলে তার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি কাজ আপনি করতে পারেন। আশা করি বিরক্ত হবেন না। আর আমি হচ্ছি সেই মেয়েটি যে আপনার সঙ্গিনী ব্যারোনেস্-কে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যকথা শুনিয়েছিল। সে সত্য-ভাষণের জন্যে আমি আজও অনুতপ্ত—ক্ষমপ্রার্থিনী।"

—"এটা দাওগে তাঁকে।"—আদেশ করলে তামারা।

দু'মিনিট পরেই দাসী এসে বললে: "মাদাম স্মরণ করেছেন। তবে মাপ চাইছেন এইজন্যে যে আনুষ্ঠানিক বেশভূষায় সাক্ষাৎ করতে অপারগ এখন তিনি।"

মন্ত্রোচ্চারণের মতো কথাগুলো আবৃত্তি ক'রে তামারাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল সে; তারপর তামারা এসে ঘরে ঢুকলে বাইরে এসে দোর বন্ধ করে দিলে।

এক বিরাট পালঙ্কের 'পরে শুয়ে আছেন রোবিনস্কায়া; গায়ে তাঁর দামী তুর্কি-কম্বল, আশেপাশে একরাশ রেশমী বালিশ, কিংখাবে মোড়া নরম তুলতুলে পাশবালিশ, রূপালী রোমবস্ত্রে সযত্নে আবৃত পাদু'খানি, আঙুলে-আঙুলে মনোহর মরকত মণি খচিত।

মন তাঁর আজ ভালো নেই। একে কাল সকালে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হয়েছে একটু মন-কষাকষি; তারপর সন্ধ্যায় থিয়েটারে গানের পর যতটা হাততালি তিনি আশা করেছিলেন পাননি ততটা। উপরন্তু একটা কাগজের প্রতিনিধি—গোরু যেমন বোঝে জ্যোতিষ-বিদ্যা, তিনিও তেমনি বোঝেন শিল্পকলা—লিখেছেন কাগজে এক প্রবন্ধ তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বিনী টিটালোবার প্রশংসা ক'রে। কাজেই মাথা ধরবে না তো কী!

—"কেমন আছ, বাছা?"—থিয়েটারী ঢঙে করুণ হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করেন তিনি: "বসো ঐখানে।...খুসী হলাম দেখে।...শরীরটা বড়ো খারাপ; তাই কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।..."

সে উন্মত্ত দুঃসাহসিক নৈশ-অভিযানের কথা স্পষ্ট মনে আছে রোবিন্-

স্মায়ার ; মনে আছে তামায়ার চমকপ্রদ অবিস্মরণীয় মুখশ্রী। কিন্তু এখন, এই অবসাদের মধ্যে, শারদ দ্বিপ্রহরের এই ক্লান্তিকর রসলেশহীন সুস্পষ্ট দিবালোকে, অনর্থক অনাবশ্যক বাহাদুরির কাজ ব'লে প্রতিভাত হতে লাগল সে রাত্রের সেই অভিযানকে। অথচ সেই নিশি-ডাকা পাগলা রাতে, নিজের প্রতিভার পরমা শক্তিতে গরবিণী জেনীকে পর্যন্ত যখন তাঁর কাছে নতজানু হতে বাধ্য করেন তিনি, তখনও তাঁর আন্তরিকতা ছিল সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আর আজও যে এখন অলস শ্রান্তিভরে অবহেলার সঙ্গে স্মরণ করছেন তিনি বিগতদিনের সে কাহিনী, এর মধ্যেও রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিকতা। বিস্তর নামকরা শিল্পীর মতো ইনিও সদাসর্বদা অভিনয় করে চলেছেন নিজেকে নিয়ে ; কোনও সময়ই যেন নিজের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না ইনি ; নিজের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি, প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে যেন যাচাই করে চলেছেন দূর থেকে—দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি দিয়ে।

বালিশের ওপর থেকে অলস কাতর ভাবে পেলব হাতখানি তুলে রাখলেন তিনি কপালের 'পরে ; মরকত মণির গভীর রহস্যঘন দীপ্তিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল ঘরময়।

"পড়লুম তোমার চিঠিতে বেচারী···কী যেন নাম তার ? একদম ভুলে গেছি দেখো !···"

—"জেনী।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেনী।···কী হয়েছিল ?"

—"ডাক্তারী পরীক্ষার সময় কাল সকালে গলায়···

চমকে উঠলেন গায়িকা : "বলো কী ! অমন সুন্দর মেয়েটি ! হায় রে ! কেন ? কী, হয়েছিল কী ?···ও, মনে পড়েছে। তা' আমি তো বলেছিলাম তাকে চিকিৎসা করাতে। আজকাল চিকিৎসায় ওসব রোগ তো সেরে যাচ্ছে শুনি।···সত্যি বড়ো দুঃখের কথা। বেচারা !"

—"আমি তাই এসেছি আপনার কাছে, এলেনা বিক্তোরোভ্‌না। তাই আপনাকে বিরক্ত করলাম। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন···"

—"বলো, কী করতে হবে ?"

—"তা আমি নিজেই জানিনে। ওরা তাকে লাস-কাটা ঘরে নিয়ে

গেছে। এ বিষয়ে তদন্ত শেষ না হ'লে বোধহয় লাশ কাটা হবে না। আর আমরাও চাইনে যে তার দেহ নিয়ে কাটাকটি, ছেঁড়াছেঁড়ি হয়। আজ রবিবার। কাল পর্যন্ত হয়তো ওরা অপেক্ষা করতেও পারে। ইতিমধ্যে চেষ্টাচরিত্র ক'রে…'

—"আচ্ছা বেশ! আমার বোধহয় কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে জানাশোনা আছে। আমার ডায়েরী বই খুলে দেখতে হবে…"

—"তা ছাড়া আমি তার কবরের ব্যবস্থা করতে চাই। অবশ্য, খরচা আমিই দেব।…তাকে আমি বড়ো ভালোবাসতাম।"

—"আচ্ছা, তা সাহায্য করতে রাজি আছি, যদি কিছু দিয়ে…"

—"না, না! অশেষ ধন্যবাদ! আমি চাই ওকে খ্রীষ্টীয় প্রথায় আরো পাঁচজনের মতো কবরস্থ করতে—কুকুর-বেড়ালের মতো নয়। আমি তাই এসেছি আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে…"

গায়িকা এ বিষয়ে ক্রমে বেশ মনোযোগী হয়ে উঠ্‌লেন যেন। ভুলে গেলেন মাথাব্যথার কথা। নাটকের চতুর্থ অঙ্কের ক্ষয়রোগগ্রস্তা নায়িকা যেন হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠ্‌লো।…অন্তত: নিজের নাম কেনার জন্যেও জেনীর একটা ব্যবস্থা করবেন রোবিনস্কায়া। নাম! নাম কে না চায়? রোবিনস্কায়াও চাইতেন—সারা জগৎ তাঁর দিকে চেয়ে থাকুক মুগ্ধ হয়ে, বিস্মিত হয়ে।

—"আচ্ছা, যেদিন আমি আর ব্যারনেস গেছলাম তোমাদের ওখানে, সেদিন আর একজন কে যেন…"

—"কে?…ও হ্যাঁ, একজন ভদ্রলোক সবশেষে জেনীর হাতে চুমু দিয়ে বলেছিলেন বটে দরকার হলে খবর দিতে। কিন্তু কী নাম তাঁর তা তো জানিনে। জেনীর ঘরেও সে রকম কোন ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা পাইনি।"

—"আচ্ছা, দাঁড়াও, আমার যেন মনে আস্‌ছে।…ও, হ্যাঁ! রীয়াজানোব—হ্যাঁ—হ্যাঁ—উকিল আর্নস্ট আঁদ্রেবিচ্‌ রীয়াজানোব! দাঁড়াও দেখছি…"

রোবিনস্কায়া টেলিফোনে ডাকলেন: "সেণ্ট্রাল ১৮-৩৫—ধন্যবাদ… হ্যালো আর্নস্ট আঁদ্রেবিচ্‌কে একটু ফোনে দিন তো…গায়িকা রোবিন-

স্কায়া···ধন্যবাদ···হ্যালো···কে? আর্নস্ট আঁত্রেবিচ্?···এখন ব্যস্ত নাকি?···বাজে কথা ছাড়ো···শোনো, দরকারী কথা···মিনিট পনেরোর মধ্যে একবার এখানে আসা দরকার···না···না···হ্যাঁ···আস্‌তেই হবে··· শরীরটা ভালো নেই···মাথাধরা···না, একটি মহিলা,···এলেই সব দেখতে শুনতে···শীগ্‌গীর আসা চাই-ই কিন্তু ··ধন্যবাদ···বিদায়!"

—"আস্‌ছে সে। ভারী চালাক আর ওস্তাদ লোক। তার কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই। ভালো কথা—তোমার নাম···?"

লজ্জা পেয়ে যায় তামারা: "নাম? নাম এমন কিছু নয়, এলেনা বিক্রোব্‌না। আপনি আমাকে তামারা বলেই ডাকবেন।"

—"তামারা! বেশ নাম তো! তুমি তামারা, আমার সঙ্গে আজ প্রাতরাশে বস্‌বে। রীয়াজানোবও আসছে।"

—"না, না! দেরি হয়ে যাবে তা'হলে।"

—"বেশ। অন্য একদিন খেয়ো তবে। সিগ্রেট চাই?"—সোনার সিগ্রেটকেস্ এগিয়ে ধরেন রোবিনস্কায়া।

রীয়াজানোব আসে। তামারা এর আগে এত ভালো করে তাঁকে লক্ষ্য করেনি। আজ দেখলে তাঁর দীর্ঘ দেহ, টানা টানা যুগ্ম-ভ্রূ, মাথার পেছন দিকে আঁচড়ানো চুল, সুন্দর চেহারা। জ্যোতির্ময় চক্ষুদুটি যেন মনের কথা টেনে বার করে আনে, মন কেড়ে নেয়। হাজার লোকের মধ্যেও চিনে নিতে দেরি হয় না তাঁকে।

"কপাল যদি না পুড়ত আমার"—মনে মনে ভাবে তামারা! "তবে সানন্দে এমন একজনের পায়েই জীবন সঁপে দিতে পারতুম আমি —দয়িতের পায়ের তলায় ছিন্ন-কুসুমের মতো।"

রীয়াজানোব এসে রোবিনস্কায়ার হাতে চুমু দিলেন। তারপর তামারাকে বললেন: "অচেনা নও তুমি আমার কাছে। সেই পাগল-করা সন্ধ্যার কথা মনে আছে আমার। মনে আছে তোমার সেই ফরাসী বুলি। সত্যি, মুগ্ধ হয়ে গেছলাম সেদিন। তোমার সে স্বর, কথা-বলার সে ভঙ্গী আজও আমার কানে বাজে।···হ্যাঁ, এলেনা বিক্রোব্‌না!" একটা চেয়ারে বসে রোবিনস্কায়াকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি: "কী কাজে লাগতে পারি আমি?"

নিজের কপাল টিপে ধরেন রোবিনস্কায়া: "আর রীয়াজানোব, আমি গেছি! মাথা আমার গেল! তামারাই বলুক সব! সে বড়ো ভীষণ! আমি পারব না বলতে…"

জেনীর মরণের ইতিহাস তামারা বেশ করে গুছিয়েই বললে।

—"বেশ! বেশ! তাই হবে।"—ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগ্‌লেন রীয়াজানোব: "মৃতদেহের সমাধি যাতে হয় ভালো ক'রে—এই তো? তা' আমি চেষ্টা করব যাতে হয়। সত্যি, তুমি দেখছি তার প্রকৃত বান্ধবী ছিলে। নইলে কে এতটা করে?…আচ্ছা, দাঁড়াও, মনে করি"—নিজের কপালে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি: "হ্যাঁ, মনে পড়েছে! রুল নং ১৭৮; হ্যাঁ ঠিক। বলছে: যদি কেহ আত্মহত্যা করে তাহার আত্মার জন্য কোনরূপ প্রার্থনা করা হইবে না। অবশ্য যদি সে সময় সে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় না থাকে তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।…অতএব, মিস্ তামারা, তুমি বললে তো যে ডাক্তার জেনীকে দড়ি কেটে নামিয়েছিল; ডাক্তারের নাম কী?"

—"ক্লিমেনকো?"

—"চিনি বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তোমাদের মহল্লায় পুলিশ দারোগা কে এখন?"

—"বারকেশ।"

—"বারকেশ? লাল-দাড়ি, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা?"

—"হ্যাঁ।"

—"তাকেও চিনি তা'হলে। সেই মহাপুরুষ! প্রায় আট-দশবার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ধরতে পারিনি যাকে—পিছ্‌লে বেরিয়ে গেছে। বেশ, এবার দেখা যাবে!…জেনীর দেহ কখন কবরস্থ করতে চাও তোমরা?"

"যত শীগ্‌গির হয়।"

—"বেশ! দেখি, আজই যাতে হয়। তবে কথা দিতে পারছি নে। এক কাজ করো—আমার এই ডায়েরী বইয়ে—ত-এর ঘরে তোমার নাম-ঠিকানাটা লিখে দাও। ঘণ্টা-দুই বাদে তোমায় খবর

দেব।···ভালো কথা, যদি কিছু মনে না করো, জিজ্ঞেস করি, টাকা দরকার ?"

—"না। অশেষ ধন্যবাদ! সমাধির খরচ আমিই দেব।···আচ্ছা, আমি তবে আসি! আসি, এলেনা বিক্তোরোব্না! অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে!"

চলে গেল তামারা। কিন্তু সোজা বাড়ী ফিরে গেল না। গেল কেথলিকেস্কায়া স্ট্রীটের এক কফিখানায়। সেখানে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে সেন্‌কা। দেখতে মন্দ নয়: করিতকর্মা লোক; চোর-ছ্যাঁচড়ের সর্দার; সবজান্তা নিশাচর।

—"কেমন আছ তামারোচ্‌কা? অনেকদিন দেখিনি। মন খারাপ হয়ে উঠেছিল। কফি খাবে?"

—"না। আগে কাজ। কাল জেনীকে মাটি দিতে হবে। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

—"খবরের কাগজে পড়লাম বটে।···কী, হয়েছিল কী?"

—"এখুনি ৫০ রুবল চাই আমার।"

—"হায় পেয়সী, একটি কোপেকও যে নেই এখন।"

—"নেই—যোগাড় করো।"

—"আজ রবিবার। ব্যাঙ্ক বন্ধ যে।"

—"তা জানিনে।"

—"কিন্তু হঠাৎ এত দরকার কেন, সুন্দরী?"

—"আরে বোকা, কবর দেবার খরচ কৈ?"

—"ও! বেশ! সন্ধ্যাবেলায় টাকা পাবে। তোমার কথা না রেখে কি পারি, প্রাণের সখী!···আজ যাব নাকি?"

—"না, না! এখন এসো না আমাদের ওখানে, সেনেচ্‌কা—লক্ষীটি আমার। এখন আমি খবরগিরনী হয়েছি।"

—"ও বাব্বা! তাই নাকি! ওসবের তুমি কী জান?"

—"হতে হয়েছে, ভাই! তবে এ খেলা শীগ্‌গীরই শেষ হবে। তখন যতবার ইচ্ছে এসো আমার কাছে—যা ইচ্ছে ক'রো আমার নিয়ে। কোনো বাধা দেব না।"

—"বেশ! তবে তাই-ই।"

—"দুঃখু করো না, সেন্‌কা। বড়ো জোর একটা সপ্তাহ। ভালো কথা···সেই গুঁড়ো পেয়েছ?"

—"গুঁড়ো কোথায়—সে তো দানা-দানা গো!"

—"তা হোক্। জলে দিলেই গলে যাবে তো?"

—"আলবাৎ। স্বচক্ষে দেখেছি বাবা!"

—"তা' তো হলো। কিন্তু সেন্‌কা, ও গুঁড়োতে সে মরে যাবে না তো?"

—"না, গো, না! একটু ভীরমি লাগবে শুধু। তাড়াতাড়ি শেষ করো, তামারা। তারপর, তোমায় আমায় লম্বা পাড়ি—যেথায় আমারে নিয়ে যাবে তুমি—যাব গো আমি!"

—"বেশ, বেশ, শীগ্‌গিরই হবে।"

—"আমিও প্রস্তুত। একবারটি শুধু চোখ ঠারবে তুমি, ব্যস! সব ফেলে, যাবো চলে হে মোর পেয়সী। সঙ্গীতে ভাসায়ে দেব সব বাধা; শুধু রবে ভালোবাসা-বাসি!"

হঠাৎ সেন্‌কা—সচরাচর সংযত হলেও এখন স্ফূর্তির ঝোঁকে—তামারাকে জড়িয়ে ধর্‌তে যায়। বেগতিক দেখে চট করে এড়িয়ে যায় তামারা; "কী যে কর সেনেচ্‌কা—একঘর লোকের মাঝে! একটু সংযমী হও—বুঝলে? তারপর আমি তো রইলামই তোমার—ভয় কী? আসি তবে—অ্যাঁ?"

কফিখানা থেকে বেরিয়ে যায় তামারা।

—আট—

পরদিন, সোমবার বেলা দশটায় একখানা ঠিকে গাড়ীতে চড়ে মেয়েরা সব গেল শহরের লাসঘরে। গেল না শুধু হেনরিয়েটা—নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে। ভীতু নীন্‌কা-ও গেল না। আর গেল না পাশকা। দু'দিন ধরে পাশকা আর বিছানা ছেড়ে ওঠে নি, চুপ করে পড়ে আছে, কিছু জিজ্ঞেস করলে বোকাহাসি হাসে শুধু। খেতে না দিলে চায়ও না। আবার খাবার এনে দিলে হ্যাংলার মতো গেলে। সব ভুলে গেছে। ডেকে, মনে করিয়ে দিয়ে, সব করাতে হচ্ছে। এম্‌মা কাজেই পাশকার ঘরে আর লোক বসায় নি—যদিও পাশকার খোঁজ পড়েছে কয়েকবার। এমন ওর মাঝে মাঝে হয়, আবার সেরেও যায়; তাই এবারও সেরে যাবে আশা করে এম্‌মা। পাশকা প্রতিষ্ঠানের একটি রত্ন, আবার তার চরম নিষ্ঠুরতারও পরিচয়।

লাস-ঘরটা একটা ছাই রঙের বাড়ীতে। মেয়েরা সব এক-এক করে গাড়ী থেকে নেমে সসঙ্কোচে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকে। ভেতরের ঘর তালাবন্ধ। দরোয়ানের খোঁজ করতে হলো। তামারা আনল ডেকে এক খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়োকে। লোকটা তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিতেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে গেল। বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ আর ধূপধুনো আর মড়ার গন্ধে মিশে মেয়েদের নাকে ভক্‌ করে এসে ঢুকল। সবাই পিছিয়ে গিয়ে গা ঘেঁসে একপাশ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তামারাই দারোয়ানের পেছনে পেছনে গিয়ে ঘরে ঢোকে।

ঘরটা আধো-অন্ধকার। কয়েকটা কফিন দাঁড় করানো রয়েছে। একটা আছে ঘরের মাঝখানে পড়ে; ঢাকনাটা পাশেই পড়ে রয়েছে।

—"কোন্‌টা আপনাদের?"—নাকে নস্যি গুঁজে জিজ্ঞেস করে লোকটা: "মুখ চেনা আছে তো?"

—"হ্যা!"

—"বেশ। দেখে নিন তবে। আমি এক-এক করে সবগুলো দেখাচ্ছি।...এটা নাকি?" একটা কফিনের ঢাকনা খোলে লোকটা। এক বুড়ীর মৃতদেহ। ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক। নীলবর্ণ মুখ। বাঁ চোখটা বন্ধ। ডান চোখে কটমট করে চেয়ে আছে—জ্যোতিহারা।

"এটা নয় তবে? আচ্ছা, আরো আছে।" দরওয়ান একে-একে সব কফিনের ডালা খুলতে লাগল। দেখা গেল মৃতদেহগুলো সব পথের ভিখারীদের; রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া।

তামারার মনে হতে লাগল, ঘরের ভেতরের ঐ পুতিগন্ধময় হাওয়া যেন তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গিয়ে বাসা বেঁধেছে।

—"আচ্ছা, দরওয়ান, আমার পায়ের তলায় প্যাঁট-প্যাঁট ক'রে কিসের শব্দ হচ্ছে বলো তো।"

—"ও কিছু নয়। পোকা। মড়াগুলোর গায়ে ব্যাটারা দিব্যি বাসা করে আছে।...হ্যাঁ, তা' যাকে খুঁজছেন সে মেয়ে, না মদ্দ?"

—"মেয়ে।"

—"এগুলো নয় তবে?"

—"না।"

—"তবে চলুন, ময়না ঘরে যাই। কবে এনেছে তাকে?"

—"শনিবারে, দাদাঠাকুর!"—থলি থেকে পয়সা বার করে বলে তামারা: "শনিবার দিনের বেলা। এসো, দোক্তা কিনে খেয়ো, বাছা!"

—"ঠিক হয়েছে—শনিবারে এসেছে? গায়ে কী ছিল?"

—"এমন কিছু নয়। একটা নীল রঙের জামা...।"

—"ও, তা হলে ২১৭ নম্বরের লাশটা হবে বোধহয়। কী নাম?"

—"সুসানা রেইৎজিনা!"

—"আচ্ছা, দেখছি।"—দরওয়ান দরজার দিকে চেয়ে বলে: "আপনাদের মধ্যে কে সাহসী, আসুন! যদি সে পরশু এসে থাকে তবে ভগবান যেমনটি করে পাঠিয়েছিল তেমনটিই পড়ে আছে। জামা পরাতে হবে। দু'জন লোক চাই। আসুন, কে কে আসবেন?"

তামারা মানকাকে হুকুম করে: "তুই আয়; ভয় নেই, বোকা—

আমি তো সঙ্গে আছি। তুই যাবিনে তো কে যাবে? আয়!"...বেচারী মান্‌কা এতক্ষণ ভয়ে কুঁকুড়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল চুপটি ক'রে।

—"আমি, আমি যাব—যাচ্ছি—চলো—তাতে আর কী—"

কাছেই ময়না-ঘর। আরো ছয় ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচেয় নেমে গিয়ে একটা অন্ধকার কুঠ্‌রী আছে—সেখানে। দরওয়ান ছুটে গিয়ে কোথা থেকে একটা মোমবাতি আর একটা ছেঁড়া খাতা নিয়ে আসে। আলো জ্বালতেই দেখা যায় পায়ের কাছে পাথরের মেঝেতে সারি সারি মড়া সাজানো। গায়ের রঙ সব হলদে হয়ে গেছে। কোনোটার মাথার খুলি ফাটা—মুখে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কারোর মুখবিকৃতি হয়ে আছে—দাঁত বার করা।

—"এগিয়ে চলুন...পরশুদিন এয়েছে তো...শনিবারে—কী নাম বললেন?"

—"রেইৎজিনা স্থসানা।"

—"রেইৎ-জিনা স্থ-সানা, রেইৎ-জিনা স্থ-সা-না—।...যা বলেছি... দু'শো সতেরো নম্বর!" একটা মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। পায়ের তলায় লেখা ২১৭ নং।

—"দাঁড়ান! বাইরে বারান্দায় নিয়ে যাচ্ছি। তারপর, দেখি এর জামাটামা কোথায়।"

বুড়ো হলে হবে কী, দরওয়ান অনায়াসে জেনকার প্রাণহীন দেহটার পা দুটো ধরে নিজের কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলে। মড়ার মাথা ঝুলতে লাগল। যেন আলুর বস্তা কাঁধে নিয়ে চলেছে লোকটা।

বারান্দায় একটু আলো আসছে। দরওয়ান যেই বোঝাটা মাটিতে নামাল—দু'হাতে চোখ ঢাকলে তামারা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল মান্‌কা।

—"যদি কিছু দরকার থাকে—বলুন।"—দরওয়ান বললে: "লাস্‌কে জামা পরাতে চান তো জামা দিতে পারি; সোনালি কাপড়ে সাজাতে চান তো তাও দিতে পারি। মালা দিতে পারি, সঙ্গে বিগ্রহ চান তো দিতে পারি;...জুতো পর্যন্ত...সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায় এখানে।"

তামারা তাকে টাকা দিল। দিয়ে মানকাকে এগিয়ে দিয়ে তার পেছনে পেছনে খোলা বাতাসে এসে দাঁড়াল নিজেই।

একটু পরে দুটো মালা আনা হলো। একটা তামারার; তাতে টিকিট ঝুলিয়ে লেখা: 'জেনীকে—তার বন্ধু।' আর একটা মালা পাঠিয়েছেন রীয়াজানোব। লাল রঙের টিকিট; তাতে সোনালী লেখা: 'দুঃখের আগুনেই শুদ্ধি আমাদের'। বিশেষ কাজে আসতে পারেননি বলে দুঃখ করে একটা চিঠিও লিখে পাঠিয়েছেন তিনি।

তারপর তামারার আমন্ত্রণে সহরের শবযাত্রার সেরা গায়কদলও এল। গায়কদলের পাঁচটি মেয়েদের মধ্যে ভেরকাকে দেখে অবাক হয়ে মুচকি হাস্‌লে একটু। গায়কদলের পেছনে দু'ঘোড়ার শব-শোভা-যাত্রার গাড়ী—তামারাই ভাড়া করে এনেছে। তাদের সঙ্গে সাতজন মশালচী। একটি সাজানো কফিনও এনেছে তারা। তাতে সযত্নে জেনকার মৃতদেহ রেখে সোনালী কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর মাথার কাছে একটি আর পায়ের কাছে দুটি মোমবাতি জেলে দেওয়া হলো।

মোমাবাতির কম্পিত শিখায় জেনকার মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মুখের নীলবর্ণ প্রায় মুছে গেছে এখন। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত একটু দেখা যায়, দু'পাটী দাঁতের মধ্যে জিবের ডগাটুকু এখনও রয়েছে চেপে। গলায় দুটো দাগ, দু'গাছা ভয়াল হারের মতো—একটা লাল, আর একটা কালো। লাল দাগটা সাইমনের সেই চামড়া ছিঁড়ে নেবার দাগ, আর কালো দাগটা গলায় দড়ি দেবার দাগ। তামারা এগিয়ে এসে জেন্‌কার জামার কলার দুটো এক করে সেফটীপিন দিয়ে এঁটে দাগ দু'টো বন্ধ করে দেয়।

পুরোহিত এলেন: চোখে সোনার চশমা, মাথায় টুপী। লম্বা মুখের রঙ হলদেটে। উপস্থিত লোকদের নমস্কারের প্রতি-নমস্কার করতে করতে এগিয়ে এলেন তিনি। তামারা এগিয়ে যায় তাঁর দিকে।

—"ফাদার! এখানে সবারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি এক সঙ্গে হবে—না, আলাদা আলাদা করে হবে?"

"একসঙ্গেই হয়ে থাকে সাধারণতঃ, তবে বিশেষ অনুরোধে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় আলাদা আলাদা ক'রে পারলৌকিক কৃত্য শেষ করা হয় বৈ কি।···কিসে মারা গেছল তোমার বান্ধবী?"—পুরোহিত জিজ্ঞেস করলেন।

"আত্মহত্যা করেছিল, ফাদার!"

—হুঁ, আত্মহত্যা! সঙ্ঘের নিয়মানুসারে আত্মহত্যা করলে খ্রীষ্টীয় প্রথায় তার সৎকার হয় না। জান না বোধহয়? তবে হ্যাঁ, এর ব্যতিক্রমও আছে···"

—"আমার কাছে পুলিশ আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে···। ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মহত্যা করেনি। ওর মাথা খারাপ ছিল তখন।"

দু'খানা কাগজ পুরোহিতের সামনে এগিয়ে দেয় তামারা, তার উপরে দশ রুবলের তিনখানা নোট। সার্টিফিকেট দু'খানা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রীয়াজানোব। "আমার অনুরোধ, পিতা, প্রকৃত খ্রীষ্টীয় প্রথায় যেন ওর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বড়ো চমৎকার স্বভাব ছিল ওর—বড়োই দুঃখ পেয়ে গেছে। দয়া করে আপনি একটু গোরস্থানে চলুন; সেখানে একটু পৃথক ভাবে উপাসনা করবেন······"

—"গোরস্থানে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে আমার কিছু তো করবার নেই। সেখানকার আলাদা পুরোহিত আছেন। আর গেলেও আবার গাড়ীতেই ফিরতে হবে তো—তার ভাড়াটাও···"

ফিরতি ভাড়া আদায় করে ধূপধুনো শোধন করে নিলেন পুরোহিত ঠাকুর, তারপর ধুনুচি হাতে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। শেষে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন তিনি: "পরম কল্যাণময় ভগবান, অনাদি অনন্ত অক্ষয় অব্যয়! শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।"

গান হলো: 'জয় জয় ভগবান করুণা-নিদান!' আর 'ওগো জগৎ-পিতা!'

মোমবাতি বিতরণ করা হলো। তারপর প্রার্থনা—দেবদূতদের সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে যেন: "শান্তি দাও, হে জগদীশ্বর! তোমার

এই সেবিকাকে পুণ্যাত্মাদের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত স্বর্গে স্থান দাও! চিরনিদ্রায় অভিভূতা তোমার সেবিকার আত্মার শান্তি হোক্! তার সকল অপরাধ স্খালণ করো, প্রভু!"

এ প্রার্থনা অজানা নয় তামারার। তবু আজ বহুদিন পরে, তা শুনে তিক্ত বিষাদের হাসি ফুটে ওঠে তার ওষ্ঠপ্রান্তে। মনে পড়ে যায় জেনকারই সেই ক্ষিপ্ত হতাশাভরা অবিশ্বাসের কথা: আজীবন পাপে ডুবে থাকলেও কি ক্ষমা করবেন পতিতপাবন পরম দয়াল মহাপ্রভু? হে প্রভু! মানিনি তোমার নির্দেশ; তোমার পবিত্র নামে এনেছি কলঙ্ক, তবুও অনিচ্ছুক এ স্বৈরিণীকে ক্ষমা করতে পারবে কি গো তুমি, হে করুণানিদান, হে চির-সান্ত্বনা?

"ওরে জেন্‌কা রে!"—কে যেন ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। ছোট মান্‌কা হাঁটু গেড়ে বসে রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদছে। তাকে কাঁদতে দেখে আর সব মেয়েরাও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

"শুধু তুমিই মৃত্যুঞ্জয়! তুমিই মানবকে সৃষ্টি করেছ। আমরা পৃথিবীর ধুলোয় গড়া আবার ধুলোয় মিশে যাবো। তাই আমায় সৃষ্টি ক'রে ব'লে দিয়েছ—তোমায় ধুলো দিয়ে গড়েছি, ধুলোয় মিশ্‌তে হবে!"

শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে গেছে তামারা, একদৃষ্টে চেয়ে আছে জেনকার পাণ্ডুর মুখখানার দিকে।

"তোমায় ধুলো দিয়ে গড়েছি, ধুলোয় মিশতে হবে। আর কিছু হবে না? আর কিছু?"—মনে মনে ভাবে সে।

যেন তারই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে ওঠে উপাসকদল:
"ধূলিতে মিশাবে মানবজাতি…"

তারপর গান হয় 'চিরন্তনী স্মৃতি'। গান-শেষে ফুঁ দিয়ে সব মোমবাতি নিবিয়ে দেওয়া হলো। পোড়া ধূপের রঙে নীল হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল দীপ্তশিখার দীর্ঘশ্বাসের মতো ধূম্রজাল। শেষ বিদায়ের প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করলেন পুরোহিত। তারপর নেবে এল বিষণ্ণ নীরবতা। একমুঠো ধুলো নিয়ে ক্রুশচিহ্নের আকারে তা' নিক্ষেপ করলেন তিনি শবদেহের 'পরে, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ ক'রে চললেন সেই মহামন্ত্র:

'মহাপ্রভুর এ জগৎ, তারই পরিপূর্ণতা এ নিখিল বিশ্বে আর যা কিছু বাস করে এর মধ্যে।'

মেয়েরা সব গোরস্থানে রওনা হলো। সেখানে যেতে হলে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের মুখ পড়ে মাঝখানে, আর তার মধ্যে দিয়ে গেলে প্রায় অর্ধেক রাস্তা কম হাঁটতে হয়। কিন্তু সেখান দিয়ে শবদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না বড় একটা; ঘোরা পথেই যায় সবাই। তবুও ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের পাশ দিয়ে যাবার সময় সেখানকার প্রায় সব মেয়েই—যে যেমন অবস্থায় ছিল এসে ভীড় করে রাস্তার ধারে দাঁড়ালে। চোখের জল ফেল্লে সবাই; ক্রুশচিহ্ন আঁকলে বুকে।

পরিষ্কার হয়ে এল আবহাওয়া।······শীতের সূর্য নীল রঙে মিনা করে তুলল যেন হিমেল আকাশকে; শেষ ঘাসটুকুও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সবুজের আভায়, সোনালি আর লালে ঝকঝকে করতে লাগল ঝরা পাতার রাশ। আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ শীতল বাতাসে উঠতে লাগল গম্ভীর বিষণ্ণ মধুর ধ্বনি:

'হে ভগবন, হে সর্বশক্তিমান, হে অজর অমর, করুণাধারা বর্ষণ করো আমাদের 'পরে।'

কবর খুঁড়ে বসানো হলো কফিন। গোরস্থানের পুরোহিত এক কোদাল মাটি দিলেন। তারপর আরো মাটি! আর ধুলো! ধুলো দিয়ে গড়া—ধুলোয় মিশে গেল!

—"হয়ে গেল! 'সাঙ্গ আজি ধুলাখেলা, সাঙ্গ অভিমান!"—অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে তামারা: "চলে গেল জেন্‌কা। তবুও ওর এ দশা আমাদের এ দশার চাইতে ভালো। তবু দুঃখ হয়, সে চলে গেল; আর তাকে আমাদের মধ্যে ফিরে পাব না। এসো, তার আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করে আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

তারপর যেন অর্ধ-স্বগত ভাবেই বলে ওঠে সে: "আমাদেরও আর বেশিদিন তাকে ছেড়ে থাকতে হবে না। আমরা সব ঝড়ে উড়ে যাব—ছড়িয়ে পড়ব দিগ্বিদিকে। ঐ দেখ, সূর্য—ঐ নীল আকাশ। কী মধুর বাতাস! মাকড়সার জাল উড়ে চলেছে হাওয়ায় ভেসে। শুধু আমরাই, এই বেশ্যারাই, হচ্ছি পথের আবর্জনা।"

সবাই ফিরে চলে ফের। হঠাৎ পথের বাঁকে একটা থামের আড়াল থেকে লম্বা-চওড়া একজন ছাত্র বেরিয়ে এসে লিউব্‌কার জামার হাতা ধরে টান দেয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে লিউব্‌কা. সোলোবিয়েব! মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায় তার।

—"চলে যাও—যাও চলে!"—দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে সে।

—"লিউবা—লিউব্‌কা—অনেক খুঁজেছি তোমায়—পাইনি। আমায় বিশ্বাস করো—লিখোনিনের মতো নই আমি। আমি তোমার জন্যে—হ্যাঁ, তোমার জন্যে—'

—"যাও বলছি—"

—"লিউব্‌কা,—খেলা করছিনে আমি। ভুল বুঝো না। তোমায় বিয়ে করব আমি—"

—"বটে!"—বলেই সটাও সোলোবিয়েবের গালে এক চড় ক'বে দেয় লিউব্‌কা: "এই নাও তোমার পাওনা!"

স্তম্ভিত হয়ে যায় সোলোবিয়েব। করুণ মিনতি তার চোখে।

—"কৈ, যাও এখান থেকে—ছ'চক্কের বিষ তোমরা সব!"

দু হাতে মুখ ঢাকে সোলোবিয়েব। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো পিছু ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

—নয়—

তামারার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবিকই বুঝি ফলে যায়! জেনীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পর দু'টি সপ্তাহের মধ্যেই এন্না এডওয়ার্ডোব্‌নার বাড়ীর উপর দিয়ে এত রকমের আশাতীত দুর্ঘটনা ঘটে গেল যে তা' বুঝি গুণে শেষ করা যায় না।

পরদিনই পাশকাকে পাঠাতে হলো পাগলা-গারদে। তার আর মাথার ঠিক নেই। আর সত্যিই—পাগলা-গারদে সেই যে তাকে

খড়ের বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হলো, সেখান থেকে একবারও আর নড়েনি বেচারা। আর শেষটায় সেখানেই মারা যায় সে মাস ছয়েক পরে।

তারপর এল তামারার পালা। দিন পনেরো সে খবরগিন্নীর কাজ করেছিল, তা বেশ ভালোভাবেই। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর পাত্তা মিলল না তার।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে শহরের একজন প্রবীণ আইনজীবীর সঙ্গে বছরখানেক ধরেই তার বেশ একটুখানি মাখামাখি চলছিল। লোকটা ছিল পয়সাওয়ালা। প্রথম আলাপ হয়েছিল স্টীমারে ক'রে বেড়াতে যাবার সময়। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, রহস্যময়ী তামারার পক্ষে প্রবীণ রসিক পুরুষটিকে ফাঁদে ফেলতে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। তামারা অবশ্য নিজের আসল পরিচয় গোপনই রেখেছিল। ভাবখানা ধরেছিল এই যে, সে যেন এক মধ্যবিত্ত ঘরের কুলবধূ। স্বামী জুয়াড়ী, তাই সংসারে সুখ নেই।...প্রথম প্রথম লোকটির সঙ্গে সন্ধ্যায় কোন নির্জন জায়গায় যেতে চাইত না সে। তবে ছদ্মনামে তাদের মধ্যে প্রেমপত্রের বিনিময় চলত বটে।

তারপর একদিন দয়িতের আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারলে না সে। প্রিন্স-পার্কে গেল অভিসারে। কিন্তু আর কোথাও তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলো না কিছুতেই।

এভাবে পাকা শিকারীর মতো শিকারকে নিয়ে খেলালে বহুদিন তামারা। অবশেষে, একদা গ্রীষ্মে—ভদ্রলোকের স্ত্রী-পুত্র তখন বিদেশে—তামারা এল তাঁর বাড়ীতে। এখানেই তার প্রথম আত্মসমর্পণ। প্রেমিকবর দেখলেন—প্রেয়সীর চোখে জল। বিবেক-দংশন নাকি?... তাই তো!...আদর, চুম্বন, প্রেমালিঙ্গন। বার্ধক্যের প্রেম শেষে এমনই বেপরোয়া হয়ে দাঁড়াল যে লোকলজ্জা গেল ভুলে।

প্রণয় প্রগাঢ় হয় বিরহে। তাই তামারা বহুদিন পর পর এসে ভক্তকে দর্শন দান করে যায়। ফুলের তোড়া উপহার দিলে নেয় বটে। কিন্তু কোনো দামী উপহার সে নেয় না। তাই প্রেমের বিনিময়ে পয়সা দিতে ভদ্রলোকের সাহস হয়নি কোনোদিন। একদিন তামারার জন্যে

আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করার কথা পাড়েন তিনি। উত্তরে এমন ক'রে চেয়ে রইল তামারা তাঁর দিকে যে শেষে থতমত খেয়ে, তার হাতে চুমু দিয়ে, ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পেতে হয় তাঁকে।

ক্রমে জেনে নিলে তামারা তার প্রেমিকের আর্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা। বুঝ্‌লে : সারা সপ্তাহে যে-টাকা আমদানী হয়, প্রেমিকপ্রবর শনিবারে তা' ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসেন, যাতে রবিবারটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমোদে প্রমোদে কাটানো যায়। তাই একদিন শুক্রবারে এক লোক মারফৎ একখানি চিঠি পেলেন তিনি : "ওগো আমার প্রিয়তম, আমার রাজা সলোমন! আমি তোমার সুলামিথ, তোমায় দ্রাক্ষাকুঞ্জের সাকী! আমার চুমু নাও! প্রিয়, আজ আমার ছুটি—আমার সুখের দিন। আমার 'সে' আজ বিশেষ কাজে দু'দিনের জন্যে বাইরে গেছে। এ সুযোগ কি বৃথা যাবে, প্রাণেশ? সারা সন্ধ্যা, সারারাত্রি, কি বিরহে কাটবে?…আর কাবারেৎ নয়, কেবিন নয়, হোটেল নয়, রেস্তর্রাঁ নয়—তোমারই কুঞ্জে হবে আমাদের মিলন। রাত্রি দশটা-এগারটায়। সেই সঙ্গে শীতলসুরা আর মিঠে বাদাম। মনের রাজা! মন যে আর মানে না মানা! কামনার মোহন স্পর্শে আমা-হারা আমি। আমার আলিঙ্গন নাও!…ওগো, তোমারই বলেছিনা!"

রাত এগারোটায় এল তামারা। কথায় কথায় উঠল টাকার কথা। নিজের আর্থিক অবস্থা দেখাবার জন্যে তাঁর সিন্দুক খুলে দেখালেন তিনি প্রেয়সীকে। "ওসব দেখতে চাইনে!"—প্রিয়তমের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে তামারা : "অর্থই অনর্থের মূল। ও রত্নের চাইতে এই রত্ন ঢের ভালো। এসো, ভলন্তা, মদ খাই। মদের পর চলবে আমোদ আর প্রমোদ। প্রণয়ের প্রস্রবণ। দুলব দু'জনে প্রেমের দোলায়। এসো!"

—"এ কী! মদটার স্বাদ তো ভালো নয়"—ভলন্তা বললেন।

—"হ'তে পারে। রাইনের মদের স্বাদ একটু উগ্র।"

আর খেতেও হলো না। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে দেখলে তামারা। নাঃ, যেন একেবারে মরণ-ঘুম!

মোমবাতি জ্বালিয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হলঘরে যায় তামারা—সেখান

থেকে সিঁড়িতে। নিঃশব্দে বাইরের দরজা দেয় খুলে। ঢোকে এসে সেনকা—ভদ্রবেশে। হাতে চামড়ার থলি।

—"সব ঠিক ?"

—"ঘুমুচ্ছে। এই যে চাবি।"

দু'জনে সিন্দুকের ঘরে যায়। টর্চ জালিয়ে দেখে সেন্‌কা চারধারে। তারপর ?...ভলস্তার প্রণয়ের পরিণতি ঘটল। প্রেমিক-রত্নকে ফেলে প্রেমিকা তাঁর আসল রত্ন কুড়িয়ে নিলে থলি ভর্তি ক'রে। তারপর রাস্তায়। গাড়ী ভাড়া করে শহরের বাইরে। পরিচয়: স্তাবিনিস্কি-দম্পতি।

এরপর অনেকদিন আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি তাদের। শেষে একটা বড়ো রকমের চুরিতে মস্কৌতে ধরা পড়ে গেল সেনকা। তামারাও। বিচার হলো। জেল হলো দু'জনেরই।

তামারার পর ভেরকার পালা। অনেকদিন থেকেই এক মিলিটারী কেরানীর সঙ্গে তার প্রেমলীলা চলছিল। লোকটার নাম ডাইলেক্‌টরস্কী। কিছুদিন থেকে ভেরকা লক্ষ্য করে আসছে প্রেমিকের প্রেমনদীতে পড়েছে ভাঁটা। সদাই যেন আনমনা ভাব। অভিমানে ভরে ওঠে ভেরকা; প্রশ্নবাণে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলে তাকে। কিন্তু উত্তর পায় রহস্যে-ভরা।

শেষে সঠিক উত্তর পেলে একদিন। আপিসের টাকা ভেঙেছেন প্রেমিকবর; হাজার তিনেক টাকা। দিন পাঁচেকের মধ্যেই সে-টাকার হিসাব হবে—খোঁজ পড়বে তখন। তারপর অপমান—আদালত—জেল! কেঁদে ফেললেন প্রেমিকবর: "হায়রে! আমার মা! তাঁর কী হবে? এ খবর কি সহ্য করতে পারবেন তিনি? না, না—এর চাইতে মরণ ভালো!"

বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে কেঁদে কেঁদে বললে সে: "হ্যাঁ, আমি আত্মহত্যাই করব!"

—"না, না! ও করতে নেই! লক্ষীটি আমার!"

—"তা' হয় না। প্রাণ বড়ো, না মান বড়ো?"

—"প্রিয়..."

—"আর বাধা দিয়ো না…"

—"আমার প্রাণ দিলে যদি হয়…বন্ধু…!"

—"তুমি কেন দেবে?…সখী, তবে বিদায়—"

—"আমাকেও সঙ্গে নাও তবে!…নাও…নাও!"

সন্ধ্যাবেলায় ডাইলেকটরস্কি একটা বিখ্যাত হোটেলে এসে একখানা ঘর ভাড়া নিলে। আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র! তারপর পড়ে থাকবে শুধু তার আর ভেরকার মৃতদেহ! অতএব পকেটে মাত্র এগারোটা কোপেক, তবুও হুকুম হলো—দু'বোতল শ্যাম্পেন আর ফল-মূল। ডাইলেকটরস্কি ঠিক করেছিল সে নিজে গুলি ক'রে মরবে। বেশ হবে, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তার জন্যে কতই না কাঁদবে! উপরন্তু ভেরকা যখন বললে—সে-ও সহমরণে যাবে, তখন তার মনের জোর আরো বেড়ে গেল। সুন্দরী ভেরকা, তার কোঁকড়ানো চুল এলোমেলো ক'রে আবেগভরে প্রিয়তমের গালে একটি চুম্বন দিয়ে বলেছিল: "তুমি যদি মরণকে বরণ করতে পার, আমি পারব না? এ তো সুখের মরণ!"

অবশেষে এল সেই মরণ-বেলা। ডাইলেকটরস্কি বললে: "প্রিয়ে, জীবন আমরা ভোগ করেছি। নয় কি? তবু—তবু জিজ্ঞেস করি মরতে গিয়ে অনুতপ্ত হবে না তো?"

—"না গো, না!"

—"তবে—প্রস্তুত!"

—"হ্যাঁ!"—ভেরকার মুখে হাসি।

—"তবে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে চোখ বন্ধ করো!"

—"না, না! এ ভাবে নয়। তুমি আমার কাছে এসো। আমার চোখে চোখ রাখো, ঠোঁটে রাখো তোমার ঠোঁট! আমি তোমায় চুমু খেতে থাকব, আর তুমি ওদিকে—হ্যাঁ, তাই করো! ভয় পেয়ো না। দেখো তো আমি ভয় পাইনি। এসো, দাও, চুমু দাও!"

সেইভাবেই ডাইলেক্‌টরস্কি ভেরকাকে হত্যা করলে। তারপর যখন নজর পড়ল তার মৃতদেহের উপর, বুঝ্‌তে পারলে তার পৈশাচিক কীর্তি, ভয়ে, আশঙ্কায় কেমন যেন হ'য়ে গেল সে! ভেরকার অর্ধনগ্ন দেহ তখনও বিছানার উপর কেঁপে-কেঁপে উঠ্‌ছে। ডাইলেকটরস্কির পাছ'টো

যেন অবশ হয়ে গেল। তবু তার মনে ছিল এবার আর কী করতে হবে। তাই নিজের পাঁজরখানা টান করে নিয়ে সেখানে রিভলভারের নাক বসিয়ে ঘোড়া টিপলে সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই ভেরকার। সারা দেহতে খেলে গেল জীবনের শেষকম্পন।

ভেরকার এই নাটকীয় মৃত্যুর দু'সপ্তাহ পর ছোট মানকার জীবনেও পড়ল যবনিকা। একদিন মানকার এক অতিথি মদ খেয়ে মাতলামো করতে করতে খালি মদের বোতলটা দিলে মানকার মাথায় বসিয়ে। দিয়েই মাতালের নেশা গেল ছুটে। সুতরাং দে-ছুট্ সেখান থেকে!

এই রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগল সারা ইয়ামকায়।

শেষ পর্যন্ত এল এক মর্মান্তিক আঘাত। সৈন্যদের কীর্তি সেটা।

দু'জন সৈনিক এক রুবলের একটি গণিকালয়ে গিয়ে স্ফূর্তি করবার পর দক্ষিণা দিতে পারেনি ব'লে নিজেরাই পেয়ে এল উত্তম-মধ্যম দক্ষিণা। রাত দুপুরে রক্তাক্ত দেহে কোনরকমে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেভাবেই, ছেঁড়া পোষাকে, ফিরে এল তারা নিজেদের ব্যারাকে। অন্যান্য সৈনিক বন্ধুরা শুনলে সব। তারপর বোধহয় আধঘণ্টাও যায়নি; প্রায় একশো সৈন্য এসে ইয়ামস্কায়ার প্রত্যেকটি গণিকালয়ের মধ্যে ঢুকে লুঠপাট অত্যাচার সুরু করে দিলে। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলে পথে-জুটে-যাওয়া বদমায়েস, গাঁটকাটা, গুণ্ডারা। বাড়ীর জানলার কাচগুলো সব ঝন-ঝন-ঝনাৎ করে ভেঙে পড়তে লাগল। পিয়ানোগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে চুরমার করা হলো। পালঙ্কের বিছানা ছিঁড়ে পালকগুলো সব রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে লাগল। গণিকাদের ধরে ধরে একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় বার করে দিলে রাস্তায়। তিন-তিনটে দরওয়ানকে তো মারতে মারতে মেরেই ফেললে। আসবাবপত্র, সিল্কের পোষাক, সব কোথায় কী হয়ে গেল! পাড়ার মদের দোকানগুলোতে পর্যন্ত তছনচ সুরু হলো।

এ ধরণের পৈশাচিক অত্যাচার আর হত্যাকাণ্ড চলল প্রায় সাতঘণ্টা ধ'রে। শেষ পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্যান্য সৈন্যের ও দমকলের সাহায্য নিয়ে এই বিশৃঙ্খলা থামালেন। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আগুন নেবানো হলো। সারা শহর চাঞ্চল্যে ভরে উঠল।

এক সপ্তাহ পরে গবর্ণর হুকুম দিলেন ইয়ামস্কায়ার সব গণিকালয় বন্ধ

ক'রে দেওয়া হোক্। বাড়ীউলীদের এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হলো তল্পিতল্পা গুটোবার জন্যে।

নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, লুণ্ঠিত, শ্রীহীন বয়স্কা বাড়ীউলীরা যত তাড়াতাড়ি পারে সব গুছোতে লাগল। বেচারীদের দেখলে দুঃখ হয় মনে। একমাস পরে ইয়ামস্কায়া স্ট্রীটের নামটুকুই শুধু লোকের মনে ক্ষীণ স্মৃতি হিসাবে জেগে রইল। কিছুদিন বাদে সে নামও গেল মুছে। নতুন নামকরণও হলো। কে আর চায় এই নামের কলঙ্ক ?

আর অশ্বিনী হেনরিয়েটা, মুটকী কীটি, এরা সব গেল কোথায় ? কোথায় আর! শহরের জন-স্রোতে মিশে গেল তারা। পথে পথে ঘুরে ঘুরে তারা শিকার ধরে বেড়াতে লাগল। পেট তো চালাতে হবে! তাদের এই নতুন জীবন-যাত্রার কাহিনীও মোটেই বৈচিত্র্যহীন নয়।

জননী এবং তরুণদের জন্যে লেখা এই কাহিনীর লেখক সে কাহিনীও শোনাবার আশা রাখে।

শেষ

পুনশ্চ গ্রন্থকারস্য

পৃথিবীময় এই বইখানার কাটতি হয়েছে বিশ লক্ষের উপর—রুশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, জাপানী, সুইডিশ, ফিনিশ, নরওয়েজিয়ান, বোহেমিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ইংরেজী, পোলিশ, লিথুয়ানিয়ান, এবং আরও অনেক ভাষার মারফৎ।

বইখানা লোকের যে পছন্দ হয়েছে, পাঠক-চিত্তের কোনরূপ অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল সেজন্যে দায়ী নয়; আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বহু লোককে ইয়ামা আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে।

তবুও বইখানা নিয়ে গ্রন্থকারের মনে সর্বদাই—এখন অবধিও—রয়েছে একটা অতৃপ্তির ভাব।

আর বাস্তবিকই বটে; আজ এই হাজার হাজার বছর যাবৎ মানবজাতির শিয়রে বিভীষিকার মতো খাড়া হয়ে রয়েছে কত কী নির্মম, দুরূহ, অভিশপ্ত সমস্যা; তার ভারে সময় সময় মাটিতে মাথা নুয়ে পড়ে মানুষের, হয়ে ওঠে সে অতি হীন পশুর সামিল। রয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, রয়েছে গণিকাবৃত্তি, রয়েছে আরও কত কী—প্রাণদণ্ড, গুরু শ্রমে লঘু পারিশ্রমিক, লোভমত্ত সংখ্যালঘুর সেবায় অর্ধাশনে সংখ্যাগুরুর দাসত্ব।

এত শত পাপাচারের মধ্যে চিরদিনই আমার কাছে জঘন্যতম পাপাচার ব'লে প্রতিভাত হয়েছে নারীদেহের কারবারকে, মানবজাতির প্রতি বিধাতার যা শ্রেষ্ঠ দান সেই নারীর প্রেমের বেসাতিকে। তবুও আমার মনে হয়েছে মানবজাতির পুরাতন ব্যাধিস্বরূপ এই যে গণিকাবৃত্তি, অতি দ্রুত হতে পারে চিরদিনের মতো এর নিরসন। মনে হয় লোককে ডেকে শুধু এই কথা বলা দরকার: "সংসারে আপনার রয়েছেন শ্রদ্ধেয়া পক্বকেশা পিতামহী; ছেলেবেলায় তাঁর মুখ থেকেই

আপনি প্রথম শোনেন যত সব সুন্দর সুন্দর লোকগাথা; আপনার পিতামহী তিনি—সংসারের গৌরব, সংসারের অবিসংবাদিনী কর্ত্রী। সংসারে আছেন আপনার জননী, শিশুকালে লোভাতুরের মতো সানন্দে তাঁর স্তন্যপান করতে করতে আপনার স্বর্গীয় সুষমায় ভরা দুষ্টু চোখ-দু'টি মিটিমিটি ক'রে চাইতেন আপনি। সংসারে রয়েছেন আপনার পত্নী, আপনার শিশুসন্তানদের জননী তিনি, পরিবারের অন্নপূর্ণা। রয়েছে আপনার একটি বোন,—সদাই হাসিখুশি চমৎকার মেয়েটি, মুখের কথায় তার বেজে ওঠে গানের সুর। তারই সামনে কেউ ব্যবহার করলে হয়তো সামান্য একটা দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথার টুকরো, কি দেখালে সামান্য একটু বেপরোয়া অঙ্গভঙ্গি, এই চিন্তাটুকুতেই অমনি চোখদুটো জবাফুলের মতো রাঙা হয়ে উঠল আপনার, সুরু ক'রে দিলেন আপনি দন্তে দন্তে ঘর্ষণ। আর এই যদি হয় আপনার আদরের শিশুকন্যাটির সম্পর্কে—নাঃ, তার কথা উল্লেখ করার দুঃসাহস নেই আমার।

"তবুও আপনার শিলিং, আপনার ডলার, আপনার রুবল, আপনার ফ্রাঙ্ক, কি আপনার মার্ক পকেটে ক'রে দিব্য নিঃসঙ্কোচে চলে যান আপনি প্রেম ভাড়া করতে, কামনার এক উন্মত্ত বিকৃতির তীব্র স্বাদ গ্রহণের লোভে—সেই বিশুদ্ধ কামনা যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নবজীবনের পরম রহস্যঘন সঞ্চারণ। এই তার লক্ষ্য—এবং এই তার একমাত্র সার্থকতা।

"যার কাছে গেলেন আপনি, বোধশক্তি হারিয়ে বসে আছে সে মেয়েটি, ডুবে গেছে পঙ্কিলতার নিম্নস্তরে, তাই ব'লে ঘোচে না আপনার নিজের দায়িত্ব—আর এই যে ডুবে যাওয়া, হায়! কী কঠিন এ কাজ! আগাগোড়া ব্যাপারটার সারমর্ম হচ্ছে এই: তরুণ যৌবন তার যদি গড়ে উঠতে পারত মায়ামমতা আর সামান্যতম দক্ষতার মধ্যে দিয়ে, তবে সে শুধু যে ভাগ্যবতী জননী রূপেই গড়ে উঠত তাই নয়, হয়ে উঠতে পারত স্নেহময়ী ভগিনী এবং আদরিণী কন্যাও।

"আত্মসর্বস্বের মতো আপনি হয়তো ভাবতে পারেন: 'আমার নিজের সংসার এক জিনিস, আর পরের সংসার সম্পূর্ণ এক আলাদা জিনিস,—সে সংসারের ভালোমন্দয় আমার যায় আসে না কিছুই…।'

কিন্তু এতে ক'রেই দায়িত্বমুক্ত হতে পারেন না আপনি। আর—এ হচ্ছে গিয়ে ঠিক এক নরখাদকের চিন্তাধারা। বাস্তবিক আমরা কি নিজেদের সামান্ত কিছু সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী ব'লে বিবেচনা করিনে? করিনে কি নিজেদের একতিলও খ্রীষ্টান ব'লে জ্ঞান?

"আর আপনার পাশবিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটলে পর গণিকার প্রতি আপনার নীচ বিরূপ মনোভাব গোপন করার প্রায় কোনরূপ চেষ্টা না ক'রেই যখন তার কাছ থেকে ফিরে আসেন আপনি, তখন জানবেন এবং মনেও রাখবেন ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সেই গণিকার চেয়েও কত নীচ, কত অধম হয়ে পড়েছেন আপনি নিজে। সমসাময়িক সমাজ-বিধানের বিপুল অসামঞ্জস্যের অন্তরালে আত্মরক্ষার সুযোগ পেয়ে, আপনি করলেন এক অন্ধ ভিক্ষুকের যথাসর্বস্ব অপহরণ, হাত-পা-বাঁধা একজন অসহায় লোকের গালে কষে দিলেন এক চড়, বঞ্চনা করলেন এক শিশুকে...।"

হাঁ! আমি লিখেছি—যতদূর আমার জানা আছে আর যতখানি কুলিয়েছে আমার ক্ষমতায়, গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছি আমি,—কিন্তু এ ব্যাধিপ্রতিকারের কোনও ঔষধ জানা নেই আমার। আমি কেবল এইটুকুই জানি যে অভাগা মেয়েরা গণিকাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়: একদিকে দারিদ্র্যের জ্বালায় আর সুশিক্ষার অভাবে, আর একদিকে প্রলোভনে আর মিঠে কথায় ভুলে, আর তৃতীয় দফায় অন্য কোনও ব্যবসা জানা নেই বলে, নয়তো অন্য কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে হয়রান হবার পর। কিন্তু এ সব বিষয়ে লিখতে, কি চেঁচাতে, কিংবা প্রচার করতে যাওয়া—সে কি পণ্ডশ্রম নয়? সব চেয়ে স্পষ্ট, সব চেয়ে ভয়ানক, সব চেয়ে সত্য কথা যা, মানুষের 'পরে যে কী অকিঞ্চিৎকর তার প্রভাব, সে কথা ভাবতেও করে ভয়!...

একবার পিটার্সবুর্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) থেকে ক্রিমীয়ার পথে এক রেলগাড়ীতে জনকয়েক তরুণ ইঞ্জিনীয়ার আমায় চিনতে পেয়ে আমার সঙ্গে গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলেন।

তাঁরা বল্লেন, "আপনি তো গণিকাবৃত্তির দুঃখকষ্টের কাহিনী সাধারণের কাছে বিবৃত করছেন; কিন্তু উঠতি বয়সে লোকের মধ্যে

যে কামোন্মাদনা এমন প্রবল আকার ধারণ করে, তা' সংযত করার সম্বন্ধে আপনি কোন্ পন্থা নির্দেশ করতে পারেন ?"

আমার সাধ্য অনুযায়ী পন্থানির্দেশ করলুম আমি :

"মোটা বিছানার চাদর ; শক্ত খাট ; খুব মোটা বা অতিরিক্ত গরম নয় এমন কম্বল ; সুপ্রচুর আলোবাতাস খেলতে পারে এ রকমের সুশীতল শয়নকক্ষ ; সুনিদ্রা, তবে অতিরিক্ত নয় ; প্রাতরুত্থান ; শীতল জলে স্নান ; সাদাসিধে খাবার, গরম মশলা দিয়ে অতিরিক্ত স্বাদু ক'রে তোলা নয় ; সৎসাহিত্য,—সাহস ও বীরত্বের কাহিনী নির্বাচন ; সুপ্রচুর কাজ, এবং খোলা হাওয়ায় খেলা ; ছেলেমেয়েদের একত্র শিক্ষার (সহ-শিক্ষার) ব্যবস্থা। অবশেষে, তরুণ বয়সে বিবাহ, ধরুন, এই পঁচিশ বৎসর বয়সে। কারণ, যাই হোক না কেন, সৎস্বভাবের মেয়েরা ততদিন অবধি সব কিছু ঠিক সয়েই থাকে।"

উত্তর দিলেন ইঞ্জিনীয়াররা :

"এ সবই জানা আছে আমাদের। এ সব হচ্ছে নিছক স্তোকবাক্য। তাতে ক'রে আসল সমস্যার সমাধান হয় না : যৌন ক্ষুধার পরিতৃপ্তির বদলে আপনি দেবেন কী ?"

এ কথায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আমার। লিয়েব তোল্‌স্তোই (টল্‌স্টয়) একবার যে কঠোর উত্তর দিয়েছিলেন, তারই উল্লেখ করে বললুম আমি :

'একবার রুশীয় "শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের" এক সম্মিলনে তোলস্তোই বিরক্তির সঙ্গে সে সময়কার রুশীয় সরকারী ব্যবস্থার সমালোচনা করছিলেন ; কারণ "শিক্ষিত ব্যক্তিদের" নির্বোধের মতো বাগাড়ম্বর পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর। তারই মধ্যে একজন যুবক তাঁকে প্রশ্ন ক'রে বললে :

"বেশ কথা, লিয়েব নিকোলাইয়েবিচ। আমরা ধরেই না হয় নিলুম যে আপনি সব ঠিকই বলছেন,—আমাদের এ ব্যবস্থা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কোনও কাজেরই আর উপযুক্ত নেই। যদি আপনি চান, আমরা একে ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু এর বদলে আপনি আমাদের দেবেন কী ?"

পরুষকণ্ঠে ভাবে জবাব দিলেন তোল্‌স্তোই :

"একবার মনে করুন—ভগবান যেন তা' না করেন!—আপনাকে ধরেছে গর্মিরোগে। আপনি আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: 'এ কী দুর্দৈব ঘটল আমার? এখন আমি করি কী?' আমি বল্লুম: 'এই এই ব্যারামে কষ্ট পাচ্ছেন আপনি। তার জন্যে এই এই আপনাকে করতে হবে: 'অবিলম্বে ডাক্তারের কাছে যান, যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করিয়ে রোগমুক্ত হোন গে যান।' কিন্তু হঠাৎ ব'লে বসলেন আপনি: 'তা' বেশ—ডাক্তারের কাছে গিয়ে রোগ সারিয়ে ফেলছি আমি। কিন্তু গর্মিরোগের বদলে আপনি আমায় দেবেন কী?' স্বীকার করছি, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন আমার পক্ষে…।"

আমার এ ব্যাপারেও সেই কথা। যতটা কুলিয়েছে আমার সাধ্যে, গণিকাবৃত্তির ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু আমার এ বইখানা সম্পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রকাশিত হতে পারে নি। অতি-সাবধান, খুঁৎধরা বাতিকগ্রস্ত, ভণ্ডস্বভাব রুশীয় সেন্সর-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপে বইখানা এমনই বিকৃতাঙ্গ হয়ে বেরুল যে আর চেনাই যায় না। ভীতভীতে মনোভাব নিয়ে জনসাধারণ তাতেই গেল ভড়কে। রুশিয়ায় আমি পেতে লাগলাম হাজার হাজার কটূক্তিপূর্ণ চিঠি—তার বেশির ভাগই বেনামী—এখনও মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি দু'চারখানা ক'রে। আমার দোষ দেওয়া হতে লাগল—সমাজের মূলোচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছি আমি, তরুণদের মধ্যে দিতে চাইছি দুর্নীতির প্রশ্রয়, বেসাতি করছি অশ্লীল সাহিত্যের ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার আন্তরিক সদুদ্দেশ্যের আমলই দিতে চাইলেন না অনেকে। সহৃদয়তা-প্রণোদিত ও উৎসাহজনক পত্রাবলী প্রথম পেতে থাকি আমি প্রবীণা, বুদ্ধিমতী, সাংসারিক জ্ঞানে অভিজ্ঞা মহিলাদের কাছ থেকে; নিজেদের যৌন তৃষ্ণায় ভীত সৎস্বভাব তরুণদের কাছ থেকে; এবং তরুণীদের কাছ থেকেও। পেশাদার গণিকাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খানকয়েক চিঠি আমার কাছে মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে রয়েছে; সে সব চিঠিতে আছে পদে পদে ব্যাকরণের ভুল, কিন্তু সেগুলোর বিষয়বস্তু গভীর এবং মর্মস্পর্শী…।

এক আশ্চর্য কথা: দেশত্যাগী হয়ে পারি নগরীতে এসে আমি লাভ করি সান্ত্বনা, সমর্থন, এবং স্বীকৃতি। ফরাসী ভাষায় আমার এই

বিষাদময় উপন্যাসখানার অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পারির প্রেস এবং জনসাধারণ অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন সেখানাকে। সমালোচকেরা ফরাসী লেখকদের বিশিষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে বইখানার নানা দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু মূল বিষয়ে তাঁরা সবাই হলেন একমত: কয়েকটি শালীনতা-বিরোধী ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও, বইখানা তাঁদের মতে হয়েছে সম্পূর্ণ নৈতিক, এবং সহৃদয় মানবিক বেদনাবোধে পরিপ্লুত হওয়ার জন্যে পাঠকপাঠিকাদের ভাবগত প্রয়োজনকেও করেছে সুসম্পূর্ণ।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল আমার।

পারি
শরৎকাল, ১৯২৯

আলেকজান্দার কুপ্রিন

তাই কুপরিন-এর এ-কাহিনী শুধু রুশিয়ার গণিকাবৃত্তিরই নয়, দেশকাল-নির্বিশেষে যে-কোনো সমাজেরই পঙ্কিলতার মর্মন্তুদ উপাখ্যান। হয়তো আমাদের দেশের দেবদাসীদের কথা নেই এতে। সেবাদাসীদের কথাই বা কৈ? ইউরোপ থেকে আজ বহুকাল হলো দেবতার নামে কুমারীদের উৎসর্গ ক'রে দেবার প্রথা লোপ পেয়ে গেছে—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে দেবতারাও উচ্ছন্ন গেছেন বুঝি! তা ছাড়া পথচারিণীরাও তাঁর এ বইখানিতে সামান্য একবারের উল্লেখমাত্রেই পর্যবসিত—যদিও তাঁর অপরূপ বর্ণনাভঙ্গির কৌশলে সে স্বল্প-পরিসরের মধ্যেও তা 'ইয়ামা'র এই সঙ্ঘবদ্ধ গণিকাবৃত্তির চেয়ে কম মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে নি। তবুও পৃথিবীময় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নারীদেহের যে-ব্যবসা চলে আসছে আজ আবহমানকাল থেকে, তার উলঙ্গ মূর্তি প্রকট হয়ে উঠেছে তাঁর এই 'ইয়ামা' বইখানিতে। সেদিক থেকে আমাদের দেশেরও সঙ্ঘবদ্ধ গণিকাবৃত্তির আলেখ্য হিসাবে একে আমরা গ্রহণ করতে পারি—বিশেষ ক'রে কলকাতা-বোম্বাইয়ের মতো বড় বড় আধুনিক মহানগরীর পাপাচারের চিত্র ব'লে। তাই এমন একখানা বইয়ের বাঙলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা আজ আছে বৈ কি—বিশেষ ক'রে এবারকার এই সদ্য-সমাপ্ত কুরুক্ষেত্রের পর। অবশ্য এই কুরুক্ষেত্রের ফলে আমাদের সমাজে এদিক দিয়েও যে-সব নতুন নতুন জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—হয়তো গোটা পৃথিবীময়ই হয়েছে তা—তার কোনও পরিচয় নেই এই 'ইয়ামা'তে। তার জন্যে কুপরিন-এর কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে আমাদের বলতে হয়: 'আজ নয়, দু'দিন বাদে নয়—হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে একজন প্রতিভাবান লেখক জন্মগ্রহণ করবেন···যাঁর কাছ থেকে পাব আমরা সে ভয়াল কথাচিত্র···সেই অনাগত লেখককে নমস্কার!'

—জবা

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দার কুপ্রিন-এর জন্ম হয়। মস্কো ক্যাডেট স্কুল আর মিলিটারী কলেজের পড়া শেষ হ'লে পর, বিশ বছর বয়সে তিনি লেফটেনান্টের কমিশন পান। সাত বছর পরে সে কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি এসে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কুপ্রিন-এর প্রথম বিখ্যাত উপন্যাস হলো 'ডুয়েল।' তাতে তিনি দেখিয়েছেন সৈনিক-জীবনের নানা অনাচার। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়াময় একজন প্রগতিশীল লেখক ব'লে তাঁর নামডাক পড়ে যায়। তারপর 'গ্যাম্বি্নাস' নামে বইখানা বার হ'লে পর ইউরোপময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

কুপরিন-এর বিষয়বস্তুর পরিধি অসামান্য। 'ডুয়েল', 'ক্যাডেট্স, 'ইন্টারোগেশন'-এ পাই সৈনিক-জীবনের ছবি, 'ব্যাকউড্স্' আর 'সোয়াম্প'-এ পাই কৃষকদের সুখদুঃখের কাহিনী, 'মোলোখ'-এ পাই কারখানার মজুরদের কথা, 'সার্কাস,' 'লেলী', আর 'ক্লাউন'-এ পাই তাদেরই কথা—দিনের পর দিন যারা সঙ সেজে লোকের মনোরঞ্জন ক'রে চলেছে শুধু দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে। এদিকে আবার 'কাপ্তেন রিবনিকোব' আর 'রিভার অব লাইফ'-এ পাই আমরা সৌখীন বিলাসী জীবনের কথা, 'অল ক্রাই'য়েতে পাই মফস্বলের ছবি, 'যুয়েস' আর 'কাওয়ার্ড'-এ ইহুদীদের কথা, 'রিটায়ারমেন্ট', আর 'অ্যাক্টর'-এ অভিনেতৃ-জীবনের কাহিনী। শিশুদের জন্যেও বিস্তর গল্প লিখেছেন তিনি, লিখেছেন হাবাদের জন্যে, লিখেছেন পশুপক্ষীর গল্প, ফুলের গল্প, পৌরাণিকী, কাল্পনিকী—কত কী! কোনোটা তার উৎসর্গ করেছেন তিনি এক সহিসকে, কোনোটা বা এক সার্কাসের সঙকে, আবার কোনোটা এক রেসের ঘোড়াকে! আর—এই 'ইয়ামা' বইখানা উৎসর্গ করেছেন তিনি জননী আর তরুণদের।